পারলৌকিক মঙ্গল ও প্রীতি-কামনায়,

আমার কাব্যানুরাগী পুণ্যপ্রাণ অগ্রজ

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত

মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতিতে,

তাঁহার "যোগিজনদুর্লভ "সাধের মরণের"
স্বর্গীয় দৃশ্য হৃদয়ে জাগরূক
রাখিবার আশায়,—

প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের

এই পুণ্য-চরিত,
ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে
অর্পণ করিলাম।

নিবেদন।

"বঙ্গের শেষবীর প্রতাপাদিত্যের" ভূমিকায় বলিয়াছিলাম, "উপন্যাস—উপন্যাস—ইতিহাস নহে।" বর্ত্তমান গ্রন্থেও সেই কথার পুনরুক্তি করিতেছি। "মন্ত্রের সাধন বা রাণা প্রতাপ" ঐতিহাসিক উপন্যাস হইলেও ইতিহাস নহে,—পাঠক অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কথাটি স্মরণ রাখিবেন।

"বঙ্গের প্রতাপ" যাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে, আশা আছে, "ভারতের প্রতাপ"—আরও অধিক পরিমাণে তাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিবে। কেন না, 'মন্ত্রের সাধন'—সেই স্বদেশ-প্রেমিক পুরুষসিংহ প্রাতঃস্মরণীয় রাণা প্রতাপের কর্ম্মময় জীবনের পুণ্য-প্রতিকৃতি। মনস্বী টডের রাজস্থান আমার প্রধান অবলম্বন।

একটু অভিনব পন্থায়, আমি এই কাব্য-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। সহৃদয় পাঠক অবশ্য সে বিচার করিবেন।

একটি কথা বলিয়া রাখি,—ঠিক ইতিবৃত্ত ও "আদর্শ" কখন এক হয় না। কল্পনা ও বাস্তব,—দু'য়ে মিশিয়া যে চিত্র, তাহাই কাব্য। "মন্ত্রের সাধন" সেই কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয়। পাঠক এ কথাটিও মনে রাখিলে বাধিত হইব।

আজ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এ গ্রন্থ রচিত হয়, এবং বিশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দী ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গোয়ালিয়র রাজ্যের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনোয়ারিলাল তেওয়ারি মহাশয় "বীরব্রত পালন" নামে সে-গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

মজিলপুর, "কর্ণধার কুটীর", ফাল্গুন, ১৩২৯। | সেবক শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

"মন্ত্রের সাধন"

বা

রাণা প্রতাপ।

সূচনা।

উদ্বোধন।

মন্ত্রের সাধন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"মিবারের আলোক! রাজপুত-ভরসা! যুবরাজ! আপনি এ দীন-বেশে কোথায় যাইতে উদ্যত হইয়াছেন?"

দুইজন সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট রাজপুত-সর্দ্দার, এই কথা বলিতে বলিতে, —এক তরুণবয়স্ক, তেজস্বী, মহত্বভাবব্যঞ্জক, উজ্জ্বল রাজলক্ষণ-চিহ্নিত যুবকের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। একজন বলিলেন, "আমরা জীবিত থাকিতে, সিংহের আসনে কখন শৃগাল বসিতে পাইবে না! এতক্ষণ দেখিতেছিলাম, চপলতার সীমা কতদূর!"

যুবক নির্ব্বাক্ হইয়া, একবার বক্তার মুখপানে চাহিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "মহারাজ! এখন হইতে আপনাকে মহারাজ সম্বোধনই করিব,—মহারাজ! চলুন,—মিবারের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া,—সমগ্র সামন্ত, সর্দ্দার ও প্রজাগণের আনন্দ ও আশা পূর্ণ করিবেন, চলুন!"

এবার যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন, "কেন, কুমার জগমাল?"

প্রথম সর্দ্দার। মহারাণা! আর সে কথায় কাজ নাই। আপনি এখনি দেখিতে পাইবেন, সমগ্র মিবার সমস্বরে ও প্রীতিভরে, 'মহারাণা প্রতাপসিংহ' নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাকে সংবর্দ্ধনা করিতেছে।

বর্ষীয়ান্ সর্দ্দার ধীরে ধীরে, সম্ভ্রমসূচক স্নেহভরে, যুবকের দক্ষিণহস্ত ধারণ করিলেন। অতঃপর স্মিতমুখে কহিলেন, "এই আমি আপনার হাত ধরিয়া পথ আগুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম,—আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, কেমন যান দেখি?"

এবার যুবক তাঁহার সেই স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য একটু শিথিল করিয়া, দ্বিতীয় সর্দ্দারের মুখপানে চাহিয়া, ধীরভাবে বলিলেন, "ব্যাপার কি, আমায় সব খুলিয়া বল।"

দ্বিতীয় সর্দ্দার। সময়ে আপনি সকলই শুনিবেন ও জানিবেন। এখন কেবল এইটুকু জানুন,—মিবারের রাজচ্ছত্র ও রত্ন-সিংহাসন আপনার, —জগমল কি আর কাহারও নয়।

যুবক। (প্রথমের প্রতি) তবে এতক্ষণ এ অধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য হইতেছিল কেন? আর তোমরাই বা তাহার কোনরূপ প্রতিকার কর নাই কেন?

প্রথম সর্দ্দার। বলিয়াছি ত, চপলতার সীমা কতদূর,—দেখিতেছিলাম! যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে,—এখন আসুন,—রাজপুত জাতির চিরন্তন বিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে, আপনিই মিবারের রাজ-সিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন, আসুন।

যুবক। যদি কোন বিঘ্ন-বাধা উপস্থিত হয়?—রাজ্যে যদি কোনরূপ অশান্তি বা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়?

প্রথম সর্দ্দার। (স্মিতমুখে) না মহারাজ, অতদূর ভাবিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও লোকাচার,—সকলের বিরুদ্ধে, কোন্ কার্য্য কখন জয়যুক্ত হইয়া থাকে? আর যদি [illegible] গতিকে

তাহাই হইবার উপক্রম হয়,—এ দাস আপন বুক পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিবে,—আমার অধীনস্থ সমস্ত সর্দ্দার ও রাজপুত-সৈন্য তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে—যুবরাজ! অমূলক সন্দেহের কোন কারণ দেখি না!

যুবক। তবে তাহাই হউক,—আমি তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

কথাটা হইতেছে এই,—উদয়পুরের রাণা উদয়সিংহ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, আর তাঁহার শূন্য-সিংহাসনে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জগমল উপবেশন করিয়াছেন। 'জ্যেষ্ঠ, সত্ত্বেও কনিষ্ঠের সিংহাসনলাভ',—ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও লোকাচারবিরুদ্ধ। উদয়সিংহ ইহা জানিয়াও, মৃত্যুর পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা করিয়া যান। ইহার কারণ,—সকল মহিষী অপেক্ষা, জগমলের মাতাকে তিনি অধিক ভাল বাসিতেন। কিন্তু রাজপুত-সর্দ্দার ও প্রধানগণ,—এই ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারিলেন না;—তাঁহার মৃত রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহকেই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্থির করিলেন। প্রতাপসিংহ,—ঝালোরাধিপতির ভাগিনেয়;—হৃদয়বান্, বুদ্ধিমান্, তেজস্বী, ধীর, স্বাধীনচেতা ও উন্নতমনা—সর্ব্বাংশে রাজা হইবারই যোগ্য। বলা বাহুল্য, ঝালোরাধিপ আন্তরিক যত্নে, ভাগিনেয়কে ন্যায্য স্বত্বে স্বত্ববান্ করিতে, রাজপুত-প্রধানগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারই উত্তেজনার ফলে, একজন সর্দ্দার-প্রধান সকলের অগ্রণী হইয়া, শুভসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে চলিলেন। এই সর্দ্দার,—চন্দ্রাবৎবংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুত; নাম—চন্দাবৎ কৃষ্ণ।

এখন এই "কৃষ্ণ" ও তাঁহার সহচর,—সিংহাসন-বঞ্চিত, রাজ্যত্যাগে উদ্যত, মনঃক্ষুণ্ণ যুবক প্রতাপসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনাদের মনোভাব প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে আশ্বস্ত ও সান্ত্বনা করিয়া, কথা-মত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা আজ প্রায় সাড়ে-তিনশত বৎসরের ঘটনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

এদিকে মহোল্লাসে স্ফীতবক্ষঃ হইয়া, আত্মীয়-অন্তরঙ্গ-অনুচরবৃন্দকে লইয়া, বালক জগমল অল্পক্ষণ যে সিংহাসন উপবেশন-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন,—সর্দ্দারপ্রধান চন্দাবৎ কৃষ্ণ, প্রতাপসিংহকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সেই বিমল-সুখে বাধা দিলেন। প্রতাপসমভি-ব্যাহারী চন্দাবতের সেই ধীর-গম্ভীর সঙ্কল্পময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াই, বালক জগমল চমকিত হইলেন। তারপর যখন সেই তেজস্বী বীর চন্দাবৎ, ধীরে ধীরে তাঁহার সিংহাসন-সম্মুখে আসিয়া, জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কুমার! আপনার বিষম ভ্রম হইয়াছে"——তখন যেন তাঁহার চৈতন্য হইল, এবং সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।————'একি! সিংহাসনে বসিয়াছি, রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছি,—সর্দ্দার তবে এখনও আমায় 'কুমার' বলিয়া সম্বোধন করে কেন?"——হায়, মুহূর্ত্তেরও অপেক্ষা সহিল না,—চিন্তার সবটা সামঞ্জস্য করিবারও সময় হইল না,——গম্ভীরমূর্ত্তি সর্দ্দার জলদগম্ভীরস্বরে পুনরায় কহিলেন, "কুমার! আপনার বিষম ভ্রম হইয়াছে,—এ আসন আপনার নয়! এ আসনের মালিক যিনি,—তিনি এই নিম্নে দাঁড়াইয়া!——অবিলম্বে মহারাণা প্রতাপসিংহের সম্যক্ মর্য্যাদা রক্ষা করুন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধিমান্ হইলে, জগমল তখনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতেন,—এবং বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকিলে, তাঁহার পারিষদগণও তখনি এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেন; কিন্তু তাঁহার কিংবা তাঁহার পারিষদগণের—কাহারও ঘটে সে বুদ্ধিটুকু ছিল না। কারণ, কি জগমল —আর কি তাঁহার পারিষদবৃন্দ,—চন্দাবৎ কৃষ্ণকে সকলে বিলক্ষণ চিনিতেন। সেই শক্তিধর পুরুষ যখন নিজে প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া, এত বড় গুরুতর কথা, বড় গর্ব্বা করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন,—তখন কি আর এতটুকু ইতস্ততঃ করিয়া, চুপ-চাপ থাকিতে আছে?"

কার্য্যকুশল চন্দ্রাবৎ আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া, ধীরে ধীরে জগমলের হাত দু'খানি ধরিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহাকে সিংহাসন হইতে নামাইলেন,—তারপর সসম্ভ্রম অভিবাদন পূর্ব্বক, ধীরে ধীরে প্রতাপ-সিংহের দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহাকে সেই শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন।

জগমল এবং তাঁহার সভাসদবৃন্দ,—একেবারে নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ!

প্রতাপকে সিংহাসনে বসাইয়াই, সেই শক্তিধর পুরুষ, স্বহস্তে প্রতাপের শিরে রাজমুকুট এবং কটিতটে শাণিত কৃপাণ পরাইয়া দিলেন, এবং নত-জানু হইয়া তিনবার ভূমিস্পর্শ করতঃ, সসম্ভ্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—

"জয় মিবারপতির জয়!
"জয় মহারাণাকী জয়!
"জয় মহারাজ প্রতাপসিংহের জয়!"

অদূরে তাঁহার অনুচরগণ ও অধীনস্থ সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—প্রভুর মুখে এই 'জয়' উচ্চারণ শুনিবামাত্র, পূর্ব্ব সঙ্কেতমত, তাহারাও জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

তখন আর কাহাকেও কিছু বলিয়া দিতে হইল না,—সকলেই এ

আপন কর্ত্তব্যে মনোযোগী হইল। যে ছত্রধর ইতিপূর্ব্বে জগমলের শিরে রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিল,—সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া 'নব মহারাণা'র শিরে ছত্র স্থাপন করিল; যে চামর-ব্যজনকারী অনুচরদ্বয়, মুহূর্ত্তপূর্ব্বে জগমলের গাত্রে ব্যজন করিতেছিল, তাহারা যেন মহা অপরাধীর ন্যায় ভয়ে জড়সড় হইয়া, প্রতাপের অঙ্গে ব্যজন করিতে প্রবৃত্ত হইল; যে বন্দী ও স্তুতি-বাদকগণ ইতিপূর্ব্বে জগমলের গুণগানে ব্যাপৃত ছিল, তাহারা যেন আপনা-দের বিষম ভ্রম সংশোধন করিয়া, এক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহে 'নূতন মিবারপতির' বন্দনা আরম্ভ করিয়া দিল। এইরূপ যাহার যে কার্য্য,—ঝটিতি যেন যাদুমন্ত্রে সম্পন্ন হইতে লাগিল। অন্যে পরে কা কথা,—স্বয়ং 'দণ্ডেকের মহারাণা' জগমলও, গতিক বুঝিয়া, সপারিষদবর্গ, প্রতাপসিংহের জয়-ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ঝটিকার পর সমুদ্র যেমন স্থির ও অচঞ্চল হয়,—সঙ্কল্পসিদ্ধির পর, বীর চন্দাবৎ কৃষ্ণও তেমনি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অতি বিনীতভাবে জগমলকে কহিলেন,—"কুমার! বৃদ্ধ সর্দ্দারের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না,—আমি মিবারের পরিণাম চিন্তা করিয়া এবং ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও লোকাচারের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া, স্বর্গীয় মহারাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই রাজ-সিংহাসন অর্পণ করিলাম। বিশেষতঃ, নবীন মহারাণা সর্ব্বাংশেই রাজাসনের যোগ্যপাত্র।"

অতঃপর প্রতাপসিংহের পানে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—

"রাজপুতকুলতিলক! যে সকল শুভচিহ্ন ও উচ্চ লক্ষণ আপনার দেহে বিদ্যমান,——ঐ প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃ, আজানুলম্বিত বাহু, মহত্বভাবব্যঞ্জক বীর-দৃষ্টি, তেজঃপুঞ্জ প্রতিভাপূর্ণ মুখমণ্ডল,——মহারাণা! এই রাজজনোচিত মনোহর রূপ যেন সার্থক হয়! আপনা হইতেই যেন চিতোরের উদ্ধারসাধন এবং রাজপুতজাতির বীরব্রত উদ্‌যাপিত হয়! যে শাণিত কৃপাণ আজ আমি স্বহস্তে আপনার কটিতটে নিবদ্ধ করিয়া দিলাম,—উহা চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর হস্তস্থিত অসি!——পাপ যবন

চিতোর অধিকার করিয়া মায়ের মন্দির অপবিত্র করিয়া দিল,—মায়ের সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ধূলায় লুণ্ঠিত করিল,—আর ক্ষত্রিয় বীর রাজপুত-জাতির অস্তিত্ব আজিও পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে! হায় মা!——

উত্তপ্ত নিশ্বাসের সহিত টপ্‌টপ করিয়া দুই ফোঁট গরম জল চন্দাবতের চক্ষু হইতে নির্গত হইল। সভাস্থ সকলের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল; সিংহাসন-উপবিষ্ট প্রতাপের চক্ষু ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল;—তাঁহার সর্ব্বশরীর ঈষৎ কম্পিত হইল; কোষবদ্ধ অসি তিনি একবার আকর্ষণ করিলেন; তখনি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বক্তার মুখের পানে চাহিলেন।

চন্দাবৎ পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

"সেই অসি,—মায়ের হস্তস্থিত সেই মন্ত্রপূত শাণিত কৃপাণ,—আজ আমি স্বহস্তে নবীন মহারাণার কটিতটে সংবদ্ধ করিয়া দিলাম;—বৃদ্ধের বড় সাধ,—মহারাণাই এই অসির সম্যক্ মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। একে একে অনেকেই এ অসি গ্রহণ করিলেন,——সকলেই চিতোর উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন,—আশাও সময়ে সময়ে পূর্ণ হইল;—কিন্তু হায়! রাজপুত জাতির এ সৌভাগ্য স্থায়ী হইল না!—কালের বশে, সেই স্বর্গতুল্য চিতোর পুনরায় যবন-কবলে পতিত! কিন্তু, কেন জানি না,—আজ আমার অন্তরাত্মা বলিতেছে,—মহারাণা প্রতাপ-সিংহই রাজপুতজাতির মুখ রাখিবেন!' তবে—তবে, বীর-ব্রত গ্রহণ কর,—হে মিবারপতি! দুর্দ্দান্ত মোগল-গ্রাস হইতে সোনার রাজস্থান রক্ষা কর,—হে নরনাথ! চিতোরের বৈধব্য-বেশ দূর করিয়া, সমগ্র মিবারের একচ্ছত্র অধিপতি হও,—প্রভু!———মা-ভবানীর হস্তে পুনরায় যেন এই অসি শোভিত হয়!"

সভাস্থ সকলে নীরব। সকলের মুখ আরক্তিম, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, শরীর স্ফীত ও ঈষৎ কম্পিত।

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, স্থির-প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক গম্ভীরস্বরে প্রতাপ কহিলেন, "সর্দ্দার বীর! সকলই শুনিলাম.—যেমন করিয়া শুনিতে হয়, শুনিলাম। যদি বাঁচিয়া থাকি, জীবনে-ব্রত উদযাপিত করিব। আজ আর কিছু বলিব না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ আহেরিয়া। রাজপুতজাতির আজ বড় আনন্দের দিন। প্রায় সমগ্র মিবার আজ আনন্দ-উল্লাসে মত্ত। বীর রাজপুত-জাতি আজ বীর-সাজে সজ্জিত হইয়া, দলে দলে—উল্লাস-কোলাহলে, চারিদিক্ বিকম্পিত করিয়া তুলিতেছে। শত শত, সহস্র সহস্র—অগণিত রাজপুত বীর, আজ একস্থানে সমবেত হইতেছে। বীর-পরিচ্ছদে দেহ আবৃত,—হস্তে শাণিত বর্শা, স্কন্ধে সুতীক্ষ্ণ তীর ও ধনু, শিরে উজ্জ্বল কিরীট, কপোলে রক্তচন্দনের ফোঁটা, মুখে "হর হর মহাদেও" রব,—তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া, রাজপুত বীরগণ আজ বীরদর্পে বসুন্ধরা কাঁপাইয়া, দলে দলে এক স্থানে সমবেত হইতেছে। চারিদিকে পর্ব্বত-মালায়-বেষ্টিত এক বিস্তীর্ণ বন্ধুর ক্ষেত্রে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলে সমবেত হইল।

আজ আহেরিয়া পর্ব্বোৎসব,—আজ রাজপুতজাতির ভাগ্য-পরীক্ষার দিন। সংবৎসরের ফলাফল জানিবার জন্য—বীর-ব্রতের ভবিষ্যৎ অবগত হইবার নিমিত্ত, আজ রাজপুত-বীরগণের আনন্দ মৃগয়া। এই মৃগয়া ব্যাপারে আজ ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলে যোগদান করিয়াছে। বীরদর্পে বরাহ শিকার করিয়া,

সেই বরাহ ইষ্টদেবতার সম্মুখে বলি দিয়া, রাজপুত-বীর আজ ভবিষ্যৎ ফলাফল জানিবার জন্য উৎসুক ও উন্মুখ হইয়াছে।

স্বয়ং মহারাণা প্রতাপসিংহ এবং সমগ্র রাজ-পরিবারস্থ বীরবৃন্দও আজ এই উৎসবে যোগ দিয়াছেন! সকলেরই মুখে আনন্দসূচক ভাব ও জ্বলন্ত উৎসাহ। মহারাণা সকলের মধ্যস্থলে থাকিয়া, আপন অশ্বে উপবিষ্ট হইয়া, বলিতে লাগিলেন,—

"বীরগণ! মনে রাখিও, আজ এই মৃগয়াব্যাপারে মিবারের ভাগ্য-পরীক্ষা হইবে। আজিকার দিনের এই মহামহোৎসব,—রাজপুতজাতির একটা ব্রত-বিশেষ। এই ব্রত উদযাপনে জীবন উৎসর্গ করাই রাজপুত-জাতির ধর্ম্ম। নচেৎ কেবলমাত্র নির্ব্বিঘ্নে ও ষোড়শোপচারে ঘোর ঘটা করিয়া, দেবী-সমক্ষে বরাহ বলি দিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইল না। মায়ের সম্মুখে মনের উল্লাসে বন্য-বরাহ বলি দিবে—দাও; কিন্তু মনে রাখিও, এই বলিদানেই ব্রত উদ্‌যাপিত হইল না!—যাহারা রাজপুত জাতির শত্রু, রাজপুতের স্বাধীনতার শত্রু, সমগ্র মিবারের শত্রু,—সেই পাপ মোগলের করাল-গ্রাস হইতে জননী-জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য, কায়মনোবাক্যে দেবীসমক্ষে প্রার্থনা করাই এ ব্রতের গূঢ় উদ্দেশ্য। দেখ, এই মিবারবক্ষে আজ কতকাল ধরিয়া ক্রূর পাঠান ও মোগল,—ঘৃণাভরে কতবার কত মর্ম্মান্তিক পদাঘাত করিয়া আসিতেছে!—সেই পাপিষ্ঠ আলাউদ্দীন হইতে আরম্ভ করিয়া, আকবর পর্য্যন্ত,—কি অবধিই না মিবারের শোচনীয় দশা করিয়াছে!———সোণার চিতোর আজ অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ,—সোণার রাজস্থান আজ শত্রুপদ-দলিত! রাজপুত-সতী সোণার পদ্মিনী, পাপ যবনের অত্যাচার-ভয়ে, সোণার অঙ্গ চিতানলে ঢালিয়া দিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে কত সোণার কুসুম পুড়িয়া ছাই হইল!—বাপ্পারাও-বংশধর মহামতি ভীমসিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া, সংগ্রামসিংহ পর্য্যন্ত কত শত বীরাগ্রগণ্য, স্বদেশরক্ষার্থ অকালে

শেষ-নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।—হায়! তবুও বিধাতার দয়া হইল না;—তবুও সমগ্র মিবার-ভূমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া, আপন গৌরবে গৌরবময়ী হইতে পারিল না! অহো! দেবতার অভিসম্পাৎ,—মনুষ্যে কিরূপে খণ্ডন করিবে?"

বীরের বীর-হৃদয় ক্ষণেকের জন্য আর্দ্র হইল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে গম্ভীর-স্বরে প্রতাপ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"ভ্রাতৃগণ! তথাপি আমাদিগকে জীবন-পণ করিতে হইবে।—দেবতার সন্তোষ বিধানার্থ তথাপি আমাদিগকে প্রবল পুরুষকার-অবলম্বন করিতে হইবে। কঠোর ব্রতগ্রহণ ভিন্ন, প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ব্যতীত, এ মহাব্রত উদযাপিত হইবে না। মাকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। সেই সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী ভবানী প্রসন্ন হইলে, আমরা ক্রমে ক্রমে সকলই পাইব। দুর্জ্জয় সাধনা চাই।—স্বাধীনতার মহামন্ত্র সাধন ভিন্ন, এ ব্রত উদযাপিত হইবে না। এখন আইস,—সকলে উৎসাহভরে বন্য-বরাহ শিকার করিয়া, মায়ের পূজা সাঙ্গ করি। এই পূজা সমাপনান্তে, আমি যে মহাপূজায় ব্যাপৃত হইব,—ভরসা করি, সমগ্র রাজপুত-বীর, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাতে যোগদান করিবেন।—সকলে একবার সমস্বরে বল—

"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'।"

তখন সেই অগণিত সহস্র সহস্র রাজপুত-বীরের মুখ হইতে সমুদ্র গর্জ্জনবৎ মহাবাক্য ধ্বনিত হইল,—

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন!'

আকাশে সেই শব্দের প্রতিশব্দ হইল,—'শরীর পাতন।' পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে ধ্বনিত হইল,—'শরীর পাতন!' অদূরস্থ অরণ্যানী ও নির্ঝরিণী যেন সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—'শরীর পাতন'। তখন মহারাণা

প্রতাপ যেন সহস্র কর্ণে চারিদিক্ হইতেই শুনিতে লাগিলেন,—'শরীর পাতন।'

তবে, এ সাধনায় কি তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না?

ফলাফল ভগবানের হস্তে;—তোমার আমার সে বিষয় ভাবিয়া ফল কি? সর্ব্বান্তঃকরণে, সম্পূর্ণ অনুরাগভরে, আপন আপন কাজ করিয়া যাও।—কার্য্য কখন নিষ্ফল হয় না। জীবনও অনন্ত, কালও অনন্ত;—কোন-না-কোন জীবনে এবং কোন-না-কোন কালে, তোমার মনস্কাম পূর্ণ হইবেই হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজপুত বীরগণ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া যথারীতি বরাহ শিকার করিলেন, এবং তাহা যথারীতি মায়ের সম্মুখে বলিদান করিয়া, আহেরিয়ার আনন্দ-উৎসব সমাধা করিলেন। মাতৃপূজায়, এ বৎসরের ফলাফল, মোটের উপর, তাঁহারা শুভই বুঝিলেন। বুঝিলেন, মহারাণা প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, জীবনের নির্ম্মল উষাকালেই, এক অপূর্ব্ব বীরব্রত গ্রহণ করিয়া, সমগ্র জগতের নিকট চিরকালের জন্য, বরণীয় থাকিবেন।

কিন্তু হায়! এই মহাযজ্ঞের উদ্বোধনেই বড় একটা অশুভকর বিষয়ের সংঘটন হইল। সেই অশুভকর বিষয়টি, দারুণ কষ্টকর হইলেও, এইখানে বিবৃত করিতে হইতেছে।

আহেরিয়া পর্ব্বোৎসবে যখন রাজপুত বীরগণ অরণ্যের চারিদিকে বরাহশিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই সময় মহারাণা প্রতাপসিংহ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্তসিংহের মধ্যে-একটি গুরুতর মনোবিবাদের সূত্রপাত হইল। বিবাদ হইল—একটি লক্ষ্য লইয়া। সকলেই শিকারে উন্মত্ত;—সকলেই আপন আপন বীরত্ব প্রদর্শনে এবং যশঃ বিস্তারে উদগ্রীব;—সকলেই আপন আপন কৃতিত্বে ও গুণগ্রামে বিশেষ

Uttarpara Jaikrishna Public Library

আস্থাবান্;——সুতরাং মৃগয়া-ব্যাপারে গুরু লঘু ভেদ রহিল না। প্রতাপ ও শক্ত, রাজভ্রাতৃদ্বয় একত্র—এক সঙ্গে শিকারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের অদূরে এক বন্য-বরাহ দেখা দিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই ভীষণ প্রতাপ ও বীরমূর্ত্তি দেখিবামাত্র, বরাহ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু হতভাগ্য জীব,—পলাইবে কোথা? ভ্রাতৃদ্বয় এক সঙ্গে, একই সময়ে, ঠিক একই রকমের দুইটি সুতীক্ষ্ণ শর, বরাহের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। অব্যর্থ সন্ধানে এক শর বরাহের মস্তক ভেদ করিল; দ্বিতীয় শর ঈষৎমাত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ব্যর্থ হইল। পরন্তু, বলা বাহুল্য, সেই একমাত্র সুতীক্ষ্ণ শরেই, বরাহের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইল এবং সে, যন্ত্রণা-সূচক বিকট চীৎকার করিতে করিতে অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

অনুচরবৃন্দের সহিত উভয় ভ্রাতা মৃত বরাহের নিকট আসিলেন। এইবার সেই বিষম মনোবাদ আরম্ভ হইল।

শক্তের এক প্রিয় অনুচর হর্ষভরে কহিয়া উঠিল, "মহারাজ-কুমারের কি অব্যর্থ সন্ধান!—এই এক লক্ষ্যেই এই প্রকাণ্ডকায় হিংস্রক জন্তুর প্রাণসংহার করিলেন!—সার্থক ধনুর্ব্বিদ্যা!"

প্রতাপ এই অনুচরের মুখের পানে একটা তীব্র কটাক্ষ করিলেন। সেই এক চাহনিতেই অনুচরের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে, আর দ্বিতীয়বার রাণার মুখপানে চাহিতে সাহসী হইল না,—মহা অপরাধীর ন্যায় কম্পিত-হৃদয়ে ভূমিপানে তাকাইয়া রহিল।

পাঠককে বলিতে হইবে না যে, প্রতাপের ধারণা, তাঁহারই অব্যর্থ লক্ষ্য, বরাহ ভূতলশায়ী হইয়াছে।

বুদ্ধিমান্ শক্ত এ দৃশ্যটি লক্ষ্য করিলেন। বুঝিলেন যে, তাঁহার অনুচরের উক্তিতে প্রতাপ বড়ই বিরক্ত ও ঈষৎ কোপাবিষ্ট হইয়াছেন। শক্ত, প্রতাপের প্রকৃতি জানিতেন।

লোকটিকে কিছু না বলিয়া, শক্ত সেই অনুচরের কথাই যথার্থ প্রতিপন্ন

করিবার উদ্দেশ্যে, অনুচরকে প্রীতিভরে কহিলেন, "ইহা আর বেশী কথা কি ;—যদি আমার অব্যর্থ লক্ষ্যের বিশিষ্ট প্রমাণ দেখিতে চাও, তবে ঐই দেখ,——আমি ঐ অদূরস্থ বৃক্ষশাখার ঐ অসংখ্য পত্রমধ্যস্থ ঐ তৃতীয় পত্রটি এখান হইতে বিদ্ধ করি।"

এই বলিয়া ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ শক্ত, নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ-পত্রটি বিদ্ধ করিলেন। এবার তাঁহার সেই অনুচরের সহিত তাঁহার অন্যান্য অনুচরও শতমুখে তাঁহার লক্ষ্যের গুণগান করিতে লাগিল।

পাঠক বুঝিতেছেন, প্রতাপের ন্যায় শক্তের মনেও ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহারই অব্যর্থ সন্ধানে বরাহের মস্তক ভেদ হইয়াছে।

এবার প্রতাপ আরও বিরক্ত এবং কিছু ক্রুদ্ধ হইলেন। ভাবিলেন,—ধৃষ্টতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। উভয়েরই মনে ধ্রুব বিশ্বাস,—"আমারই শরে বরাহ গতজীবন হইয়াছে।" অবিকল একই রকমের দুইটি শর,—দুইটির পার্থক্য কিছুতেই জানিবার উপায় নাই। অভিমান, ক্রোধ, বিরক্তি,—এককালে সকল ভাব মনোমধ্যে উদিত হইয়া, প্রতাপকে ক্রমে বড়ই উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

উত্তেজিত প্রতাপ এবার গম্ভীরস্বরে কনিষ্ঠকে কহিলেন, "শক্ত, তুমি, ও কি অসার আত্মম্ভরিতা দেখাইতেছ? এরূপ হামবড়াই ভাব, লঘুপ্রকৃতি লোকেরই খাটে ;—শিশোদীয় বংশধরের মুখে এরূপ অসার বাচালতা কিছুতেই শোভা পায় না!"

শক্তও কতকটা বিস্মিত এবং কতকটা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "দাদা! আপনার মুখে এরূপ অসঙ্গত ও অশিষ্ট কথা শুনিব, কখন এমন আশা করি নাই। আপনি কি তবে বলিতে চান, আপনারই শরে বরাহ নিহত হইয়াছে,—আর আমি আপনার কৃতিত্ব গোপন করিয়া, অযথা আত্মপ্রাধান্য দেখাইতেছি?"

গম্ভীর প্রতাপ গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "হাঁ।"

"না,—নিশ্চয়ই না,—কথনই না"—বলিয়া, শক্ত আপন শাণিত বর্শা-ফলক দৃঢ়তার সহিত স্পর্দ্ধাভরে সম্মুখস্থ উপলখণ্ডে বিদ্ধ করিলেন। সেই দারুণ আঘাতে প্রস্তরখণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল।

প্রতাপ। কি! আমারই সম্মুখে এতদূর ধৃষ্টতা!——শক্ত, এখনও আত্মসংযম কর।

শক্ত। পিতামাতার আশীর্ব্বাদে, প্রকৃত আত্মসংযম, বোধ হয় শিখিয়া থাকিব,—কিন্তু কাপুরুষ-জনোচিত এরূপ সত্য গোপন করিয়া অসত্যের প্রশ্রয় দিতে কথনও শিখি নাই!

প্রতাপ। শক্ত! জান, তুমি কাহার সহিত কি ভাবে কথা কহিতেছ? এখনও বলিতেছি, সাবধান হও।

কথায় কথায় উভয়ের ক্রোধ বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইল। উভয়েরই অন্তরে দারুণ অভিমানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পরিণাম যাহা দাঁড়াইল, তাহা বড়ই অনর্থকর।

উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী—নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ ও ভয়-আকুলিত হইয়া, বিষম প্রমাদ গণিতে লাগিল।

এবার শক্ত সম্বন্ধ ভুলিয়া, আপন অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়া, সেই সর্ব্বজনসমক্ষে জ্যেষ্ঠকে বলিলেন,—

"উচ্চপদ ও প্রভুত্ব পাইলে, মানুষমাত্রেই যে দিশাহারা হয়,—আপন কৃতিত্ব ও জেদ্ বজায় রাখিবার জন্য যে, অসত্যকেও আশ্রয় করে, আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম! যে সে ব্যক্তি নয়,—মিবারের 'নূতন মহারাণা', প্রবল প্রতাপান্বিত প্রতাপসিংহই তাহার চূড়ান্ত সাক্ষী!"

বিষাক্ত শল্যের ন্যায় কথাগুলা প্রতাপের বুকে বাজিল। প্রতাপ একবার আরক্তলোচনে শক্তের পানে চাহিলেন। ক্রোধে তাঁহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এবার তিনি বজ্রকঠোর স্বরে কনিষ্ঠকে কহিলেন, "শক্ত!—আর অধিক কিছু বলিবার নাই,—ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সীমা

অতিক্রম করিয়াছে,—এখন মরণের জন্য প্রস্তুত হও! আজ ভ্রাতৃরক্তে——”

মুখে সব কথা ফুটিয়া বাহির হইল না,—দারুণ অভিমানে ও রোষে, তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

শক্তও অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের এই উক্তিতে আরও উত্তেজিত হইলেন। স্থান, কাল, সম্বন্ধ, পরিণাম,—সকলই ভুলিয়া. উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, এবার তিনি বলিলেন,—

“রাজপুত হইয়া রাজপুতকে মৃত্যুভয় দেখানো,—বিড়ম্বনামাত্র। বিশেষ, আমার মনের বল ও নির্ভীকতা-সম্বন্ধে, আপনার আরও কিছু অধিক জানা উচিত ছিল!—আমার বাল্যের সেই অতীত-কাহিনী কি আপনার মনে নাই? মহারাজ! মনে পড়ে কি,—খেলা ধূলার বয়সে, একবার পিতৃদেবের সমক্ষে, অস্ত্রের ব্যবহার পরীক্ষার জন্য, হাসিতে হাসিতে আমি সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা, আপন হস্তে বিদ্ধ করিয়া, খেলার সুখ অনুভব করিয়াছিলাম? আর আজ এই দীপ্ত যৌবনে, সত্যের মর্য্যাদারক্ষায় অক্ষম হইয়া, প্রাণভয়ে ভীত হইব,—মনে করেন? কেন, প্রাণ কি এতই প্রিয়?—আসুন আমিও প্রস্তুত আছি!”

প্রতাপের চক্ষু দিয়া ধক্ ধক্ আগুন জ্বলিতেছিল। তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—“আইস, আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। রাণা প্রতাপসিংহ কথা জানে না,—কাজ চায়।”

শক্ত। শক্তসিংহও তাহাই চায়! বুঝিলাম, পৃথিবীতে প্রতাপসিংহ ও শক্তসিংহ,—দুইজনের অস্তিত্ব থাকা, বিধাতার ইচ্ছা নয়!—হয়, প্রতাপ নয় শক্ত,—এই মুহূর্ত্তে, যেই হউক, ইহলোক হইতে অপসৃত হইবে।

চক্ষের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে, উভয় ভ্রাতা শাণিত কৃপাণ উন্মুক্ত করিয়া, পরস্পরের প্রাণসংহারার্থ দাঁড়াইলেন। উভয়ের তৎকালীন

সেই ভীম-ভৈরব-রুদ্র-মূর্ত্তি দেখিয়া, উপস্থিত দর্শকবৃন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, অন্তরে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে লাগিল।—সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়,—নির্ব্বাক্, নিশ্চেষ্ট, কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান।

অদূরে কেবল একটিমাত্র মহাপ্রাণীর হৃদয়-সমুদ্র আলোড়িত হইল। সেই একমাত্র মহাপ্রাণ, উন্নতমনা, পরহিতার্থী বীরপুরুষ, এই মহাপ্রলয়কর ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া, সর্ব্বনাশ হইল ভাবিয়া, আত্মহারা হইয়া, উন্মত্ত-বেশে সেইখানে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার সেই মহা মহত্ত্ব-ভাব-ব্যঞ্জক পরার্থপরায়ণ, পরম সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া, সকলেই সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল।

তারপর সেই পুরুষসিংহ, আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন,—যথায় সেই ক্রোধোন্মত্ত, অভিমানোদ্দীপ্ত, পরস্পরের রক্ত দর্শনে লোলুপ, দারুণ প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ভ্রাতৃদ্বয় উন্মুক্ত অসিহস্তে পরস্পরের প্রাণসংহারে উদ্যত,—সেই বিষম সন্ধিস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন। মহত্ত্ব-বিকশিত উদার করুণ নেত্রে একবার উভয়ের মুখ-পানে চাহিলেন।—'উপেক্ষা কর,—ধৈর্য্য ধর, দোহাই তোমাদের,—একজন ক্ষান্ত হও'—এই রকম একটা মর্ম্মান্তিক কাতরতা—একটা আন্তরিক ব্যাকুলতা, তাঁহার মুখে প্রতিভাত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজভ্রাতৃদ্বয় তখন উন্মত্ত হিতাহিত-জ্ঞান-রহিত;—পরার্থপরায়ণ সেই মহাপুরুষের সেই নীরব প্রার্থনা, তাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিল না;—বরং ইহাতে তাঁহারা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, অবিলম্বে আপনাদের সুদৃঢ় সংকল্প, কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইলেন।

নীরবে এই নারকীয় অভিনয় চলিতে লাগিল। নীরবে সকলে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। নীরবে আকাশ, মেদিনী, পর্ব্বত, বনস্থলী,—ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

জড়রাজ্যে সকলেই অচেতন;—এ রাজ্যে একের জন্যে অন্যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে জানে না;—কেবল প্রেমরাজ্যেই এই স্বর্গীয় অভিনয়

হইয়া থাকে। প্রেম কাজ চায়,—আপনাকে বিলাইয়া দেয়,—পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনাকে বলি দিয়াই পরিতৃপ্ত হয়।

এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সেই অগণিত নর-মুণ্ড, জড়-নেত্রে সেই প্রাণান্তকর শোচনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্যই যেন দাঁড়াইয়া রহিল,—কেবল একটি মাত্র মহাপ্রাণী, তাহার গতিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এক অভাবনীয় অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করিলেন।

রাজভ্রাতৃদ্বয় যেমন পরস্পরের প্রাণ হননে কৃতসঙ্কল্প,—রাজভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাণ রক্ষার জন্য, রাজকুলের হিতের জন্য, এবং মাতৃভূমি মিবারের মঙ্গলের জন্য,—সেইরূপ এই মহাপ্রাণীও কৃতসঙ্কল্প হইয়া, এক অভূতপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

সেই দুইদিকে উত্তোলিত—ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই দুই শাণিত উলঙ্গ কৃপাণ, —আর তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, জলদগম্ভীরস্বরে, এই মহাপ্রাণী কহিলেন,—

"তবে রাজা ও রাজভ্রাতা কেহই ব্রাহ্মণের মিনতি রাখিলে না? কেহই তবে মিবারের ভবিষ্যৎ ভাবিলে না? বৃথা অহংজ্ঞানে উন্মত্ত হইয়া নিজ শিব চরণে দলন করিতে উদ্যত হইলে? যাহা ইচ্ছা কর,—আমি কিন্তু আমার কর্ত্তব্য করিলাম। রাজপুরোহিত আমি,——বংশানুক্রমে আমরা রাজার হিতকামনা করিয়াই আসিতেছি,—আজও করিলাম। মহারাণা!——

প্রতাপ বাধা দিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে কহিলেন, "দেব! ক্ষমা করুন;—অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি,—আর উপদেশের সময় নাই। একটু অপেক্ষা করুন,—কার্য্যসমাপনান্তে আমি এখনি আপনার চরণ বন্দনা করিতেছি।—আয়, মিথ্যাবাদী, যশোলিপ্সু!"

প্রতাপ ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, শক্তের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"বটে!—আমি মিথ্যাবাদী যশোলিপ্সু, না—তুমি?"—বলিয়া শক্তও অসি চালনা করিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্যক্ পরিচয় দিলেন। উভয়েই অস্ত্রবিদ্যায় সুদক্ষ; তাই জয়-পরাজয়ে একটু বিলম্ব হইতেছে।—কিন্তু শীঘ্রই দুই জনের একজন,—অথবা দুই জনেই মৃত বা সাংঘাতিকরূপে আহত হইবেন, ইহা সুনিশ্চিত।

পরার্থপ্রাণ পুরোহিত এবার দ্বিতীয় শিষ্যকে কহিলেন, "শক্ত! মিনতি করি, ক্ষান্ত হও,—তুমিই না হয় জ্যেষ্ঠের— —"

তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, উন্মত্তের ন্যায় বিকট হাসি হাসিয়া, বাধা দিয়া শক্ত উত্তর দিলেন,—"যদি অবমাননাকারী জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহার করিতে পারি, তবেই ক্ষান্ত হইব,——এখন নহে!"

উভয়ের ঘোরতর অসি-যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

তখন সেই মহদাশয়, মহাপ্রাণ, রাজ-পুরোহিত, পুনরায় উভয়ের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা,—উভয়ের কেহই ক্ষান্ত হইলেন না।

এবার উন্মত্তবৎ হুঙ্কার করিয়া, পুরোহিত কহিয়া উঠিলেন,—

"বটে!—তবুও শুনিলে না?—উভয়ের কেহই, আমার কথা রাখিলে না? তবে, এখন আমার কাজ আমি করি!———হে আকাশস্থ দেবগণ! রাজ-ভ্রাতৃদ্বয়কে রক্ষা কর,—রাজকুলের মঙ্গল কর,—শিশোদীয়-বংশের রাজ-ছত্র অক্ষুণ্ণ রাখ! ইঁহারা জীবিত থাকিলে, কালে মোগলের করাল গ্রাস হইতে দেশ রক্ষা পাইবে,—জন্মভূমি স্বাধীন হইবে,—সমগ্র রাজপুতজাতির মুখ উজ্জ্বল হইবে! নচেৎ, এ আত্মদ্রোহের;——এ ভ্রাতৃরক্তের পরিণাম, বড়ই শোচনীয়! যাক্ এ নরকের আগুন!—— নিবে যাক্,—এ প্রতিহিংসার কালানল! এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের রক্তে যেন এ আগুন নির্ব্বাণ হয়! মা দয়াময়ি,—পরমেশ্বরি!"——

ও-হো-হো!—ব্রাহ্মণ! এ কি করিলে? বস্ত্রমধ্যস্থ ঐ শাণিত ছুরিকা,—অবলীলাক্রমে আপন বক্ষে বসাইয়া দিলে?

উপস্থিত দর্শকবৃন্দের, এতক্ষণে মুখ ফুটিল। এতক্ষণে চারিদিকে 'হায় হায়' রব পড়িয়া গেল।

"ও-হো-হো! কি সর্ব্বনাশ! ব্রহ্মহত্যা!—মহাপাতক!"—এইরূপ বিলাপধ্বনি, সকলের মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল।

রক্তের ফোয়ারা বহিল। ব্রাহ্মণের সেই সদ্যোনিঃসৃত উত্তপ্ত শোণিতধারা, ঊর্দ্ধমুখে ছুটিয়া, রাজভ্রাতৃদ্বয়ের অঙ্গ আর্দ্র করিয়া দিল। যেন হোলির দিনে, গাঢ় আবির গুলিয়া, পিচ্‌কারী করিয়া, কে তাঁহাদের গায়ে দিল!

এতক্ষণে উভয়ের চৈতন্য হইল। তাঁহাদেরই জন্যে ব্রাহ্মণ আত্মঘাতী!—যে সে ব্রাহ্মণ নহে,—সেই স্বধর্ম্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, উন্নতমনা, নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী কুল-পুরোহিত আজ আত্মঘাতী!—আর তাঁহারই সদ্যোনিঃসৃত উত্তপ্ত শোণিত, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে!

উভয়ের মনের ভাব তখন কিরূপ, পাঠক আপন মন দিয়াই তাহা বুঝিয়া লউন।

এই হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া, উভয়ের হাতের অসি হাত হইতে খসিয়া পড়িল।—চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল, জেদ্ নিবৃত্তি পাইল, মনে যথেষ্ট অনুশোচনা ও ধিক্কার জন্মিল।

দুইজনেই কিছুক্ষণ নীরব; নির্নিমেষ নয়নে ব্রাহ্মণের মৃতদেহ দেখিতে তৎপর; আপন আপন অবিমৃষ্যকারিতা স্মরণে কাতর।

যথাকালে প্রতাপের আদেশে, মহাসমারোহে, এই পরার্থপর, আত্মোৎসর্গকারী, ব্রাহ্মণ-বীরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন হইল। প্রতাপ সেই ব্রাহ্মণের সম্মানার্থ, তাঁহার পবিত্র চিতা-বেদিকার উপর, একটি স্মরণস্তম্ভ স্থাপিত করিলেন। অধিকন্তু ব্রাহ্মণের পরিবারবর্গকে একটি স্থায়ী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। আজিও সেই ব্রাহ্মণের বংশধরেরা, যথারীতি রাজ-বৃত্তি পাইয়া আসিতেছে।

এইবার প্রতাপ শক্তকে কহিলেন, "তুমি এখনি—এই মুহূর্ত্তেই আমার অধিকার হইতে প্রস্থান কর। অতঃপর, আমার রাজ্যমধ্যে যদি কেহ তোমাকে দেখিতে পায়,—জানিও, তাহা হইলে তুমি বন্দী হইবে, এবং যথোপযুক্ত রাজদণ্ড ভোগ করিবে।"

ঝটিকা থামিয়াছে। এখন উভয়েই শান্ত, স্থির, অচঞ্চল। একের সহিত অন্যের রাজা-প্রজা সম্বন্ধ,—এখন সহজেই উভয়ে ইহা বুঝিলেন।

শক্ত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, অবনতমস্তকে উত্তর দিলেন,—"রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

অনুচরবৃন্দের সহিত শক্ত তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রতাপ মনে মনে ভাবিলেন,—

"হায়! জীবন-যজ্ঞের উদ্বোধনেই এই বিভ্রাট! জানি না; ইহার সমাপ্তিতে কি আছে! অদৃষ্টে যাই থাক,—ব্রত গ্রহণ করিব! চিতোরের উদ্ধার ভিন্ন, ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে না! চিতোর-উদ্ধারই আমার জীবনের মন্ত্র। তবে, এই মন্ত্রের সাধন করিয়া জীবন সফল করি। ভরসা—ভগবান্!"
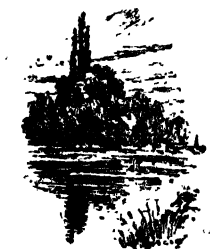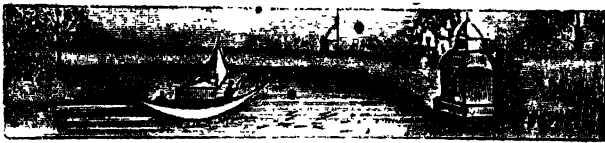
প্রথম খণ্ড—ব্রতগ্রহণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ভরসা—ভগবান্ বটে, কিন্তু কার্য্য চাই। বিনা কার্য্যে, বিনা উদ্যোগে, কে কবে, কোন্ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে? অতএব সর্ব্বাগ্রে কার্য্য চাই। 'সাধিলেই সিদ্ধি'—ইহা মহাজন-বাক্য। তবে, আমিও আজ হইতে দুর্জ্জয় সাধনায় মনোনিবেশ করিব। চিতোর উদ্ধারই আমার জীবনের ব্রত;—তবে আজ হইতে, প্রকৃত প্রস্তাবে, আমি এই ব্রত গ্রহণ করিব। রাজভোগ,—বিলাস-আনন্দ,—বিষয়-লালসা,—আজ হইতে নিশ্চয়ই দূরীভূত করিব। ভূমিশূন্য রাজা, আর শস্যশূন্য বসুন্ধরা,—উভয়ই সমান। রাজা!—রাজা!—কিসের রাজা আমি? হায়! আমার রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, উপায় নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই,—কিছুই নাই। বৃথায় এ নিষ্ফল মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছি!—বিনা অবলম্বনে, বিনা উদ্যোগে, মানুষ কি করিতে পারে?—না, চিতোর উদ্ধার, আমার জীবনের ব্রত!"

নির্জ্জন এক কক্ষে বসিয়া, গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া, প্রতাপ আপন

মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিতেছিলেন। কখন আশায়, কখন নিরাশায়, কখন উৎসাহে, কখন নিরুৎসাহে,—তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল। এমন সময় সর্দ্দার চন্দাবৎকৃষ্ণ সেই কক্ষে উপনীত হইলেন। সর্দ্দারকে দেখিয়া, প্রতাপের অন্তর-রুদ্ধ ভাব, আরও ঘনীভূত হইল। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—

"সর্দ্দার! আসিয়াছ,——ভালই হইয়াছে। আজ তোমাকে আমি, আমার মনের কথা বলিব। এ কথা আর কেহ শুনে নাই,——মন্ত্রীও না,—আজ তুমিই প্রথম শুনিবে। শোনার সহিত কাজও করিবে। দেখ, ক্ষুদ্র উদয়পুর-টুকুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া,—সোণার পিঞ্জরের মধ্যে বাস করা, আমার আর সহিতেছে না! স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে না পারিলে, আমার আর স্বস্তি নাই। মোগল দয়া করিয়া বোধ হয় আজও উদয়পুরটুকু দখল করে নাই,—নহিলে মিবারের আর রাখিয়াছে কি? সোণার চিতোর—রাজপুতজাতির গৌরবস্থল—পৃথিবীর নন্দনকানন,—পদতলে মথিত করিয়া,—রাজস্থানের অন্যান্য রাজন্যবর্গকে কৌশলে অধীন করিয়া, মোগল বোধ হয় উপহাস-চ্ছলে, উদয়পুরটির উপর আজও কৃপা-দৃষ্টি করেন নাই!———সর্দ্দার বীর! দেখ, আমি সব সহিতে পারি,—কেবল শত্রুর অনুগ্রহটুকু আমার নিকট বিষবৎ বোধ হয়।——তুমিই আমাকে রাজাসনে বসাইয়াছ,—আজ তোমারই সমক্ষে সেই রাজাসন ত্যাগ করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি।"

সর্দ্দার উৎসুকভরে কহিলেন, "মহারাজ! ব্যাপার কি,—হইয়াছে কি,—অনুগ্রহ করিয়া আমায় সব খুলিয়া বলুন।——জানেন ত, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রণে বনে,—সকল অবস্থাতেই, এ দাস আপনার পদানুসরণ করিতে প্রস্তুত,—দয়া করিয়া, আমায় সব কথা বুঝাইয়া বলুন।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতাপ কহিলেন, "সর্দ্দার! তোমার ঐ শেষ-কথাই, বুঝি আমায় কার্য্যে পরিণত করিতে হয়।—বনবাস ভিন্ন, উপস্থিত আমার মনে আর শান্তি নাই। বনবাস-সুখই এখন আমার প্রকৃত সুখ। সেই বনবাসী হইবার কথাই আজ তোমায় বলিতেছি।"

প্রতাপের সেই তেজোদ্দীপ্ত আঁখিযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। প্রভুভক্ত সর্দ্দারের অন্তর তাহাতে দ্রব হইল। তিনি একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, রাণার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতাপ পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

'শুন সর্দ্দার! প্রকৃত মহৎ ব্যক্তিই বনবাস ক্লেশ সহিতে পারে, ক্ষুদ্রের পক্ষে তাহা অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র হই আর মহৎই হই, এখন সত্য সত্যই আমাদিগকে বনবাসী হইতে হইবে। বনবাস-ব্রত-গ্রহণ ভিন্ন, চিতোর উদ্ধারের আর আশা নাই। কঠোর কষ্টসহিষ্ণুতা, সংযম, অনশন ও শরীর পাতন ভিন্ন, কেহ কোন বড় কাজ করিতে পারে না। চিতোর উদ্ধার জীবনের ব্রত করিতে হইলে, নিশ্চয় আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতার হাত এড়াইতে হইবে।"

সর্দ্দার। এ কথা সার কথা!

প্রতাপ। দেখ, এই ভারতে, মহামতি পাণ্ডব একদিন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। তারপর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—হয় রাজ্যলাভ, নয় বনবাস। কারণ তাঁহারা জানিতেন, এক—রাজ্যলাভে সুখ, আর—বনবাসে সুখ;—এ দু'য়ের মধ্যে যে সুখ,—অর্থাৎ মধ্যবিত্ত যে জীবন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে সুখ নাই। দারুণ কষ্টের মধ্যেও,—ঘোর বনবাস ক্লেশের মধ্যেও যে, একটি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুখ আছে, তাহা সকলে বুঝিতে পারে না।—কঠোর কর্ত্তব্যের দায়ে, এখন আমাকে তাহা বুঝিতে হইতেছে।

সর্দ্দার। মহারাণার কৃপায়, এ দাসও তাহা কতক কতক বুঝিতেছে।

প্রতাপ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া কহিলেন; "ঠিকই হইয়াছে।—জীবন-সহচর!—আনন্দ, আশা, উৎসাহ,—সিদ্ধিপথের সহযাত্রি! সর্দ্দার! সকল বিষয়ে আমি তোমার নিকট ঋণী।—তোমার ঋণ ইহজীবনে অপরিশোধনীয়।

সর্দ্দার। মহারাজ! অমন কথা বলিবেন না,—এ দাস আপন কর্ত্তব্য-পালন করে মাত্র।

উভয়ের এইরূপ গুরুতর বিষয়ে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় এক গুপ্তচর আসিয়া, অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ কিছু বিশুষ্ক, চক্ষু চঞ্চল ও উৎকণ্ঠিত।

প্রতাপ ইঙ্গিতে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

চর বলিল,—

"প্রভু! যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে।—উদয়পুরের প্রতিও মোগলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। শীঘ্রই নগরধ্বংসের আয়োজন হইবে। আর মহারাজ! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়,—কয়েক জন স্বদেশদ্রোহী রাজপুতকলঙ্কও ইহার মধ্যে সংলিপ্ত আছে! সেই পাপিষ্ঠগণের উৎসাহে ও পরামর্শে, মোগল এই দুরভিসন্ধি আঁটিতেছে।"

"ঠিকই হইয়াছে!"

সর্দ্দারের পানে চাহিয়া, যাতনাজড়িত একটু হাসি হাসিয়া, প্রতাপ কহিলেন, "ঠিকই হইয়াছে!—এমন নহিলে, আর ভগবানের মার কি?—যাও, তুমি এখন নিজস্থানে যাইতে পার।"

চর, সসম্ভ্রম অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

সর্দ্দার গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মহারাজ! সকলই অলক্ষণ দেখিতেছি।

প্রতাপ পুনরায় সেইরূপ কাতরতার হাসি হাসিয়া কহিলেন,—

"না সর্দ্দার! অলক্ষণ কি?—আমি ত সকলই সুলক্ষণ দেখিতেছি!—বিপদ যত অধিক আসে, ততই ভগবানের দয়া লাভ হয়। যে কিছু

বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার অভাব আছে, এইরূপ বিপদ ভগবানের দান ভাবিয়া, ক্রমেই তাহা পূরণ করিয়া লইতে পারিব।

এবার সর্দ্দারের মুখেও একরূপ অপরূপ হাসি দেখা দিল। তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া, আপনা আপনি ঈষৎ হাসিয়া উঠিলেন।

প্রতাপ কহিলেন, "হাসিলে যে?'

সর্দ্দার। এ হাসি, কিরূপ বুঝেন?

প্রতাপ। আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই কি ঠিক?

সর্দ্দার একটুখানি স্তব্ধ থাকিয়া, গম্ভীরভাবে কহিলেন,—

"মহারাণা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই ঠিক। দাসের এ হাসি, প্রভুর অন্তর্নিহিত মহাভাবের প্রতিবিম্ব মাত্র——আর্য্য! আপনার হৃদয় মহত্বের আকর,—আপনিই রাজপুতজাতির মুখ রাখিবেন।—এখন যাহা কর্ত্তব্য অবধারিত করিবেন, এ দাস তাহাই নতশিরে পালন করিবে।"

প্রতাপ। সেই কথাই বলিতেছিলাম।—দেখ, পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত উদয়পুরটি ত্যাগ করাই এখন আমাদের কর্ত্তব্য।

মনে মনে বলিলেন, "হায়! প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পিতা যদি চিতোরপুরী পরিত্যাগ না করিতেন? প্রাতঃস্মরণীয় জয়মল ও মহামতি পুত্তের ন্যায় তিনি যদি স্বদেশের জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতেন? তাহা হইলে আজ আর আমায় চিতোর উদ্ধারের জন্য বনবাস-ব্রত অবলম্বন করিতে হইত না।—হায় পিতঃ!"

অতঃপর প্রকাশ্যে কহিলেন, "সর্দ্দার! পূর্ব্ব হইতে যাহা ভাবিয়া রাখিয়াছি, চরের মুখেও তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাইলাম।—ক্রমে, এইরূপ আরও অনেক কথা শুনা যাইবে। তদপেক্ষা, পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হওয়াই ভাল। দুইদিন পরে যাহা হওয়া অবশ্যম্ভাবী, পূর্ব্ব হইতে সেজন্য প্রস্তুত থাকিলে, কষ্টবোধ হইবে না। উদয়পুরের আলোক নির্ব্বাণ করিয়া,—অন্ধকারে, বিজন বনে বাস করাই, এখন আমাদের যুক্তিযুক্ত।"

সর্দ্দার। মহারাণার এ আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

প্রতাপ। বাকী যাহা বলিবার রহিল, তাহা পরে বলিব।——শীঘ্রই এক বিরাট্ সভা আহ্বান করিতে হইবে।

তার পর মনে মনে কহিলেন, "আমার এই মহৎ সঙ্কল্প সকলের মনে ধরিবে কি ?

আপনা আপনি উত্তর দিলেন—"ধরিবে।"

তা বৈ কি! মহাপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত পথ, যতই দুর্গম ও দুরতিক্রমণীয় হউক না কেন, অনুসরণকারী ভক্তগণ প্রাণপাত করিয়াও, সেই পথে গিয়া থাকে। এইরূপ যাওয়াই স্বাভাবিক। আদর্শ গ্রহণের ধর্ম্মই এই।
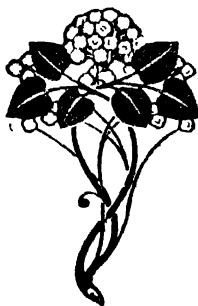
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উদয়পুর রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে, বিরাট্ এক সভা হইয়াছে। রাজ্যের ছোট বড়, সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত, ধনী দরিদ্র,—সমস্ত রাজপুত একত্র সমবেত হইয়াছে। রাজপুত বীরের এরূপ বিরাট্ সভা,—সমগ্র রাজস্থানের মধ্যে, আর কখনও হয় নাই। রাণা প্রতাপসিংহের অধিকারস্থ সমগ্র অধিবাসী, আজ এক মহামন্ত্রে আহূত হইয়াছে। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায়, সেই মহা লোকারণ্য অতি গম্ভীর ও নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে।

মহারাণা প্রতাপসিংহ রাজকীয় পরিচ্ছদে, উচ্চ মঞ্চোপরি রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহকারে, সমাগত লোকবৃন্দের মুখমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে রাজপুত প্রধানগণ এবং বিশিষ্ট সর্দারগণ আপন আপন আসনে উপবিষ্ট। কয়েকজন চারণও এই মহাসভায় সমুপস্থিত। প্রধান মন্ত্রী ভামশা, রাণার দক্ষিণে, গম্ভীরভাবে অবস্থিত। প্রতাপ সেই অগণিত লোক-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া, জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—

"রাজপুত বীরগণ! তোমরা কত কাল আর এরূপ নিশ্চেষ্ট—উদাসীনভাবে অবস্থিতি করিবে? কতকাল আর আপনাদের অস্তিত্ব ভুলিয়া, আলস্যবশে দিনের 'পর দিন কাটাইয়া যাইবে? মোগলের করালগ্রাস হইতে, চিতোর-উদ্ধার কি হইবে না? স্বর্গতুল্য সোণার চিতোর, কি চিরদিন অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে? হায়! এই স্বর্ণপুরী কি বিভূষণা বিধবা রমণীর ন্যায় রোদন করিবে? তবে আর আমাদের দেহধারণে ফল কি? বাঁচিয়া থাকিয়াই বা লাভ কি? রাজপুত জাতি যদি স্বদেশ-উদ্ধারে, স্বাধীনতা রক্ষায়,—জননী-জন্মভূমির দুর্গতি দূরকরণার্থে উদাসীন রহিল,—তবে সজীব ক্ষত্রিয় রক্ত তাহার ধমনীতে প্রবাহিত হয় কি জন্য?

"আইস,—আজ শুভদিনে, শুভক্ষণে ব্রত গ্রহণ করি। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন আমরা এক মহা অশৌচ-ব্রত গ্রহণ করিব। মহাগুরু পিতৃ মাতৃ-বিয়োগে আমরা যেরূপ শোকচিহ্ন ধারণ করি,—সর্ব্ববিধ বিলাসভোগে বঞ্চিত থাকিয়া, যেরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করি,—স্বদেশের কল্যাণ কামনায়,—আইস, আজ হইতে আমরা সেই মহাব্রতগ্রহণে কৃতার্থ ও ধন্য হই। সমগ্র মিবার এইরূপ সার্ব্বজনীন শোক-চিহ্ন ধারণ করিলে,—এইরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিলে,—একতার এইরূপ উচ্চ আদর্শ দেখাইলে,—একদিন না একদিন তাহার শুভফল ফলিবে! এ ব্রত গ্রহণের নাম—"মন্ত্রের সাধন।" স্বদেশের জন্য, স্বজাতির মঙ্গলের জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য,—এই মহামন্ত্র সাধন করিলে, জগদীশ্বর অবশ্যই আমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিবেন। মিবার আমাদের মাতৃভূমি,—জননী-স্বরূপা, সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি—সেই সোণার রাজস্থানের উৎকৃষ্ট অংশ—স্বর্গতুল্য চিতোর,—আজ মোগলের পদানত! মা আজ শত্রুকর্ত্তৃক নিগৃহীতা!—সেই মায়ের সন্তান হইয়া কি আমরা অধম কুলাঙ্গারের ন্যায় নিষ্ফল জড়জীবন বহন করিব?"

সেই অগণিত রাজপুত্রের গম্ভীর কণ্ঠ হইতে, এককালে, সমুদ্র-গর্জ্জনবৎ গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হইল,—"না, না, কখনই না,—চিতোরের উদ্ধারই আমাদের জীবনের ব্রত হইল।"

হর্ষোৎফুল্লবদনে প্রতাপ পুনরায় কহিলেন,—

"তেজস্বী ক্ষত্রিয়-জাতির মুখে এইরূপ কথাই শোভা পায়! এখন সেই অশৌচ-ব্রতের কথা শুন। যতদিন না আমরা চিতোর উদ্ধারে সমর্থ হই, ততদিন কোন প্রকার আনন্দ-উৎসব করিব না;—জননী-জন্মভূমির শোকে, ঠিক পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগজনিত বিষাদ-চিহ্ন ধারণ করিব। কেশ, শ্মশ্রু, নখর,—কখন ক্ষৌরস্পর্শ হইবে না। তরুপত্রে ভোজন ও তৃণ-শয্যায় আমাদিগকে শয়ন করিতে হইবে। পান-ভোজনের জন্য স্বর্ণ ও রজত-পাত্র সকল দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। সুখসেব্য বিলাস দ্রব্যাদি বিষবৎ বর্জ্জনীয়। পরিধানে সামান্য মলিন বসনে সকলকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কোন প্রকার উৎসব বা পর্ব্বাহ, আনন্দ বা উল্লাসে কেহ যোগ দিতে পারিবে না। এখন হইতে আর বিজয়োল্লসিত রণ-দামামা বা নাগরা সকল,—গর্ব্বভরে সৈন্যগণের পুরোভাগে বাদিত হইবে না,—অবসাদভরে বিষাদস্বরে তাহা সৈনিকগণের পশ্চাদ্ভাগে বাজিতে থাকিবে। ফলে, কোনরূপ আনন্দ উল্লাস, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা এবং প্রীতিময় ভাব-প্রবণতা,—এখন আর থাকিবে না। অন্তরে ও বাহিরে সত্যাশ্রিত ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া, সদাই অতি দীনতার সহিত সকলকে কাল কাটাইতে হইবে। এইরূপ সাত্ত্বিক দৈন্যভাবে থাকিয়া,—দীন হীন কাঙালের ন্যায় একান্তমনে অন্তরের অন্তরে প্রার্থনা করিলে, সেই দীনবন্ধু দয়াময় কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকিতে পারিবেন না। অবশ্যই তাঁহার আসন টলিবে,—অবশ্যই তিনি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। এইরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পরায়ণ রাজপুত-জীবন,—এক-দিন নিশ্চয়ই সিংহের বল সঞ্চয় করিতে পারিবে। তখন চিতোর

উদ্ধার করা কোন্ ছার,—সমগ্র আর্য্যস্থান রাজপুতের করায়ত্ত হইতে পারিবে।”

আবার সেই বিরাট-সভা সমস্বরে একবাক্যে কহিয়া উঠিল,—

“মিবারের মঙ্গলের জন্য, আমরা অবশ্যই এই মহাব্রত গ্রহণ করিব।”

প্রতাপ আশ্বাসিত হইয়া, দ্বিগুণ উৎসাহভরে আবার কহিলেন,—

“তবে, মিবারের এই উজ্জ্বল আনন্দ-আলোক নিবিয়া যাক্! মিবার গভীর আঁধারে আবৃত হউক। আজ হইতে মিবারের হাসিমুখ যেন আর কেহ দেখিতে না পায়। সমগ্র রাজ্য শ্মশান—মরুময় হইয়া যাক্—ইহার শ্রী, শোভা, সৌন্দর্য্য সকলই ভ্রষ্ট হউক। সুখীর আনন্দধ্বনি—দুঃখীর রোদন—সঙ্গীতের সম্মোহন সুর—শিশুর হাসি—দম্পতির প্রণয়-সম্ভাষণ—জনকজননীর স্নেহ ও আদর,—আর যেন এ রাজ্য জীবিত না রাখে। সন্ধ্যার দীপালোক, সুমঙ্গল গান, দেবার্চ্চনা, যাগ-যজ্ঞ ও মাঙ্গলিকব্রত,—উদয়পুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে,—কিছুরই যেন অস্তিত্ব না থাকে। যেন বিধাতার অমোঘ অভিশাপে সকলই বিগতজীবন ও স্বস্থানভ্রষ্ট হয়। কৃষক যেন আর কোন প্রকার চাষের কাজ না করে। শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা—স্বর্ণপ্রসবিনী মিবারভূমি যেন হৃতসর্ব্বস্বা হইয়া, নীরবে রোদন করিতে থাকে।—দেখি, তখন পাপিষ্ঠ মোগল এ বিজন অরণ্য লইয়া কি করে!”

প্রতাপের সেই তেজোদ্দীপ্ত বিশাল আঁখিযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল,—সভাস্থ সকলেও অশ্রুসিক্ত হইয়া অধোবদনে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

প্রতাপ পুনরায় কহিলেন,—

“ভ্রাতৃগণ! তথাপি নিরাশ হইও না,—কালে আবার সকলই পাইবে। আপাততঃ কিছুদিনের জন্য এ মায়া-মমতা ত্যাগ করিতে হইতেছে। যখন বুক ধরিয়া, সেই সোণার চিতোর ত্যাগ করিয়া, আজিও আমরা বাঁচিয়া আছি, তখন এই অকিঞ্চিৎকর রাজ্য ও রাজধানী ত্যাগ করিয়াও বাঁচিতে পারিব। বাস্তু-ভূমি ও পৈতৃক আবাস ত্যাগ করিতে প্রথমতঃ কিছু কষ্ট

হইবে বটে, কিন্তু এই নবব্রত-গ্রহণ করিলে, দুইদিন পরে সে কষ্ট আর থাকিবে না।—আরাবলীর উচ্চপ্রদেশে, কমলমীর-নামক দুর্গম গিরিসঙ্কটে, আমার এই নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই দুর্জ্জয় গিরিসঙ্কটে, পাপ মোগল সহজে কিছু করিতে পারিবে না।—পরন্তু এখন আমাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে মিবারের এই সমতলক্ষেত্রে বাস করিলে, পদে পদে আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। মোগলের লোলুপদৃষ্টি—সততই রাজস্থানের প্রতি ন্যস্ত। তার উপর,—বলিতে বুক বিদীর্ণ হয়,—অহো! তার উপর,—বহু রাজপুত-কলঙ্ক,—স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার,—মোগলের শরণাগত হইয়া, স্বজাতি ও স্বদেশের বিরুদ্ধে অসি উত্তোলিত করিয়াছে!——

ঝর্ ঝর্ করিয়া কয়েক ফোঁটা গরমরক্ত, জল হইয়া প্রতাপের সেই বিশাল চক্ষু হইতে ভূতলে পতিত হইল। স্বজাতির দুর্গতি স্মরণ করিয়া, সভাস্থ সকলের চক্ষেও জল আসিল।

প্রকৃতিস্থ হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে প্রতাপ আবার বলিলেন,—

"তবে ভ্রাতৃগণ! কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-গ্রহণের এই কি আমাদের উপযুক্ত সময় নয়? মারবার, অম্বর, বিকানীর,—সকলেই আজ আপনাদের জাতিগত অভিমান ও বংশমর্য্যাদা ভুলিয়া মোগলের গোলাম হইয়াছে!—বংশ পরম্পরাগত ক্ষত্রিয়-রক্ত জল করিয়া,—আপনাদের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া,—জাতি, ধর্ম্ম, আভিজাত্য, আচার, ব্যবহার,—সর্ব্ববিষয়ে জলাঞ্জলি দিতেছে। অধিক কি, কুলাঙ্গারগণ আপনাদের কন্যা, ভগিনী, এবং আত্মীয়া কুটুম্বিনীগণকেও যবন-করে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না!—এইরূপ হেয়, ঘৃণ্য, পশুতুল্য জীবন কি তোমাদের প্রার্থনীয়?"

সভার চারিদিক্ হইতে অতি দৃঢ়তার সহিত ধ্বনিত হইল—,

"না, না,—কখনই না,—এরূপ ঘৃণিত জীবন অপেক্ষা মৃত্যুও সহস্রবার বাঞ্ছনীয়।"

এবার প্রতাপ আরও উত্তেজিত স্বরে, আরও উৎসাহিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"তবে এই অপমৃত্যু অপেক্ষা, স্বদেশের জন্য, এই মহাব্রতগ্রহণ কি বাঞ্ছনীয় নহে ?"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়,———আজ হইতেই আমরা এই ব্রত গ্রহণ করিলাম।"

সভাস্থ সেই অগণিত রাজপুত, গম্ভীর গর্জ্জনে কহিয়া উঠিল,—

"আজ হইতে আমরা এই ব্রত গ্রহণ করিলাম। স্বদেশের চিরস্বাধীনতা রক্ষা ও চিতোর উদ্ধার করিতে না পারিলে, আমাদের ব্রত উদযাপিত হইবে না,—মহারাণার সাক্ষাতে—এই মহাধর্ম্মাধিকরণে, আমরা এ শপথ করিলাম।"

এবার প্রতাপ, হর্ষোৎফুল্ল ও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া,—আরও উচ্চ-কণ্ঠে, আরও গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—

"তবে একবার সকলে বদন ভরিয়া বলো,—

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'।"

তখন সেই সহস্র সহস্র রাজপুত, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, আকাশ-মেদনী কম্পিত করিয়া, এক বাক্যে বলিয়া উঠিল,—

"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

এইবার প্রতাপ, প্রধান চারণকে কি ইঙ্গিত করিলেন। চারণ আপন দলবল লইয়া, সেই বিরাট্ লোকারণ্য স্তম্ভিত করিয়া চারিদিক্ কাঁপাইয়া গাহিলেন,—

"শুভক্ষণ, শুভ মুহূর্ত্ত, মাহেন্দ্রযোগ !—এমন শুভদিন রাজপুতের আর হইবে না ! ব্রত গ্রহণ কর,—কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর,—স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় জীবন উৎসর্গ কর,—এমন অবসর আর মিলিবে না !

"অদূরে ঐ বিভূষণা বিধবা রমণীর ন্যায় সোণার চিতোরপুরী অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতেছে ;—মিবারের রাজলক্ষ্মীকে,—ঐ দেখ বিধর্ম্মী মোগল, শতপ্রকারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতেছে ;—ঐ দেখ স্বদেশদ্রোহী রাজপুত কুলাঙ্গারগণও তাহাতে যোগদান করিয়াছে ;—ক্ষত্রিয় বীর তুমি, —এ নির্ম্মম দৃশ্য দেখিয়াও কি তুমি অবিচলিত থাকিতে চাও ?"

"না-না-না—ব্রত গ্রহণ কর,—শক্তির উদ্বোধন কর,—মন্ত্রের সাধন কর,—স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় মনুষ্য বলিয়া গণ্য হও ;—সেই সর্ব্বমাঙ্গল্যের অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে !

"শুভক্ষণ,—শুভমুহূর্ত্ত,—মাহেন্দ্রযোগ !—এমন শুভদিন আর হইবে না ! ব্রত গ্রহণ কর, ব্রত গ্রহণ কর, ব্রত গ্রহণ কর।"

গান থামিল। কিন্তু সেই অগণিত রাজপুতের হৃদয়-যন্ত্রে কেবল এই ক'টি কথা বাজিতে লাগিল,—

"শুভক্ষণ,—শুভমুহূর্ত্ত,—মাহেন্দ্রযোগ !—এমন শুভদিন আর হইবে না ! ব্রত গ্রহণ কর, ব্রত গ্রহণ কর, ব্রত গ্রহণ কর।"

কথাগুলা শেষ, নেশার-মত, তাহাদের দেহ মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আহারে, বিহারে, তন্দ্রায়, নিদ্রায়,—রাজপুত-বীরের কাণে ও প্রাণে কেবল এই কথাই ধ্বনিত হইতে লাগিল,—

"ব্রত গ্রহণ কর, ব্রত গ্রহণ কর, ব্রত গ্রহণ কর।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই একদিনের এই একটিমাত্র ঘটনায়, মিবারে যুগান্তর উপস্থিত হইল। সমগ্র রাজপুতজাতি, আজ হইতে নবজীবন লাভ করিল। সকলেই কথামত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেইদিন হইতেই সকলেই আপন আপন আবাস-ভূমির মায়া মমতা বিসর্জ্জন করিল। একে একে, দু'য়ে দু'য়ে, দশে দশে, শতে শতে, সহস্রে সহস্রে,—প্রতাপের অধিকারস্থ সমগ্র রাজপুত, সেই দিন হইতে, উদয়পুর ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহ, জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাণা প্রতাপসিংহের নিদেশানুসারে, আরাবলী পর্ব্বত প্রদেশস্থ কমলমীরে এবং গণ্ডুণ্ডা প্রভৃতি দুর্গম গিরিসঙ্কটে, সেই দিন হইতে, সহস্র সহস্র রাজপুত, আপন আপন আবাস-কুটীর নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এবং অতি অল্পকালমধ্যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে, সমস্ত রাজপুত,—সেই শ্যামল শস্যপূর্ণ, শোভার ভাণ্ডার, সমতল মিবার-ভূমি ত্যাগ করিয়া,—বিজন অরণ্যে, সেই দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কমলমীরে প্রতাপের প্রধান রাজপাট স্থাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি পার্ব্বত্য-দুর্গও নির্ম্মিত হইল। নব রাজধানীর নূতন শোভা কিছুই নাই,—পরন্তু তথায় নিঃশব্দ দীনতা ও অনাড়ম্বর কষ্ট-সহিষ্ণুতা, মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল।

সমগ্র রাজধানীর মধ্যে, কোথাও একটী প্রাসাদ বা সামান্য একটী হর্ম্ম্যও নির্ম্মিত হইল না,—তৃণপত্র-নির্ম্মিত কুটীরই, রাজপুতজাতির প্রিয়-নিকেতন হইল। অন্যে পরে কা কথা,—স্বয়ং মহারাণা প্রতাপই, এই পর্ণকুটীরে বাস করিয়া, স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

আর এদিকে ?—এদিকে সেই বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত, নয়ন-রঞ্জন অসংখ্য সৌধশ্রেণী,—যে স্থান প্রতিনিয়ত আনন্দে উদ্ভাসিত এবং সঙ্গীত, উৎসব, ও লোক কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকিত,——মিবারের সেই অট্টালিকাশ্রেণী, জনমানবশূন্য হইয়া, বিশাল শূন্যতার মধ্যে দাঁড়াইয়া, আপন অসার জড়ত্ব অনুভব করিতে লাগিল। প্রভাতের সূর্য্য-কিরণ এবং সন্ধ্যার দীপালোক, সে গৃহ আর জাগাইয়া তুলিল না। বীরের বীরত্ব, গৃহীর মোহন মন্ত্র—আর তথায় ফুটিতে পারিল না। বিষয়ীর বিষম চিন্তা, ভগবদ্ভক্তের ভক্তি-নম্রতা আর তথায় প্রকাশ পাইল না। সমগ্র রাজস্থান যেন অনন্ত নীরবতায় লীন হইল।

রাণার কঠোর আদেশ,—যদি জনপ্রাণীকেও তিনি উদয়পুর ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের মধ্যে দেখিতে পান, তাহা হইলে, সেই হতভাগ্যের প্রাণদণ্ড হইবে। একে রাজাদেশ, তদুপরি সমগ্র রাজপুত সেই মহা ধর্ম্মাধিকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,—নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? দুর্ম্মতিবশে, এক দিন এক দুর্ভাগ্য মেষপালক এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া, অলঙ্ঘ্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

মেষপালকটি বোধ হয় মোগলের প্রলোভনে ও প্ররোচনায় এই রাজাদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইয়াছিল। তাহার দেখাদেখি ক্রমে আর আর সকলে এই রাজ নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া রাজ্যে অশান্তি আনয়ন না করে, বোধ হয় এই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, যাইহোক্, প্রতাপ সেই মেষপালকের শবদেহ বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিতে অনুমতি দিয়া, নিয়ম-লঙ্ঘনকারীদিগের ভয় ও বিভীষিকা উদ্রিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অধিকন্তু, তিনি মধ্যে মধ্যে

অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতেন,—তাঁহার এই আদেশ সম্যক্‌রূপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা।

সুতরাং, সারা-দেশ অচিরাৎ মহাশ্মশানে পরিণত হইল। উদয়পুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র স্থান—লোকশূন্য, প্রাণিশূন্য—নীরব, নিস্তব্ধ। বীরের সেই হুঙ্কারধ্বনি কিংবা নাগরিকগণের সেই উল্লাস-কোলাহল,—কোথাও কিছু নাই। শস্যশ্যামলা মেদিনী বিজন অরণ্যে পরিণত। উদ্যান, রঙ্গভূমি, পণ্য বীথিকা,—কাহারও অস্তিত্ব নাই। হাসি বা কান্না, সুখ বা দুঃখ, মত্ততা বা সংযম—কোন কিছুই নাই। হিংস্রক পশুগণ নির্ভয়ে চারিদিক বিচরণ করিতেছে। দিবারাত্রি সমান নীরবতা,——সমগ্র দেশকে বড়ই ভয়ঙ্কর করিয়া রাখিয়াছে। এই অনন্ত নীরবতার রাজ্যে, প্রতাপ মধ্যে মধ্যে এক এক দিন আসিতেন,—এবং নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া, আপন ব্রত উদযাপনের জন্য অধিকতর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইতেন।

সেই অনন্ত নীরবতার মধ্যে দাঁড়াইয়া, নীরব ভাষায়, এক এক দিন তিনি বলিতেন,—

"হায়! আমার জন্যই আজ রাজ্যের এই দশা! পৈতৃক রাজধানী, সাধ করিয়া আমি শ্মশানে পরিণত করিলাম!——কিন্তু যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিতেছে,—হে অন্তর্যামী দেবতা!—তাহা তুমি সকলই অবগত হইতেছ,——আমি নিরর্থক এ রাজ্য শ্মশান করি নাই! এই শ্মশানস্থ স্তূপীকৃত ভস্মরাশির মধ্যে নীরবে যে অগ্নিকণা জ্বলিতেছে, তাহা একদিন সমগ্র মোগল সাম্রাজ্য ছারখার করিতেও পারে। আশা পূর্ণ না হোক্,—কাপুরুষের ন্যায় ভোগসুখে মত্ত থাকিয়া, নিষ্ফল দেহভার বহন করিব না। মন্ত্রের সাধন—প্রাণপাত করিয়াও চিতোর উদ্ধার করিব! আমার হৃদয়-সমুদ্র মথিত করিয়া কে যেন বলিতেছে,—'যত্ন করো, রত্ন মিলিবে,—যাহা গিয়াছে, তাহা আবার মিলিবে!' মা জন্মভূমি! দুর্ব্বল সন্তানের হৃদয়ে বল দাও জননি!"

হায়, উদয়সিংহ! তুমি যদি রাণাকুলে জন্মগ্রহণ না করিতে! প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, তুমি যদি চিতোর ফেলিয়া, পলাইয়া না আসিতে! তাহা হইলে আজ আর তোমার পুত্রকে মনের দুঃখে, এই যৌবনেই, সন্ন্যাসী—বনচারী হইতে হইত না।

পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, আজ পুত্র সাধন করিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাস, প্রতাপসিংহকে অনন্ত কালের জন্য, বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় করিয়া রাখিবে।
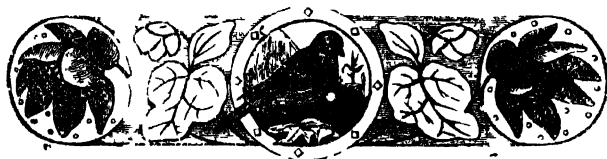
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাঠক অবশ্যই এত শীঘ্র শক্তসিংহকে বিস্মৃত হন নাই। সেই মর্ম্মাহত, তাড়িত ও অপমানিত রাজভ্রাতার পরিণাম কি হইল, একবার দেখা যাউক।

রাজ-পুরোহিতের শোচনীয় মৃত্যুতে প্রতাপ যেমন মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, রাজভ্রাতা শক্তও তেমনি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। অধিকন্তু, প্রতাপ তাঁহাকে স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত—নির্ব্বাসিত করিলেন,—এ অপমান, এ মর্ম্মান্তিক কষ্ট,—শত সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায়, শক্তকে অধীর করিয়া তুলিল। ক্রমে সেই অধীরতা, দারুণ প্রতিহিংসায় পরিণত হইল। রাজপুত বীরের প্রতিহিংসা,—ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের প্রতিহিংসা,—অপমানিত, নির্য্যাতিত জ্ঞাতির প্রতিহিংসা,—শেষে বড় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল।

অশ্বারোহণে, উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে শক্ত পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতেছেন।—দিনের পর দিন গেল,—কত পর্ব্বত, কত অরণ্য, কত উপত্যকা, কত জনপদ তিনি অতিক্রম করিলেন;—একরূপ অনাহার ও অনিদ্রায় তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল,—উত্তরোত্তর তিনি অধিকতর উত্তেজিত

ও সঙ্কল্পপরায়ণ হইয়া উঠিলেন;—অচল, অটল পর্ব্বতের ন্যায় তিনি দৃঢ়চিত্ত হইলেন। শেষ সেই অপমানিত ও নির্য্যাতিত অভিমানী রাজপুত-বীর, যে পথ অবলম্বন করিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও কষ্ট হয়। হায় নিষ্ঠুর অভিমান!

সারাদিন পর্য্যটন করিয়া,——দুশ্চিন্তা, অনাহার ও রৌদ্রে ক্লিষ্ট হইয়া,—শান্ত, স্নিগ্ধ, অপরাহ্ণে,—শক্ত এক নির্জ্জন পর্ব্বত উপত্যকায় উপবেশন করিলেন। অদূরে শান্তি-প্রদায়িনী নির্ঝরিণী-জল—কল্ কল্ ছল্ ছল্ করিয়া বহিতেছে; সেই মধুরস্বরে পরিশ্রান্ত ব্যক্তির, স্বভাবতঃ সকল ক্লান্তিই দূর হয়;—নিদ্রালসে শরীর মন—সকলই এলাইয়া পড়ে।—কিন্তু দুর্ভাগ্য শক্তের ভাগ্যে আজ তাহা ঘটিল না। প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য, তিনি অবশ্য অনেক চেষ্টা করিলেন। অশ্বকে নিকটস্থ এক শাল-বৃক্ষে বন্ধন করিয়া নির্ঝরিণীজলে হাত মুখ প্রক্ষালন করিলেন;—অতঃপর বিশ্রামলাভার্থ এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন।——গম্ভীর গিরিরাজী উন্নত মস্তকে গগন স্পর্শ করিতে উদ্যত; গম্ভীর বনস্থলী প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যরক্ষায় নিরত; গম্ভীর নীলাকাশ,—অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের বিচিত্র কিরণ হইতে ক্রমশঃ বঞ্চিত;——চারিদিকের এই গাম্ভীর্য্যের সহিত আবার বিষম নীরবতা ও বিষম নির্জ্জনতা;——প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাগাম্ভীর্য্যের সহিত, গম্ভীর গুরুতর চিন্তার সংযোগ;—. সুতরাং শক্তের সে বিষম ক্লান্তি দূর হইল না, পরন্তু কিছু বৃদ্ধি পাইল। বাহিরে তিনি কিছু শীতল হইলেন বটে,—কিন্তু অন্তরের অন্তরে দারুণ দাবানল দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিল। সেই স্থান, সেই কাল, আর সেই শক্ত,——অপমানিত, নির্য্যাতিত, অভিমানী শক্ত,——প্রকৃতির সেই গাম্ভীর্য্যময়ী, শান্ত, স্নিগ্ধ, রমণীয় মূর্ত্তি,—শক্তের অন্তরের অন্তরস্থ অভিমানের আগুন নিবাইতে পারিল না।

হায়,—অনর্থকর অভিমান!

শক্ত ভাবিলেন,—

"ওঃ! কি অপমান! কি মর্ম্মান্তিক জ্বালা! ভাই হইয়া ভাইয়ের প্রতি এই ব্যবহার? এই প্রভুত্বের অহঙ্কার! এত দম্ভ! এত তেজ!—না, তেজ কৈ? সত্যের মর্য্যাদারক্ষা ত হইল না!——তেজ কৈ? প্রকৃত তেজস্বী পুরুষ কি কখন, নিষ্ফল অভিমান বজায় রাখিবার জন্য, সত্যের অপলাপ করে? না তেজ নহে,——উহা নীচজনোচিত আত্মপ্রতারণা!"

পাঠক বুঝিয়া লইবেন, শক্তের মনে এখনও ধ্রুব বিশ্বাস, তাঁহার লক্ষ্যেই বরাহশিকার হইয়াছে,—প্রতাপ তাহা 'নয়' বলিয়া আপন কৃতিত্ব প্রচারে প্রয়াসী।

হায়,—তীব্র জ্বালাময় অভিমান!

উত্তেজিত শক্ত আবার মনে মনে বলিলেন,—

"ধিক্ রাণা নামে! ধিক্,—রাজ-মুকুটে! সত্যের মর্য্যাদারক্ষায় যাঁহার প্রাণ উচ্ছ্বসিত না হয়,—অন্যের কৃতিত্ব গোপন করিয়া, যে, নিজে বড় হইতে চায়,—সে, পৃথিবীর সম্রাট্ হইলেও, কৃপার পাত্র!——তবে কি ভ্রাতৃকৃত অপমান ভুলিয়া যাইব? 'কৃপার পাত্র' বলিয়া, কি তবে ভাইকে কোল দিব? হা! তাহারই বা পথ কৈ? উদয়পুরের রাণা—আমার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র যে, সে পথও রাখেন নাই। পুণ্যপ্রাণ পুরোহিতের সেই শোচনীয় মৃত্যুর পর তিনি যে——"

ভাবিতে ভাবিতে শক্তের চক্ষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল! হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিল; আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, বিকট নিশ্বাসের সহিত শক্ত বলিয়া উঠিলেন,—

"তিনি যে, সর্ব্বজন সমক্ষে, হেয় কাপুরুষজ্ঞানে, আমাকে শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় বিতাড়িত করিলেন!—"তুমি এখনি এই মুহূর্ত্তে, আমার অধিকার হইতে প্রস্থান কর!"—এই গরলময়ী উক্তি, বিষাক্ত শেলের

ন্যায় অহরহ আমার বক্ষে বাজিতেছে। যেরূপে হউক, এ শেল উৎপাটিত করিব।——"অতঃপর আমার রাজ্যমধ্যে, যদি কেহ তোমাকে দেখিতে পায়,—জানিও, তাহা হইলে তুমি বন্দী হইবে, এবং যথোপযুক্ত রাজদণ্ড ভোগ করিবে!"——বজ্রকঠোর এই দম্ভপূর্ণ আজ্ঞা, এখনও আমার কাণে বাজিতেছে!——ভুলিয়া যাইব?—এ অপমান, এ নির্য্যাতন, এ নিষ্ঠুরতা,—ভুলিয়া যাইব? ক্ষত্রিয়রক্ত দেহে ধারণ করিয়া, এ মৃত্যুতুল্য অপমান, ভুলিয়া যাইব? ওহো! ভোলাটা কি এত সহজ?—অপমান, নির্য্যাতন, সত্য-বিড়ম্বন—ভুলিয়া যাইব? আর ভুলিয়া বাঁচিয়া থাকিব? কেন, জীবন কি এতই প্রিয়? বাঁচিয়া থাকা কি, এতই প্রার্থনীয়? অপমানিত ঘৃণিত জীবনে,—প্রয়োজন? কোন্ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে? পৃথিবীর কোন্ কাজে আসিবে? না,—প্রতিশোধ চাই,—প্রতিশোধ চাই,—প্রতিশোধ চাই!"

শেষ কথাটি, উদ্‌ভ্রান্ত শক্ত এত দৃঢ়তার সহিত উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন যে, পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে তাহার প্রতিধ্বনি হইল,—'প্রতিশোধ চাই!' বৃক্ষের পত্রে পত্রে তাহা ঝঙ্কার করিল,—'প্রতিশোধ চাই!' নির্ঝরিণীর সেই কল্ কল্ তান থামিয়া গিয়া বারেকের তরে, যেন তাহা হইতে ধ্বনিত হইল,—'প্রতিশোধ চাই!' সকলধ্বনি একত্র হইয়া ব্যোমপথে মিশিয়া গেল, এবং তাহাই যেন বায়ুভরে শক্তের কাণের কাছে আসিয়া বারংবার বলিতে লাগিল,—'প্রতিশোধ চাই,'—'প্রতিশোধ চাই'—'প্রতিশোধ চাই!' শক্তের প্রাণেও যেন সেই স্বরের শেষ অংশটি বাজিতে লাগিল,——'চাই',—'চাই',—'চাই'!

হায়—সর্ব্বধ্বংসকারী অভিমান!

শক্ত আবার মনে মনে বলিল, "প্রতিশোধ চাই! এ অপমানের প্রতিশোধ জন্য, হৃদয়ে প্রতিহিংসা-বহ্নি ধারণ করিতে হইবে।——হাঁ, কালানল চাই,—নরকের আগুন প্রজ্বলিত করা চাই! নহিলে, আমি

জুড়াইতে পারিব না। ভ্রাতৃরক্তে,—আমার জ্যেষ্ঠ—প্রতাপের রক্তে এ আগুন নির্ব্বাণ হইবে।”

হায়,—চণ্ডালতুল্য অভিমান!

হতভাগ্যের মনে অবিশ্রান্ত উত্তপ্ত তরঙ্গ উঠিতেছে। শক্ত এখনও পাপ-চিন্তায় রত;—“কিন্তু, কিরূপে মনের বাসনা পূর্ণ করি? সে, রাজ্যেশ্বর,—সহস্র সহস্র রাজপুত-বীরের প্রভু,—আর আমি? আমি এখন দীন হীন—পথের কাঙ্গাল!———হায়! কিরূপে অভীষ্ট সিদ্ধ করি?”

হতভাগ্য আপনা হইতে উত্তর পাইল,—“তা হইলই বা সে রাজ্যেশ্বর! মন লইয়া না কথা? আমি মনে করিলে, কি না করিতে পারি? আন্তরিক যত্ন থাকিলে, কোন্ কার্য্য অসিদ্ধ হয়? পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ইহকাল পরকাল,—এসব বিচার, এখন আমি করিব না,——যেরূপে হোক্, প্রতিশোধ চাই!——কিন্তু পথ কি?—উপায় কি?”

হিংসার বশে মানুষ সকলই করিতে পারে। পাপিষ্ঠ শক্ত এবার ভাবিল,—“এক উপায় আছে—আকবরের শরণাপন্ন হই,—মোগলের বশ্যতা স্বীকার করি;—তবেই আমার মনের কালি ঘুচিবে! কিন্তু———”

হতভাগ্যের বুকের ভিতর একবার কেমন করিয়া উঠিল। এবার কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “কিন্তু বিধর্ম্মী যবনের আশ্রয়গ্রহণ করিব? ভায়ের উপর রাগ তুলিতে গিয়া, স্বজাতি ও স্বদেশের শত্রু হইব? ঘরভেদী বিভীষণ হইয়া, কুলাঙ্গার নাম ধারণ করিব?”

আমার এক সুরসিক মাতাল-বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, ‘মদ ছাড়িলাম’ বলিয়া দৃঢ়চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিয়াও, সময়ে সময়ে তিনি অভাবনীয়রূপে মদের প্রলোভনে পড়িতেন। একদিনের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,—“প্রাতঃস্নানের পর, পূজা-আহ্নিক শেষ করিয়া, বেশ

শুদ্ধ অন্তরে বসিয়া, একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছি,—চোখ্ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে,—এমন সময় ভৃত্য আসিয়া, ভালমানুষটির মত জানাইল, 'হুজুর! এই পাকা কদ্‌বেলটা এইমাত্র গাছ থেকে পড়িল।' ফল রাখিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। পাকা কদ্‌বেল দেখিবামাত্র, আমার মদ্যপান-লালসা বলবতী হইল। মনে মনে বলিলাম, 'হায় সয়তান! এত খেলাও তুমি জানো!—আজ কদ্‌-বেল-রূপ ধরিয়া আমায় ছলিতে আসিয়াছ!——' যা হোক্,—অনেক চেষ্টায়, আমি সেদিন ঐ প্রলোভনের হাত এড়াই।"

মাতাল-বন্ধু সরলমনে তাঁহার একদিনের যে কাহিনীটি আমায় বলিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সয়তানের এই অভাবনীয় ষড়যন্ত্র, আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। অথবা সয়তানের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই,—সর্ব্বমঙ্গলময়ী বিশ্বজননী মা-আমার সময় বিশেষে মায়া-আবরণে এই সয়তানের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানকে ছলিতে আসেন। সে পূর্ব্ব জন্মে চাহিয়াছিল বলিয়া ছলিতে আসেন। মা যে আমার কল্পতরু! তাই সেই কল্পতরু চোরের নিকট চোর, সাধুর নিকট সাধু। যার যা ভাব, তার তাই লাভ হয়।

সুযোগ বুঝিয়া, শক্তের মনের উপরও আজ সয়তান এইরূপ আধিপত্য স্থাপন করিল। শক্ত নাকি সঙ্কল্পসিদ্ধির পথে মনে মনে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, আর সয়তান-রাজ্যে এই নাকি তাঁহার প্রথম প্রবেশ; তাই তিনি এই দারুণ দুরভিসন্ধির হাত এড়াইতে পারিলেন না। পরন্তু এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহা দেখিয়া, সেই রাজপুতবীর,—স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার হইতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না।

যে শিলাখণ্ডে বসিয়া, প্রতিহিংসা-পরায়ণ শক্ত, আপন মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে, তাহার অনতিদূরে এক ভীষণ কালসর্প, আপন বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, প্রাণিহিংসা করিতে না পাইয়া, অনন্যোপায়ে, এক

প্রস্তরখণ্ডে দংশন করিল। প্রথম দংশনে কতক বিষ উদ্গিরণ হইল; তারপর পুনরায় দংশন,—ক্ষোভে, রোষে, সেই প্রস্তর খণ্ডের চারিদিক বেষ্টন করিয়া, গজ্জিতে গর্জ্জিতে, আবার দংশন! এইরূপ পুনঃ পুনঃ দংশনে, যখন বুকের বিষ অনেকটা বাহির হইয়া পড়িল;—পরন্তু, সে দংশনে যখন সেই কঠিন প্রস্তরখণ্ডের কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হইল না,—বাড়ার ভাগে, সাপের দুই একটা বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তাহার মুখ দিয়া খানিকটা রক্ত বাহিব হইল,—তখন সেই মহা খল, নির্বীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়া সুড় সুড় করিয়া, এক লতামণ্ডপের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল এবং বোধ হয় একটু আরামও পাইল।

সাপ ও সয়তানে যে, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা সংসার-বসাভিজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ অবগত আছেন। পরন্তু, সাপ হইতেও সয়তান যে, অধিকতব শক্তিমন্ত, তাহাও তাঁহারা জানেন। মূর্খ শক্ত, আজ সেই শয়তানের মোহে আকৃষ্ট হইল।

শক্ত মনে মনে ভাবিল,—

"এই সাপও দেখিতেছি, হিংসাবশে, কঠিন উপলখণ্ডেও দংশন করিতে পরাঙ্মুখ নয়!——আর আমি মানুষ হইয়া, মানুষের প্রতি প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারিব না?—অবশ্যই পারিব।——ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য অতলজলে নিমজ্জিত হউক;—স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বজাতিপ্রিয়তা গভীর আঁধারে ডুবিয়া যাক্;—প্রতিহিংসা চাই,—প্রতিশোধ চাই,—মনের কালি ঘুচানো চাই! ভ্রাতৃস্নেহ, সৌহার্দ-প্রেম, মনুষ্যত্ব,—রসাতলে যাক্;—প্রতিহিংসা চাই,—প্রতিশোধ চাই,—মনের কালি ঘুচানো চাই! বিধর্ম্মীর আনুগত্য স্বীকার করি,—বংশমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিই,—মিবারের শত্রু হই,—তথাপি প্রতিহিংসা চাই,—প্রতিশোধ চাই,—মনের কালি ঘুচানো চাই!——দেখিব দাম্ভিক প্রতাপ! তোমার দম্ভ, স্পর্দ্ধা, কর্তৃত্ব-অভিমান, আর কিরূপে থাকে! যাই,—অগ্রে মোগল-সম্রাট

আকবরের সহিত মিলিত হই,—তারপর তোমাকে সিংহাসন-ভ্রষ্ট—পথের ভিখারী করিব,—তবে আমার নাম শক্তসিংহ!"

চারিদিকে বিষের বাতাস বহিল। সে প্রাণঘাতী তীব্রগন্ধে, বনের পশুও বুঝি, অস্থির হইল। চারিদিকের সেই গম্ভীর অটল গিরিশ্রেণী,—বারেকের জন্যে, সে গুলিও বুঝি, শিহরিয়া উঠিল। সেই শান্তিপ্রদ, নির্জ্জন, রমণীয় স্থান,—কিছুক্ষণের জন্য মাধুর্য্যবিহীন হইল।

মূর্ত্তিমান্ নরক তথা হইতে অন্তহিত হইল। স্বজাতি ও স্বদেশের সর্ব্বনাশসাধন করিতে, পাপিষ্ঠ শক্ত, যথাকালে দিল্লী পঁহুছিল,——এবং দিল্লীশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিয়া, অভীপ্সিত কার্য্যসাধনের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

হায়,—নারকীয় অভিমান!

কিন্তু সে অভিমান কৈ? যে উচ্চ অভিমানে, ধ্রুব—ধ্রুবলোক পাইয়াছিল;——পাণ্ডব-বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের কষ্ট সহিয়াও, ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুকুল নির্ম্মূল করিয়াছিল;——বিশ্বামিত্র অভূতপূর্ব্ব তপস্যায় ত্রিজগৎ কম্পিত করিয়াছিলেন;——কৈ, কোথায় সেই অভিমান? কোথায় সেই বিশ্ববিজয়ী আগুন? অভিমান করিতে হয় ত, ঐরূপ অভিমানই করিও।——যাহাতে প্রকৃত বড় হইতে পার, সেইরূপ অভিমানই করিও।———নচেৎ শক্তের ন্যায় নীচতা, কাপুরুষতা ও অধর্ম্ম-উদ্দীপক অভিমানে আত্মহারা হইও না। উহা ঠিক অভিমান নহে,—উহার খাঁটীনাম—আত্মপ্রবঞ্চনা।

তোমার আর সহস্র দোষ থাকুক,—জীবনে তুমি কখনও আত্মপ্রবঞ্চক হইও না।
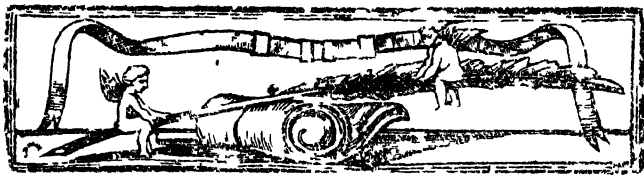
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বতময় কমলমীরে,——উদয়সাগর নামক সুবিস্তৃত, সুদৃশ্য সরোবর তীরে,——শিশোদীয়কুলের উজ্জ্বল রত্ন, নবরাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। সেই দুর্গম অরণ্যময় গিরিসঙ্কটে, সেই ভয়াল হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে, রাজপরিবারের আবাসস্থান নির্ম্মিত হইল। উদয়পুরের সেই সুধাধবলিত সুরম্য প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, তৃণপত্রবিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুটীরে, মহারাণা সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ-মহিষী লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বাংশে স্বামীর যোগ্যা। বিপদে স্থির, দুঃখে অবিচলিতা, স্বামীর জীবনব্রতে সহকারিণী,—সেই মহামহিমময়ী, আর্য্যরমণী,—অকাতরে বনবাসক্লেশ সহিতে লাগিলেন। স্বামীর উচ্চসঙ্কল্পের সহায় হইয়া, সেই মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণু প্রতিমা,—আপন পুত্র-কন্যাগণকে লইয়া,—অম্লানবদনে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার ঝিয়ারী, রাজ-কুল-লক্ষ্মী, সতীসাধ্বী—স্বামীর সহিত সমানভাবে নবব্রত গ্রহণ করিলেন।—এতটুকু বিরক্তি, এতটুকু অসহিষ্ণুতা, এতটুকু কষ্টানুভব,—তাঁহাতে রহিল না।

মহানুভব প্রতাপ সহধর্ম্মিণীর এ কঠোর আত্মত্যাগ দেখিলেন। বুঝিলেন, তাঁহার ব্রতগ্রহণ নিষ্ফল হইবে না। কেন না, ধর্ম্মাচরণে পত্নী পতির সহায় হইয়াছেন।

অবশ্য, প্রথম প্রথম প্রতাপের শিশুসন্তানগুলির বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। সেই সুকুমার রাজ্য শিশুগণ, অনভ্যাসবশতঃ, প্রথম প্রথম সর্ব্ববিষয়েই কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। অরণ্যপর্ব্বতময়, নূতন স্থানে আগমন, বন্য ফল মূল ভক্ষণ, তৃণাঙ্কুরে বিচরণ, পর্ণকুটীরে বাস,—সকল বিষয়েই তাহাদের বড় বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। সেই নবনীত দেহ, বিকশিত কমলগুলি,—কেমন ম্লান ও মলিন হইয়া পড়িল। প্রতাপ, সোণারচাঁদ শিশুগুলির অবস্থা দেখিলেন, বুঝিলেন,—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, নীরবে কাহাকে কি জানাইলেন।

একদিন স্বামী স্ত্রীতে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল;——

প্রতাপ বলিলেন, "প্রিয়ে, বড় দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। আমার ভাগ্যের সহিত সমগ্র মিবারের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। জানি না, জগদীশ্বরের মনে কি আছে!"

সাধ্বী সহধর্ম্মিণী উত্তর দিলেন,—"জগদীশ্বরের মনে ভালই আছে। শুভসঙ্কল্পের ফল কখনই বিফল হয় না। স্বামিন্, তোমার এ মহৎ আত্মত্যাগের ফল অবশ্যই ফলিবে।"

প্রতাপ। সতি! দিবানিশি ত এই প্রার্থনাই করি। দেখ, উচ্চ আশায় বুক বাঁধিয়া আমি মিবারের আনন্দ-আলোক নির্ব্বাণ করিয়াছি,—— সমগ্র মিবার শ্মশানে পরিণত করিয়াছি! আমারই প্রবর্ত্তনায় মিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিকার চিত্তে আমার সহিত বনবাসী হইয়াছে। আশা,—চিতোর উদ্ধার করিয়া, কালে একদিন সম্পূর্ণ স্বাধীন জাতি বলিয়া, জগতে পরিগণিত হইব। কিন্তু হায়! কে জানে, আমার এ অতিউচ্চ আশার উপর, বিধাতা অলক্ষ্যে নিষ্ঠুর হাসি হাসিতেছেন কি না!"

মহিষী রাণার পদসেবা করিতে করিতে, সহানুভূতি-সূচক কোমল-স্বরে কহিলেন, "স্বামিন্! অমঙ্গল আশঙ্কায় ভগ্নপ্রাণ বা নিরুৎসাহ হইও না,—মা ভবানী নিশ্চয়ই তোমার মনস্কাম পূর্ণ করিবেন।"

প্রতাপ। প্রিয়ে, বড় দুঃখ এই, স্বজাতিই স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিল! হায়, এ বিষ-দহনের ঔষধ কোথায়? অধিক কি,—সংবাদ পাইলাম, হতভাগ্য শক্ত,—আমার উপর রাগ তুলিতে গিয়া,—দেশের সেই চির-শত্রু মোগল আকবরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে!—আর সাগরজী প্রভৃতি আমার অন্যান্য জ্ঞাতিভ্রাতা-দিগের ত কথাই নাই—চারিদিকেই দেখিতেছি, ঘোর অন্ধকার।

লছ্‌মী দেবী। স্বামিন্, তোমার এই নবব্রতের পুণ্যালোকে এ অন্ধকার সরিয়া যাইবে।—আবার সৌভাগ্য-আলোকে সমগ্র মিবার হাসিতে থাকিবে——দুঃখ কি নাথ!

এই সময়ে প্রতাপের দুইটি শিশু পুত্রকন্যা খেলা ধূলা করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। পুত্রটীর বয়স পাঁচ বৎসব, কন্যাটির বয়স তিন বৎসর। তাহারা আসিয়া আধ-আধস্বরে, সোহাগভরে, জনক জননীকে একটা মীমাংসার ভার দিল। ছেলেটি আসিয়া, মায়ের অঞ্চল ধরিয়া, করুণাপূর্ণ নয়নে কহিল "হাঁ মা, আমাদের নাকি চিরদিনই এই রকম পাতার ঘর,—আর খড়-কুটোর বিছানা?——সীতা মা, সদ্দার বুড়োর কোলে ব'সে এই কথা জিজ্ঞাসা করে।"

আধ-আধস্বরে কন্যাও অমনি, পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, আদরের চুমা খাইয়া, পাল্‌টি জবাব দিল, "কেমন বাবা, না?—আমাদের নাকি আবার রাজার মত বাড়ী ছিল?—রাজার-মত শোবার বিছানা ছিল?—ওকি বাবা! তোমার চোখে জল কেন? সেদিন সর্দ্দার দাদার চোখেও এই রকম জল দেখেছিলুম। তা বাবা, আমি আর তোমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো না।—জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বুঝি তোমার কষ্ট হয়?"

স্বামীর ক্রোড় হইতে স্নেহময়ী কন্যাকে লইয়া, লছ্‌মিদেবী, কন্যাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্ত বলিলেন, "দেখ্ ত মা সীতা, আমার চোখে কি প'ড়েছে"

মধুমাখা কথায় সীতা কহিল, "কৈ মা, কিছু ত পড়েনি! এই আমি তোমার চোখে ফুঁ দিলুম ;——ফুঁ !"

সেই টুকটুকে কচি মুখখানি, মায়ের মুখের কাছে লইয়া গিয়া, বালিকা ফুৎকার করিল। ফুৎকারটি যত শ্লোক আর না হোক, তাহার মুখ হইতে ফুঁ শব্দটি খুব জোরে নির্গত হইল বটে।

জননী এতক্ষণ মানস-দর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিতেছিলেন ; এখন সত্য সত্যই সম্মুখে দর্পণে ছায়া দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহারই মুখচ্ছবি চুরি করিয়া, সুকুমারী সীতা, তাঁহার চক্ষে ফুৎকার করিতেছে।

সীতা, জননীর ক্রোড় হইতে নামিয়া, আপন মনে বকিতে বকিতে কুটীরান্তরে চলিয়া গেল।

প্রতাপের সেই পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রটী কিন্তু তখনও তথায় দণ্ডায়মান। জনকজননীর চক্ষে জল দেখিয়া, ঠিক কেন জানি না, তাহারও চোখে জল আসিল। প্রতাপ, এ দৃশ্যটি লক্ষ্য করিলেন। সান্ত্বনাসূচক স্নেহস্বরে কহিলেন, "মঙ্গল, বড় হও, ক্রমে সকল জানিতে পারিবে।——যাও বাবা, তোমার দাদার কাছে গিয়া মল্লযুদ্ধ দেখ গে।"

লছ্মীদেবী পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "হাঁ বাবা, তাই যাও,— দাদার কাছে গিয়ে খেলা দেখগে।"

পুত্র প্রস্থান করিল।

প্রতাপ। প্রিয়ে! অতি-বড় পাষাণও এ দৃশ্য দেখিয়া, অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না।——হায়, আমি কি করিতে কি করিলাম!"

উচ্ছ্বসিত অন্তরে পত্নী উত্তর দিলেন,—

"প্রাণেশ্বর! যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ। সুরম্য হর্ম্ম্য ত্যাগ করিয়া পূর্ণকুটীরে বাস,—সুভোগ্য খাদ্য-সামগ্রী বর্জ্জন করিয়া বন্য-ফলমূলে ক্ষুন্নিবারণ,— দুগ্ধফেননিভ শয্যার পরিবর্ত্তে তৃণ-শয্যায় শয়ন,—মলিন বাস পরিধান,—কেশ, শ্মশ্রু, নখর, ক্ষৌরস্পর্শরহিত,—জননী-জন্মভূমি উদ্ধারার্থে

এ মহাব্রত গ্রহণ,—শিশোদীয়কুলের রাণার উপযুক্ত হইয়াছে। স্বামিন্! তুমিই ত একদিন বলিয়াছ,—দেশের জন্য, যে আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে না পারে, তাহার মনুষ্যজন্মই বৃথা! তবে, আজ কেন আত্মবিস্মৃত হও প্রভু?

"পুত্র কন্যা?—আমি? কেন, দীন-দুঃখীও ত স্ত্রীপুত্র লইয়া মনের সুখে ঘর-সংসার করে,—দেবতার আরাধনা করে! চক্ষের উপরও ত দেখিতেছি, বনচারী ভীল-সাঁওতালগণও কত কষ্টে সন্তান লালন-পালন করিতেছে! কেন, তাহারা কি মানুষ নয়? দুঃখীর হৃদয় কি সুখের ধারণা হইতেও বঞ্চিত? তাহাদের হৃদয়ে কি সুখদুঃখের এতটুকু তরঙ্গও উঠে না? তবে, কেন আমরা সন্তানগণের কষ্ট দেখিয়া,—বিচলিত, ব্রতচ্যুত, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব? ব্রত ত শুধু বাহিরে নয়, অন্তরেও বটে। স্বামিন্, তুমিই ত আমাকে 'মন্ত্রের সাধন' শিক্ষা দিয়াছ,—তবে আজ কেন আত্ম-বিস্মৃত—কম্পিত-অন্তর হও? কে পুত্র,—কে কন্যা,—কি ছার আমি তোমার? মোগলের গ্রাস হইতে জন্মভূমির উদ্ধারসাধন তোমার লক্ষ্য;—বিধাতা তোমার উপর এ উচ্চভার অর্পণ করিয়াছেন;—এ মহাযজ্ঞে যদি আমাদের সকলের প্রাণও আহুতি দিতে হয়, তবুও তোমার ব্রতভঙ্গ হইবে না,—ইহাই আমার বিশ্বাস। যাও নাথ,—সমগ্র সামন্ত ও সর্দ্দারগণকে উৎসাহিত কর।—আজি হউক কালি হউক,—যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।—'ঘরভেদী বিভীষণ' হতভাগ্য শক্তও আবার মোগলের সহিত মিলিত হইয়াছে।—যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তবে যাও, আর নিশ্চেষ্ট থাকিও না;—আমি তোমার গৃহধর্ম্ম লইয়া রহিলাম।"

সেই অপরূপ শোভাময়ী, উদ্দীপনময়ী,—সিংহবাহিনী মূর্ত্তি!—আ মরি মরি! এই ভারতে সত্য সত্যই একদিন এমনই সোণার প্রতিমা শোভা পাইত। এমনই মধুর উদ্দীপনায় একদিন আর্য্যরমণী স্বামীকে সত্য সত্যই মহৎ কার্য্যে উৎসাহিত করিতেন!

প্রতাপ মনে মনে কৃত-কৃতার্থ হইয়া, হর্ষোৎফুল্লবদনে কহিলেন, "প্রাণেশ্বরি! আজ আমি ধন্য হইলাম। বুঝিলাম, আমার মহতী কল্পনা বিকশিত করিতে, মোহিনী প্রতিমারূপে তুমি আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ!—চিরায়ুষ্মতী হও,—সতি!"

মনে মনে বলিলেন, "হায়, হতভাগ্য শক্ত।"
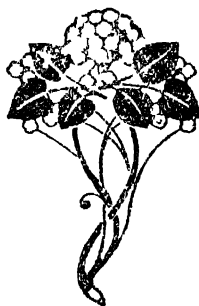
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বগ্রাসী আকবর একে একে ভারতের সকল দেশ গ্রাস করিতে-ছেন, এক এক করিয়া সকল রাজন্যবর্গকে যেন যাদুমন্ত্রে বশীভূত করিতেছেন। অম্বর, বিকানীর, মারবার,—ইতিপূর্ব্বেই ত আপনাদের স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া, মোগলচরণে জীবনের যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছে; সম্প্রতি আবার আজমীরেরও সেই দশা হইল। আজমীরও আজ অম্বরাদির নীচ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া,—জাতি, কুল, মান, শীল,—সকলই বিসর্জ্জন করিল।

বড় কষ্টে প্রতাপ এ দৃশ্যও দেখিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, "শিশোদীয় বংশের অস্তিত্ব লোপ হয়—হউক, তথাপি এই সকল আচারভ্রষ্ট,—মুসলমানের-সহিত-বৈবাহিক-সূত্রে-আবদ্ধ,—স্বদেশদ্রোহীর সহিত কোন-রূপ সম্বন্ধ রাখিব না। ইহাতে শিশোদীয়কুলের কুমার-কুমারীগণকে আজীবন অবিবাহিত থাকিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ।"

এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটিল,—যাহাতে প্রতাপ নিজের বিপদ নিজে ডাকিয়া আনিলেন,—অথবা যাহা হইতে তাঁহার জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব জগৎসমক্ষে প্রকাশিত হইল।

অম্বর-রাজ ভগবান্ দাসের—সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুণধর পুত্র,—রাজপুত-কলঙ্ক—জাহাঙ্গীর-শ্যালক মানসিংহ, শোলাপুর জয় করিয়া,

সম্রাটের নামে জয় পতাকা উড়াইয়া, মহামহোল্লাসে দিল্লী ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে কি ভাবিয়া, একবার দরিদ্র প্রতাপের কুটীরে পদার্পণ করিয়া, আতিথ্যগ্রহণে তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। রাণা প্রতাপসিংহের নিকট তিনি দূত পাঠাইলেন।

মনে যাই থাক্,—সামাজিক শিষ্টাচার ও সম্ভ্রম রক্ষা, প্রতাপ চিরদিনই করিতেন। শিশোদীয় বংশধরের যেরূপ করা কর্ত্তব্য, সেইরূপই করিতেন। রাজা মানসিংহের নিকট হইতে দূত আসিয়া প্রতাপকে জ্ঞাপন করিল,—"মহারাণার পুরীতে আজ অম্বররাজ অতিথি হইবেন।——এ আতিথ্য তিনি যাচিয়া গ্রহণ করিতেছেন।"

প্রতাপ উত্তর করিলেন, "ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।—অম্বররাজের উদারতায় আমি যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলাম। তবে আমি প্রস্তুত হই।"

প্রতাপ অনুচরবৃন্দের সহিত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, মানসিংহের অভ্যর্থনাদি করিলেন।

অতঃপর রাণার সেই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজধানী কমলমীরে, উদয়সাগরের তীরে, এক মহাভোজের আয়োজন হইল। একে রাজ-অতিথি, তাহে যাচিয়া আতিথ্য গ্রহণ, তার উপর সেই মিবারের চির-শত্রু আকবরের সর্ব্বপ্রধান অমাত্য;———রাণার আদেশে, যতদূর সম্ভব, ভোজের আয়োজন হইল। ব্রতধারী রাণা, নিজে সপরিবারে সামান্য ভোজ্য-দ্রব্য আহার করুন,—বন্য ফলমূল ভক্ষণ করুন,——বৃক্ষপত্রে ভোজন করুন,—তথাপি আতিথ্য সৎকারে,—মানসিংহের ন্যায় ব্যক্তির ভোজনব্যাপারে, রাজ-জনোচিত নানাবিধ ভোজ্য-বস্তুর আয়োজন করিলেন, এবং তাহা যথারীতি স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে সজ্জিত করিয়া দিতে অনুমতি দিলেন। রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহের প্রতি এই আতিথ্য-সৎকারের ভার অর্পিত হইল।

মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুরম্য সরোবর তীরে, ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। ক্রমে আহারের স্থান হইল, এবং ভোজ্যদ্রব্যাদি একে একে সজ্জিত হইতে লাগিল। যথাসময়ে রাজা মান, ভোজনার্থ আহূত হইলেন। অমরসিংহ অতি বিনীতভাবে, রাজ-অতিথির সময়োচিত পরিচর্য্যা এবং সম্মান-সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। কুমারের একান্ত আদর-অভ্যর্থনায়, মানসিংহ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভোজন-আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। সম্মুখে বহুবিধ উপাদেয় ভোজ্য-বস্তু সজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া শিষ্টাচার দেখাইয়া, স্মিতমুখে বলিলেন,—"উঃ!——এত শীঘ্র এত প্রকার উৎকৃষ্ট আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে!——এখন কি রাখিয়া কি আহার করি।"

অমর নতমুখে ভূমিপানে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "অম্বররাজের যোগ্য আর এমন কি আহার প্রস্তুত হইয়াছে!"

রাণার দুই এক জন অনুচরও কুমারের কথায় 'সায়' দিয়া, অতিরিক্ত সৌজন্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

মানসিংহও এই অবসরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিলেন, এবং কয়েকটি অন্ন তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া ভোজন করিতে উদ্যত হইলেন।

হাতের-ভাত মুখে উঠে প্রায়, এমন সময় যেন তাঁহার চৈতন্য হইল। চমকিতভাবে হঠাৎ তিনি কহিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, ভাল কথা,—মহারাণা কোথায়? কৈ, তাঁহাকে ত এখানে দেখিতেছি না?"

অতি উৎকণ্ঠিতভাবে মানসিংহ অমরের মুখপানে চাহিলেন।

রাণার এক অমাত্য বলিল, "মহারাজ ততক্ষণ আহার করুন,—তাঁর বোধ হয় একটু বিলম্ব আছে।"

"বিলক্ষণ!"

অমাত্যের কথায় মানসিংহ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"বিলক্ষণ! তাও কি হয়?—কুমার! তোমার পিতৃদেব কোথায়? তাঁহাকে ডাকিয়া আন, —আমি তাঁহার সহিত একত্র আহার করিব।"

মানের দক্ষিণ হস্ত অন্ন হইতে নির্লিপ্ত হইল। তাঁহার মুখে ও চোখে, আরও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইতে লাগিল।

কুমারের চক্ষু ভূমিপানে ন্যস্ত।

এবার মান, যেন কুমারের প্রতিও একটু বিরক্ত হইলেন। তাঁহার সন্দেহ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইল। তিনি কিছু ক্ষুণ্নস্বরে কহিলেন,—

"কুমার! তুমি এখনও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলে? কৈ, তোমার পিতৃদেব ত এখনও আসিলেন না? তবে কি অতিথির প্রতি সম্যক্ অসম্মান করাই————"

এবার মান, তাঁহার সেই বিশাল বক্ষঃ উন্নত করিয়া বসিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্ত আরও উর্দ্ধে উঠিল।

সামাজিক শিষ্টাচার ও সম্ভ্রম রক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, অমর প্রকৃত কথা গোপন করিয়া, বাধা দিয়া বলিলেন,—

"মহারাজ! আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না,—পিতৃদেব হঠাৎ শিরঃপীড়ায় বড়ই কাতর হইয়াছেন,—তাই আসিয়া আপনার সহিত একত্র আহার করিতে পারিলেন না। আপনি কিছু মনে করিবেন না,—এজন্য তিনিও বিশেষ দুঃখিত।"

ঝড়ের পূর্ব্বে আকাশ যেমন মেঘাচ্ছন্ন হয়, হঠাৎ মানসিংহের মুখমণ্ডল সেইরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইল। তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন,—

"অমর! যতই হউক, এখনও তুমি বালক!—তুমি কাহাকে কি বুঝাইতে চাও? যদি এই সামান্য রহস্যটি ভেদ করিতে না পারিব, তাহা হইলে আর—— যাক্, এখন তুমি গিয়া তোমার পিতাকে বল গে যে, আমি তাঁহার শিরঃপীড়ার কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে।—ভ্রমই হউক আর যাহাই হউক,—সংশো-

"যথেষ্ট হইয়াছে, মহারাণা! আর না,—আর কিছু শুনিবার প্রয়োজন হইতেছে না!"—বিদ্যুদ্বেগে রাজা মান, আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অপমানে ও অভিমানে তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল।—মুখ আরক্তিম হইল এবং চক্ষের দৃষ্টি স্থির হইয়া আসিল।

বুদ্ধিমান্ মানসিংহ তখনি আবার আত্মসংযম করিলেন,—মনের ক্ষোভ কতকটা মনেই মারিলেন।

ভোজনার্থ আসনে উপবেশন করিয়া, ইতিপূর্ব্বে তিনি ইষ্ট-দেবতার নামে যে কয়টি অন্ন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—কেবলমাত্র সেই ক'টি অন্ন সযত্নে—ভক্তিভরে আপন উষ্ণীষমধ্যে স্থাপিত করিলেন। পরে মনে মনে কহিলেন,—

"ঠিকই হইয়াছে! আপনা হ'তে এই অপমান আমি শির পাতিয়া গ্রহণ করিলাম! প্রতাপসিংহ ত আমায় নিমন্ত্রণ করেন নাই,———আমি যাচিয়া—অনাহূত হইয়া, তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং যথাকার্য্যের যথা ফল পাইলাম।—এখন আর নিষ্ফল অভিমান প্রকাশে প্রয়োজন কি?"

প্রকাশ্যে ধীরভাবে কহিলেন, "মহারাণা! যাহা ভাল বুঝিয়াছেন করিয়াছেন,—তাহাতে আমার কথা নাই। কিন্তু এটা আপনার মনে রাখা উচিত,—আপনার সম্মান ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই দিল্লীশ্বরের শরণাগত হইয়াছি।"

তেজস্বী ও স্পষ্টভাষী প্রতাপ স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "এ ত বড় মন্দ কথা নয়—অম্বররাজ! এমন উদার নীতি কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছেন? আমার "সম্মান ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই" আপনারা কন্যা ও ভগিনীগণকে মুসলমান-হস্তে অর্পণ করিয়াছেন?"

প্রতাপের অনুচরবৃন্দ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

কুক্ষণে যাত্রা,—প্রতি পদে অপমান।—মানসিংহের ক্ষোভ ও মর্ম্মান্তিকতার আর সীমা রহিল না।

আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া, মান ত্বরিতপদে আপন অশ্বে আরোহণ করিলেন। রাণার প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়া, কঠোর-কণ্ঠে কহিলেন, "প্রতাপসিংহ! মনে রাখিও, অচিরাৎ তোমায় এই দৃষ্টতার সমুচিত ফল ভোগ করিতে হইবে। যদি আমি যথার্থ ক্ষাত্রর-সন্তান হই, তবে তোমার দর্প চূর্ণ করিবই করিব;—নচেৎ আমার নাম মানসিংহ নহে!"

কেশরী গর্জ্জনে প্রতাপ উত্তর করিলেন,—"প্রকৃত বীর কখন আত্ম-স্তরিতা প্রকাশ করে না। যাই হোক্ আপনার তেজস্বিতায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম।—যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হইলে আরও সন্তুষ্ট হইব।"

এই সময়ে প্রতাপের একজন পার্শ্বচর পরিহাসচ্ছলে কহিয়া উঠিল,—"আর সেই সময়ে তোমার "বোনাই"টিকেও সঙ্গে আনিও,—'ফুপা' আকবরুটি;—তিনি সঙ্গে না থাকিলে, তোমার "বাহার" খুলিবে না।"

অনুচরবৃন্দের মধ্যে আবার একটা হাসির হর্‌রা উঠিল।

মর্ম্মাহত মান আর পলকমাত্র অপেক্ষা না করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে দারুণ কশাঘাত করিলেন। যতটা রাগ, যেন সেই গরীব বেচারী ঘোড়ার উপরেই ঝাড়িলেন। নক্ষত্রগতিতে অশ্ব ছুটিল।

অনুচরবর্গকে প্রতাপ আজ্ঞা করিলেন,—"অবিলম্বে ঐ স্থান পবিত্র করা হৌক্।—এই সকল অস্পৃশ্য অন্নব্যঞ্জন শৃগাল-কুক্কুরকে প্রদান কর।"

অতঃপর কুমারকে কহিলেন, "অমর, তুমি এখনি এই সব বসন ভূষণ পরিত্যাগ কর;—স্নান করিয়া পবিত্র হও। এস, আমিও স্নান করিব।"

রাণার সমস্ত লোকজন,—অমাত্য, সর্দ্দার,—যে কেহ সেই ভোজ-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল, সকলেই,—এমন কি, যাহারা দূর হইতে

মানসিংহকে, কেবলমাত্র চোখে দেখিয়াছিল,—তাহারা অবধি অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিল, এবং সেই ভোজন-স্থান অবিলম্বে গঙ্গাজলে বিধৌত হইয়া পবিত্রীকৃত হইল।

বলা বাহুল্য, মর্ম্মাহত মানসিংহও যথাসময়ে দিল্লী পঁহুছিয়া, দিল্লীশ্বরের নিকট প্রতাপের ব্যবহার আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাপন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। একে ত প্রতাপ আকবরের নিকট মাথা না নোওাইয়া, আজ পর্য্যন্ত তেজের সহিত চলিয়া আসিতেছেন; তার উপর আবার এই প্রকৃত বীরজনোচিত ব্যবহার;——মানসিংহের এই অপমান, সম্রাট আত্ম-অপমান তুল্য বিবেচনা করিলেন। ক্রোধে তাঁহার চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন,——"অবিলম্বে সমরানল প্রজ্বলিত কর। সেই দুর্ম্মতি কাফের অচিরাৎ আত্মকৃত পাপের সমুচিত ফল ভোগ করুক।"

পরে একটু শান্ত হইয়া কহিলেন, "মান! তুমি আমার প্রিয় হইতে প্রিয়। নিশ্চয় জানিও, তোমার অপমানের প্রতি-কণা, আমার হৃদয়ে বাড়বানল সঞ্চিত করিয়াছে। দেখ, অবিলম্বে এই অনলে পাপিষ্ঠ প্রতাপসিংহকে সদলবলে ভস্মীভূত করি।—ওঃ! ক্ষুদ্র কাফের হইয়া এত তেজ,—এত দম্ভ!"

অতঃপর মনে মনে বলিলেন, "বুঝিলাম, আমার সূক্ষ্ম রাজনীতিজাল পাপিষ্ঠ প্রতাপই ছিন্ন করিবে! আমি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কত কষ্টে— কত যত্নে, ইষ্টকের পর ইষ্টক রাখিয়া, যে উচ্চ মিলন-মন্দির গঠন করিলাম,—হিন্দু-মুসলমানকে এক করিবার উদ্দেশ্যে,—আভিজাত্যের

মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, যে নূতন বিবাহ-বিধির প্রবর্ত্তন করিলাম,—জাতিভেদ ও অন্যান্য কুসংস্কারাদি দূর করিয়া, যে হিন্দুর মুখে মুসলমানের অন্ন দিলাম,——পাপিষ্ঠ প্রতাপ আমার সেই শুভ অনুষ্ঠান ফুৎকারে উড়াইয়া দিল!——অবিলম্বে, সর্ব্বাগ্রে যে কোন উপায়ে এ মহাশক্রকে নিপাত করিতে হইতেছে,—নচেৎ আমার স্বস্তি নাই, মঙ্গল নাই।"

সম্রাটের আদেশে, প্রতাপের 'ঘরভেদী বিভীষণ' গুলি এই সময়ে একে একে তথায় আহূত হইলেন। প্রথম আসিলেন,—শক্তসিংহ; দ্বিতীয় আসিলেন,—সাগরজী; তৃতীয় আসিলেন,—সাগরজীর ধর্ম্মভ্রষ্ট পুত্র মহব্বৎ খাঁ। এইরূপে একে একে অনেকগুলি "রত্ন" আসিলেন। পাঠককে বলিতে হইবে না যে,—এ সকল গুলিই স্বদেশদ্রোহী, কুলাঙ্গার, রাজপুত-কলঙ্ক। পরন্তু, প্রধানতঃ ইহাদের বলেই, আকবর আজ ভারত সম্রাটের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

আকবর প্রথমে শক্তসিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"মর্ম্মাহত যুবক! এতদিনে তোমার মর্ম্মবেদনা দূর হইবে!—এতদিনে তোমার সেই অপমানকারী, দুর্ম্মতিপরায়ণ, দাম্ভিক ভ্রাতার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

সুচতুর সম্রাট, এইরূপে একে একে সকল রত্নগুলির মনোমত কথা বলিয়া, তাহাদের মন হরণ করিলেন। কার কোন্ থানে ব্যথা,—আর প্রতাপের বিরুদ্ধে, কোন্ কাজটি কে, মনের সহিত করিতে পারিবে, তাহা তিনি জানিতেন। বুদ্ধিমান্ বিষয়ী লোক সর্ব্বাগ্রে এই 'সন্ধান-গুলি জানিয়া রাখে। মনুষ্য-প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক ধাতুতে গঠিত। তা আকবরের বিশেষ দোষ দিব কি?

তুমি হাতে করিয়া আপন গৃহে আপনি আগুন দিতে বসিয়াছ,—গৃহ-লুণ্ঠনকারীর তাহাতে আনন্দ না হইবে কেন? তাহার পথ ত তুমিই পরিষ্কার করিয়া দিতেছ!——হা সর্ব্ববিধ্বংসী আত্ম-কলহ!

সম্রাটের স্বস্তিবচনে মতিচ্ছন্ন শক্ত আনন্দোচ্ছ্বসিত অন্তরে কহিল, "জাঁহাপনা! তবে শুনুন। প্রতাপকে দমন করিতে হইলে, আমাদের বিপুল সেনাদলের প্রয়োজন। কারণ সর্ব্বপ্রকারে প্রতাপের প্রায় দ্বাবিংশতি সহস্র সেনানী হইবে। ইহার মধ্যে————"

সম্রাট তাঁহার সেই বিশাল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন,—

"এঁ্যা! বল কি! দ্বাবিংশতি সহস্র?—প্রতাপের এত সৈন্য হইবে?"

শক্ত। আজ্ঞা হাঁ জাঁহাপনা! ইহার মধ্যে রাজপুত সর্দ্দার ও সামন্তগণ এবং ভীলগণ প্রধান। রাজপুত সর্দ্দারগণ অমিততেজা, দুর্দ্ধর্ষ এবং মৃত্যু-ভয়-রহিত; আর অসভ্য ভীলগণ কৌশলী, ক্ষিপ্রগতি এবং ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ। বিশেষতঃ দুর্গম ও উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে তাহারা অসাধারণ চাতুর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। বন্যবিড়ালের ন্যায় তাহাদের গতি চঞ্চল ও দুরতিক্রমণীয়। পর্ব্বতের পাদদেশে, গহ্বরে, উচ্চশৃঙ্গে,—তাহারা এমনি ভাবে লুকাইয়া থাকে যে, হঠাৎ তাহারা কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। ইহা ব্যতীত তাহাদের আর এক অব্যর্থ সন্ধান আছে।—সময় থাকিতে তাহারা স্থানে স্থানে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড সংগৃহীত করিয়া রাখে; যখন সকল বল অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন তাহারা সেই পর্ব্বতাকার প্রস্তরখণ্ডের সাহায্যেই শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়;——বনচারী প্রতাপ এমন দুর্দ্ধর্ষ ভীলদিগেরও সাহায্য পাইয়াছে।"

সম্রাট অতি আগ্রহের সহিত শক্তের কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, প্রতাপের গৃহশত্রুর এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এখন প্রতাপবিজয়ে কোন্ নীতি অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত,—আকবর কৌশলে শক্তকে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসিলেন। উৎসাহিত করিবার জন্য কহিলেন, "তবে ত তুমি অনেক গুপ্তকাহিনী আমাকে বলিয়া দিলে! ভাল, ভাল,—অগ্রে কার্য্যোদ্ধার করি,—তারপর তোমাকে বিশিষ্টরূপ পুরস্কৃত করিব।"

শক্ত। বাদসাহের অনুগ্রহই আমার আশাতীত পুরস্কার।——এখন যে কথা বলিতেছিলাম। একদিকে যখন ঐরূপ দুর্দ্ধর্ষ ও অমিত-তেজা রাজপুত সৈন্য,—এবং অপরদিকে ঐরূপ কৌশলী ও নির্ভীক ভীলদল,—তখন আমাদিগকে এক অভিনব পন্থার উদ্ভাবন করিতে হইবে।

আকবর হৃষ্টচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ, বেশ,—বলিয়া যাও।—তুমি যেরূপ বলিবে, আমি সেইমত অভিযানের বন্দোবস্ত করিব। কি বলিবে,—বল।"

শক্ত। আজ্ঞা হাঁ, সেই কথাই বলিতেছি। রাজপুত-সৈন্য-গণের অস্ত্রই একমাত্র ভরসা,——তরবারি, বর্শা, আর না হয়—বল্লম; ইহা ব্যতীত ক্বচিৎ—ধনুর্ব্বাণ। আর ভীলদিগের যে ব্রহ্মাস্ত্র, তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—প্রস্তরখণ্ড আর তীর-ধনু।—এমত অবস্থায় আমাদিগকে একটি নূতন বস্তু সংগ্রহ করিতে হইবে।

আকবর। অতি উত্তম কথা। কি বল,—তাহাই সংগৃহীত হইবে।

শক্ত। সে বস্তুটি গুলি-গোলা। তা বন্দুক বা কামান,—যাহাই হউক। শত অস্ত্রে যা না করিবে; এক গুলিতে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে। রাজপুত যত বড় যোদ্ধাই হউক,—আর ভীল যেমনতর কৌশলীই হউক,—একটা দশ-নলা বন্দুকের আওয়াজে, কিংবা বিশ-তোপী কামানের শব্দে,—শত শত রাজপুত ও ভীল চমকিত হইয়া পড়িবে। সিংহনাদে কামান দাগিলে, কে কোথায় উধাও হইয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই।—হাতের তরবারি বা হাতের তীরধনু,—হাতেই রহিয়া যাইবে, তাহা আর প্রতিপক্ষের প্রতি প্রয়োগ করাই ঘটিয়া উঠিবে না।—তাই বলিতেছিলাম, জাঁহাপনা! ইতিমধ্যে আমাদের পক্ষে কিছু গুলি-গোলা সংগ্রহ করা চাই।

১ নম্বরের এই 'ঘরভেদী' বিভীষণের সলা-পরামর্শে, ভারত-সম্রাটের

অন্তরে যে, কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দরস উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল, পাঠক তাহা নিজেই অনুভব করুন।

এইরূপ ২ নং, ৩ নং, ৪ নং, ৫ নং, ৭ নং, ১০নং প্রভৃতি যতগুলি নম্বরওয়ালা 'ঘরভেদী বিভীষণ' সেখানে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আসন লইয়াছিলেন, —সুচতুর আকবর একে একে সকল রত্নেরই সম্যক পরিচয় লইলেন। ওরি মধ্যে, যে রত্নটি সবার সেরা বুঝিলেন,—সেটিকে মনে মনে নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়া দিলেন,—সম্মুখযুদ্ধে সেনাপতি সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দিবেন।

সে রত্নটি হইলেন,—মৃতরাণা উদয়সিংহের অন্যতম পৌত্র,—সাগরজী মহাশয়ের গুণধর পুত্র,—ধর্ম্মভ্রষ্ট, মুসলমান-নামধারী মহব্বৎ খাঁ। খাঁ মহাশয় নিমকের চাকর বটে।

আর সেই সেরার সেরা,—রতন অপেক্ষাও যতনের ধন,—প্রিয়তম পুত্রের "বড় কুটুম্বটি,"——সাহসে, বীর্য্যে, বাহুবলে ও বুদ্ধিমত্তায়,— যেটি সম্রাটের দক্ষিণহস্ত ;—পক্ষান্তরে স্বজাতি-দ্রোহিতায়, সত্য সত্যই যিনি জগতে অতুল,—সেটিকে সম্রাট যে কোথায় রাখিবেন, তাই ভাবিয়াই আকুল হইলেন। অবশেষে প্রিয়পুত্র সেলিমকেই যখন সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্মুখসমরে পাঠানো স্থির করিলেন,—তখন অগত্যা সেই অমূল্য নিধিটিকে, পুত্রসমভিব্যাহারে দিতে হইল। কারণ, পুত্রের সকল ভার অর্পণ করিতে হইলে, এমন সুযোগ্য ও প্রিয়তম আত্মীয় তিনি আর কোথায় পাইবেন? বস্তুতঃ, এ নিধিটি না পাইলে, আকবর কিছুতেই, আপন জগৎ-জোড়া নাম জাহির করিতে পারিতেন না।

হায়, পতিত জীব! এমন শক্তিধর পুরুষ হইয়াও তুমি, হীনবুদ্ধিবশে স্বজাতিকে পায়ে ঠেলিয়া বিধর্ম্মী—বিজাতিকে কোল দিলে? মানসিংহ, তুমি যদি মিবারের পক্ষে থাকিতে!

না, না, তাহা হইলে, বিধির বিধান সফল হইবে কেন?—দেবতার

অভিশাপ ফলিবে কেন? পোড়াও, পোড়াও,—স্বজাতিকে বেড়া-আগুনে, এইরূপে পোড়াও! তোমাদের কাজও ত এই! সয়তানও না এইজন্য অতুল শক্তির অধিকারী হইয়া ধরাতলে আবির্ভূত হইয়াছে?

রাজপুত-কুল-পাংশু! তুমি বাঁচিয়া থাক;—তোমার কীর্ত্তিধ্বজা জগৎ দেখিবে! রাজপুতের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটাইয়াই তোমার অবসান নহে,—একদিন তুমি "বাঙ্গালী" প্রতাপকেও উচ্ছেদ করিয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বনাশ করিবে।—বাঙ্গালীর বুক-পোরা আশায়, শ্মশান-ভরা ছাই ঢালিয়া দিয়া, তুমি চির-অভিসম্পাৎ সঞ্চয় করিবে। যে জন্য তোমার ভারতে আসা, এইরূপ একে একে তাহা সম্পন্ন করিয়া যাও। নহিলে যে, বিধিলিপি ব্যর্থ হইবে?

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অবশেষে স্থির হইল,——সম্মুখসমরে যুবরাজ সেলিম হইবেন,—সেনাপতি; মহব্বৎ খাঁ হইবেন,—তাঁহার সহকারী; আর মানসিংহ হইবেন,—সমর-সাগরের কর্ণধার। ইহা ব্যতীত শক্ত ও অন্যান্য "পতিত" রাজপুতগণ 'গুপ্ত-মন্ত্র' স্বরূপ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।

অগণিত মোগলবাহিনী এবং বহুবিধ যুদ্ধোপকরণ সঙ্গে লইয়া,—নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহারা যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, মাতঙ্গের বৃংহতিনাদ, সৈন্যগণের 'দীন্ দীন্' শব্দ,—চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

হল্‌দিঘাটের দুর্গম গিরিপথে রাজপুতের ভাগ্য-পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এই কি সেই হল্‌দিঘাট?—যেখানে সহস্র সহস্র রাজপুত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ, হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল? এই কি সেই বীরজাতির পুণ্যতীর্থ?—যেখানে চতুর্দ্দশ সহস্র ক্ষত্রিয়-বীর অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল? এই কি সেই দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র?—যেখানে কত পিতা, কত মাতা, কত পত্নী, কত পুত্র,—জীবনের অবলম্বন হারা হইয়া, অবসাদে দেহ-ভার বহন করিয়াছিল? হায়! কালে সব গিয়াছে,—আছে কেবল পুণ্যময়ী স্মৃতি। স্মৃতি পুণ্যময়ী বলিয়া, প্রীতিময়ী বলিয়া,—সহৃদয় কবি ও স্বদেশ-বৎসল ইতিবৃত্ত-লেখক, অন্তরের অন্তরে সেই চিত্র জাগাইয়া রাখিয়া, কাব্যে ও ইতিহাসে তাহা অঙ্কিত করিয়া আসিতেছেন।

হল্‌দিঘাটের সেই অতি সঙ্কীর্ণ দুর্গম গিরিপথে, অগণ্য মোগল-বাহিনী সমবেত হইল। একদিকে কমলমীরের প্রচণ্ড মেরুদুর্গ উন্নতমস্তকে বিরাজিত; অন্য দিকে মীরপুরের উচ্চ শৈলশৃঙ্গ অবস্থিত;—আরাবলীর এই ঘন গিরিশ্রেণী বহু ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল। চঞ্চল গিরি-তরঙ্গিণীসকল মধ্যে মধ্যে আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে। চারিদিকে পর্ব্বত-প্রাকারে-বেষ্টিত অধিত্যকা,—প্রকৃতির সর্ব্বত্র এক

বিরাট্ দৃশ্য। এই পর্ব্বত-ময় দুর্গম ভূভাগের্ নাম—হল্‌দিঘাট। রাজপুত বীরের বীরত্ব-মহিমায় এই হল্‌দিঘাট চির-স্মরণীয়।

যেদিন মানসিংহের আতিথ্যগ্রহণে বিভ্রাট ঘটে, সেই দিন হইতেই প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন, অবিলম্বে তাঁহাকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে হইবে। ফলে তিনিও নিশ্চিন্ত ছিলেন না,—রাজপুত সর্দ্দার ও প্রধানগণকে আহ্বান করিয়া, আশু-কর্ত্তব্যে মনোযোগী হইলেন। সকলেই তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিল,—জীবন-পণ করিয়া্ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় মনোযোগী হইল।

তারপর প্রতাপ ভীলগণকে আহ্বান করিলেন। ভীলগণ প্রতাপকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। প্রতাপের মনোভিপ্রায় অবগত হইয়া,—তাহারা উল্লাসে, উৎসাহে মাতিয়া উঠিল,—এবং আনন্দসূচক এক জয়ধ্বনি করিয়া, প্রতাপের সমুচিত সংবর্দ্ধনা করিল।

মহানুভব প্রতাপও নির্ব্বিকার চিত্তে,—সেই সরল, সত্যসন্ধ, অকপটবিশ্বাসী, বন্য ভীলগণকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন। দেবতার আলিঙ্গনলাভ হইল ভাবিয়া, তাহারা কৃতার্থ ও ধন্য হইল।

তারপর যথাদিনে দূত আসিয়া সংবাদ দিল,—আরাবলীর দুর্গম গিরিসঙ্কটে শত্রু-সেনা সমবেত হইতেছে।

আকাশে, যে একটু 'খানি কালো মেঘ দেখা দিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা ঘন ঘনাকারে পরিণত হইল,—সমগ্র আকাশ তাহাতে ছাইয়া পড়িল। 'অবিলম্বে যুদ্ধ ঘটিবে,'—এই বিষয় আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে, যাই সংবাদ আসিল যে, শত্রু-সেনা আরাবলীর দুর্গম গিরিসঙ্কটে সমবেত হইতেছে, অমনি সেই সহস্র সহস্র রাজপুত অদ্ভুত বীরত্বে পরিপূর্ণ-প্রাণ হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল,—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্দ্ধর্ষ ভীলগণও হুঙ্কার ছাড়িল। ভাগ্যবান্ প্রতাপ, উদ্বোধনেই এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বুঝিলেন,—তাঁহার ব্রতগ্রহণ নিষ্ফল হয় নাই——আনন্দে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

বস্তুতঃ,শক্ত যাহা বলিয়াছিল, তাহা ঠিক।—প্রতাপের পক্ষে দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত বীর ছিল,—ইহা ব্যতীত ভীলগণও তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছিল।

তখন সেই অগণ্য বীরবৃন্দ রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া, হল্‌দিঘাট অভিমুখে অগ্রসর হইল। ভাবিল, "শত্রু-সেনা আর অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে না, - সেই সঙ্কীর্ণ দুর্গম গিরিপথেই তাহাদের সমর-সাধ মিটাইব।" বলা বাহুল্য, প্রতাপও এ বিষয়ে সকলের সহিত একমত হইলেন।

হল্‌দিঘাটের সমরাভিনয় বর্ণন করিবার শক্তি,—এ ক্ষুদ্র লেখকের নাই। পাঠক একবার মানস-নেত্রে, সেই ধর্ম্মক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্রের মহারণ অবলোকন করুন! সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সেই ভীম-ভৈরব রুদ্র-মূর্ত্তি, কল্পনা-নয়নে দেখিতে থাকুন। সেই অবিরাম রক্তস্রোত,—জেতার সেই আনন্দ-তাণ্ডব,—রথিগণের সেই উন্মত্ত বেশ,—দেখুন। আবার, মুমূর্ষুর সেই অস্ফুট আর্ত্তনাদ,—আহতের সেই "দে জল—দে জল" রব,—বীরের সেই বিকট হুঙ্কার,—কাণ পাতিয়া শুনুন। পক্ষান্তরে কাহারও ছিন্নহস্ত, ছিন্ন পদ, রুধির বমন,—এই সকল বীভৎসময় দৃশ্যও অবলোকন করুন।—কাহারও বা বাক্যার্দ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু,—ইহাও দেখুন। আবার ঐ শুনুন,—ওঃ! কি ঘোর আতঙ্কজনক ভীষণ কোলাহল!

হু হু শব্দে বাতাস বহিতেছে; সোঁ সোঁ শব্দে তীর ছুটিতেছে; ঘন ঘন অগ্নি-অস্ত্রে দিঙ্মণ্ডল অগ্নিময় হইতেছে; ধূমে ও ধূলিতে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে; অন্ধকারে আকাশ ও ভূমি এক হইয়া গিয়াছে!——অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি, গজের ভীমনাদ, ঘন ঘন উল্কাপাত এবং অশুভ শিবারবে,—চারিদিক্ প্রকম্পিত। শকুনি-গৃধিনী শৃগাল-কুকুরের হুড়াহুড়ি, নিশীথ পক্ষীর বিকট চীৎকার, সর্ব্বত্র ক্রন্দন-কোলাহল—দিবারাত্রি সমভাব। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই,—অবিশ্রান্ত নররক্তে মেদিনী রসা-তলে প্রবিষ্ট হইবার উপক্রম করিয়াছে।—ও! কি ভয়াবহ ভীষণ দৃশ্য!

হলদিঘাটের যুদ্ধও যেন এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। প্রবল বন্যার ন্যায় একদিক হইতে অগণিত মোগল-বাহিনী আসিতে লাগিল,—অন্য দিক হইতে মহাবল রাজপুত বীরগণ তাহার গতি-রোধার্থ অগ্রসর হইল। যেন দুই দিক হইতে দুই উন্মত্ত ঐরাবত পরস্পরকে আক্রমণার্থ দাঁড়াইল। সেই সুদুর্গম সঙ্কীর্ণ গিরি-পথে অগণিত হিন্দু মুসলমান, পরস্পর পরস্পরকে মথিত, দলিত ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য,—বুক প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইল। অগণ্য নরমুণ্ড একই স্থানে বিরাজিত। অগণ্য পদাতি, অগণ্য অশ্বারোহী, অগণ্য গজারোহী,—একই উদ্দেশ্যে,—একই লক্ষ্যে,—একই স্থানে মিলিত। সে প্রলয়ঙ্করী ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া, বনের পশু প্রাণভয়ে পলাইল,—কালসর্প বিবরে লুক্কায়িত হইল।

ঝড়ের পূর্ব্বে সমুদ্র যেমন স্থির ও অচঞ্চল হয়,—প্রকৃতি যেমন ঘোরা গম্ভীরা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে,—ক্ষণেকের জন্য উভয়-পক্ষ, সেইরূপ স্থির ও অচঞ্চল হইয়া, গম্ভীরভাবে উভয়কে দেখিল। সহসা উভয়পক্ষের অধিনায়ক, আপন আপন পক্ষকে কি ইঙ্গিত করিল। অমনি উভয়পক্ষে ঘোর রোলে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। বাদ্যের সেই উন্মাদিনী শক্তির সহিত,—অশ্ব, গজ, পদাতি,—সকলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মনে প্রাণে উন্মত্ত—মরীয়া হইয়া, উভয় দল উভয়দলকে আক্রমণ করিল। মুসলমান দল হইতে নাদস্বরে "দীন্ দীন্" শব্দ উঠিল,—আর হিন্দু দল হইতে মুক্ত-স্বরে "হর হর মহাদেও" রব ধ্বনিত হইল।

এখন, এই ঘন ঘন "দীন্ দীন্" শব্দ ও "হর হর মহাদেও" রব মিশিয়া, সুদূর আকাশে একটা গুরু-গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হইল। পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। বৃক্ষের পত্রে পত্রে তাহা ঝঙ্কার করিল। আর উত্তেজিত সৈন্যগণের হৃদয়ে সেই ধ্বনি প্রবিষ্ট হইয়া, সকলকে অধিকতর উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

দেখিতে দেখিতে, চক্ষের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে, উভয় পক্ষে

ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।—এবং দেখিতে দেখিতে, চক্ষের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে, সম্মুখে একটী রক্তের নদী বহিল। সে উত্তপ্ত শোণিত-স্রোতে, পাদদেশ নিমজ্জিত হওয়ায়, অশ্বগণ বিকট চীৎকার আরম্ভ করিল,—হস্তিগণ উন্মত্তভাবে গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল,——আর পদাতিকুল তারস্বরে আপন আপন পক্ষের জয়ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

প্রথমে অসি-যুদ্ধই হইল। প্রকৃত বীরজাতি অসিযুদ্ধই করিয়া থাকে। রাজপুতের ন্যায় অসি-যুদ্ধ করিতে, পৃথিবীর আর কোন্ জাতি জানে? গোলাগুলি, কামান-বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ও ত ফাঁকির কাল! কিন্তু সম্মুখ সমরে মুখোমুখী অসিযুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করাই প্রকৃত বীরত্ব। তাই অসিযুদ্ধে রাজপুত, জগতের মধ্যে অতুল্য।

সেই রাজপুতের সহিত মোগল অসিযুদ্ধে তিষ্ঠিবে? না,—তা কখনই সম্ভবপর নয়।——ঐ দেখ, রাজপুতের প্রচণ্ড অসির আঘাতে, মুসলমান সৈন্য ছিন্নভিন্ন, দলিত ও মথিতপ্রায় হইতে চলিয়াছে। আর ঐ দেখ, তাহা দেখিয়াই, মানসিংহ ও মহব্বতের পরামর্শে, সুলতান সেলিম, আপন সৈন্যগণকে অশ্রান্ত গোলাবৃষ্টি করিতে অনুমতি দিতেছেন। দেখ দেখ, যে রাজপুত ইতিপূর্ব্বে একাকী এক শত মোগলের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল,—সে-ই এখন একজন মাত্র মোগল-সৈনিকের গুলিতে আহত হইল,——তাহার সেই বজ্র-কঠিন-হস্ত-ধৃত তরবারি হাত হইতে খসিয়া পড়িল। এতক্ষণে মোগল বুঝিল, তাহারা এই মহাযুদ্ধে কিছুদিন যুঝিবে,—এবং চাই কি, যথাকালে জয়যুক্তও হইতে পারিবে।

মোগলপক্ষ হইতে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অশ্রান্ত গোলা-বৃষ্টি হইতে লাগিল। কখন বন্দুক, কখন কামান, কখন বা অন্য কোনরূপ আগ্নেয় অস্ত্র। কিন্তু তরবারি অনেকক্ষণ কোষবদ্ধ হইয়াছে। ক্বচিৎ, এক

আধ স্থানে একটু আধটু অসিযুদ্ধ চলিতেছে মাত্র ; তাহাও বন্ধ হইল বলিয়া। মুসলমান, রাজপুতের বাহুবল দেখিয়া, সত্য সত্যই চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছে। প্রতাপ-সৈন্যের সুকৌশল অসি-পরিচালন দেখিয়া, মোগল সত্য সত্যই, মনে মনে রাজপুতকে ধন্যবাদ করিয়াছে।

কিন্তু হায়,—বৃথায় ধন্যবাদ! রাজপুতের ঐ মাত্র সম্বল,—অসি, তরবারি বা বর্শা,—বড় জোর না হয়,—তীরধনু। আর ভীলগণেরও কেবলমাত্র সম্বল,—তীরধনু এবং রাশীকৃত প্রস্তরখণ্ড। হায়! প্রতাপ পক্ষে ত,—গুলি গোলা বন্দুক কামান প্রভৃতি কোনরূপ আগ্নেয় অস্ত্র আদৌ নাই। তিনি প্রকৃত বীর ;—তাই তিনি অসিযুদ্ধই জানেন ;—সমগ্র রাজপুতকে তাহারই শিক্ষা দিয়াছেন। মোগল যে, শেষে গুলি-গোলার সাহায্যে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

অদ্ভুত বিক্রমের সহিত রাজপুত বীরগণ, অসিযুদ্ধ সমাপ্ত করিলেন। তাঁহাদের সে অলৌকিক বীরত্ব-কাহিনী,—ভট্ট-কবি এবং চারণগণ, অপূর্ব্ব বীর-গাথায় গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আর সেই ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ বন্য ভীলগণ,—তাহারা সেই তীরধনু ও সংগৃহীত লোষ্ট্রখণ্ডে, কত মোগল বিনষ্ট করিবে? সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায়, মোগলের অগণিত সেনা ; তাহার উপর তাহাদের নানাবিধ অগ্নি-অস্ত্র।——তুমি সমরকুশল অমিততেজা রাজপুত,—তুমি দুর্দ্ধর্ষ ভীল,—তোমরা যতগুণেই গুণবান্ হও না কেন,—তোমাদের ত কোনও রূপ একটিও আগ্নেয়-অস্ত্র নাই যে, দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া, পলকে, শত শত লোককে সমরসদনে পাঠাইতে পারিবে?——তুমি রাজপুত,—তুমি না হয়, একাই এক শত মোগলের মাথা লইলে ; তুমি ভীল,—তুমি না হয় তোমার শাণিতশরের অব্যর্থ লক্ষ্যে,—দুই দশ, বিশ পঞ্চাশ জনকে বিনষ্ট করিলে,—বড় জোর না হয়, মোগল অসতর্কিত হইয়া পর্ব্বতের

পাদদেশে দাঁড়াইলে, তুমি লোষ্ট্রাঘাতে এককালে সহস্র লোককে জখম করিয়া ফেলিলে,—তন্মধ্যে না হয়, দুইশতই প্রাণ দিল;——কিন্তু তাহাতে সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায় মোগলের অগণিত সৈন্যের বিশেষ কি ক্ষতি হইল? আর ক্ষতি হইলেও, তাহাদের আগ্নেয়-অস্ত্রের সম্মুখে ত, তুমি অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিবে না? যখন মুহুর্ম্মুহু ভীমনাদে কামান গর্জ্জিতেছে,—যখন সেই অশ্রান্ত তোপধ্বনি হইতেছে,—তখন তোমার সহস্র রণদক্ষতা থাকা সত্ত্বেও যে, সকলই বৃথায় হইতেছে! তুমি বড় জোর না হয়, অসমসাহসে তোপমুখে দৌড়িয়া গিয়া, কোন অকর্ম্মণ্য মোগল-সৈনিকের গালে এক চড় মারিয়া, তাহার গুলি গোলা কাড়িয়া লইলে,—এবং মধ্যে মধ্যে তাহাও যে, না লইতেছ—এমনও নহে;—কিন্তু ইহাতে তোমার বিশেষ কি উপকার হইতেছে? মোগলের অগ্নি-অস্ত্রও অসংখ্য, মোগলের সৈন্যসামন্তও অসংখ্য। এমন অবস্থায়ও যে, তুমি কেবলমাত্র তরবারি ও তীরধনুতে, সহস্র সহস্র মোগলের প্রাণ-সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছ, তাহা কেবল তুমি অসাধারণ বীর বলিয়া,—অসাধারণ তোমার যুদ্ধ-শিক্ষা বলিয়া!

কিন্তু হায়, বিধি বাম! তোমার অসাধারণ বীরত্বও, তোমাকে জয়যুক্ত করিতে পারিল না। তথাপি, এ কথা সহস্রবার বলিব,—হল্‌দিঘাটের এই কয়দিনের যুদ্ধে, তুমি যে অলৌকিক যুদ্ধ-ক্রীড়া দেখাইলে; তাহা পৃথিবীর যে কোন বীরজাতির আদর্শ-স্থল।

নবম পরিচ্ছেদ

আজ শেষ দিন। ১৬৭২ শকের ৭ই শ্রাবণ! *—তুমি ভারতের ইতিহাসের এইটি স্মরণীয় দিন! শুধু ভারতের বলি কেন, —পৃথিবীর যে কোন বীরজাতি রাজপুতের বীরত্ব-কাহিনী শুনিবে, সে একবার নিবিষ্ট মনে, ঐ দিনটি স্মরণ করিবে। হায়,—১৬৩২ সম্বতের ৭ই শ্রাবণ!

কত পুণ্য,—কত প্রেম,—কত প্রীতি,—কত স্মৃতি তুমি লইয়া গিয়াছ! হায় অতীত! তুমি এইক্ষণের,—এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের পলটিকেও, আমার নিশ্বাস পড়িতে-না পড়িতে, তোমার বিশাল উদরে টানিয়া লইতেছ!

দেখ, তোমার কাহিনী, এই দুই ছত্র লিখিতে, যে সময়টুকু গেল, ইহারই মধ্যে তুমি, আমার কত চিন্তা, কত ভাব, কত মমতা, কত আশা—এমন কি আমার খানিকটা পরমায়ু পর্য্যন্ত চুরি করিয়া লইলে! হায়, নিষ্ঠুর অতীত!

১৬৩২ সম্বতের ৭ই শ্রাবণ,—হল্‌দিঘাটের প্রথম অভিনয় সাঙ্গ

---

* ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ—জুলাই।

হইল। এই অভিনয় কেমন,—ইহার বিশেষত্বটুকু কি,—এখন সংক্ষেপে সেই কথাটি বলিব।

ব্রতধারী বীরাগ্রগণ্য প্রতাপ যখন দেখিলেন, মোগল অগ্নি-অস্ত্রে, তাঁহার সেই অমিততেজা, অসীমসাহসী রাজপুত-সৈন্যকে, তুলারাশির ন্যায় ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেছে,- আর তাহা দেখিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, মহাবল সর্দ্দারগণও হাতের অসি হাতে লইয়া দাড়াইয়া আছে, তখন তিনি সদর্পে সিংহনাদ করিয়া, জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ বাক্যে কহিলেন,—

"ভ্রাতৃগণ! এইবার শেষ!—আইস, মন্ত্রের সাধন করিয়া আমরা শেষচেষ্টা করি।——আইস, মোগলের সকল অগ্নি-অস্ত্র আমরা কাড়িয়া লই। বিধির বিধান,——যাহা হইবার, তাহা হইবে;—ভাবিবার আর অবসর নাই।"

অকস্মাৎ প্রতাপপক্ষে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল, এবং গম্ভীরস্বরে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। সেই অল্পসংখ্যক রাজপুত, এবার সত্য সত্যই সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মোগল সৈন্য-সাগরে ঝাঁপ দিল। চক্ষের নিমিষে সহস্র সহস্র মোগল ধরাশায়ী হইল। তাহাদের সেই হস্তস্থিত বন্দুক ও অন্যান্য অগ্নি-অস্ত্র, রাজপুত-সৈন্য কাড়িয়া লইল। কিন্তু হায়! তাহাতেও কোন ফলোদয় হইল না,—রাজপুত-ভাগ্যে বিজয়-লক্ষ্মী বাম হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মোগলের সৈন্য-সামন্ত অসংখ্য, অগ্নি-অস্ত্রাদিও অসংখ্য। কয়টা বন্দুক বা কয়টা কামান,—রাজপুত অধিকার করিবে? আর অধিকার করিলেই বা, বারুদাদি সংগ্রহ করিবে কোথা হইতে? অধিকন্তু, অগ্নি-অস্ত্রের ব্যবহারে, রাজপুতের তাদৃশী শিক্ষাই বা কোথায়? সুতরাং এ যাত্রা প্রতাপ, দুর্জ্জয় সাধনা সত্ত্বেও সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না।

তা না পারুন,—এখনও কিন্তু তাঁহার অন্তরের জিদ্ নিবৃত্ত হয় নাই। সেই স্বদেশদ্রোহী, ভীষণ বৈরী মানসিংহকে, এখনও তিনি প্রমত্ত কেশরীর ন্যায়, সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। ভীষ্মের ন্যায় যে, তিনি প্রতিজ্ঞাপরায়ণ!———সেই, আতিথ্য-সৎকারের দিন, তিনি যে, মানসিংহকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হইলে আরও সন্তুষ্ট হইব।" সেই প্রতিজ্ঞা, সেই তেজস্বিতা, সেই ঐকান্তিকতা যে, জ্বলন্ত আগুনের ন্যায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে!———পুরুষসিংহ প্রতাপ কি তাহা ভুলিয়া যাইতে পারেন?

সহস্র আঁখি বিস্তার করিয়া, মহাপ্রাণ প্রতাপ, সেই অগণিত মোগল-সৈন্যের মধ্যে দেখিতে লাগিলেন,——কোথায় সেই স্বদেশদ্রোহী মান-সিংহ!—কোথায় সেই কুলাঙ্গার! তখন আর তাঁহার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই,—কোন চিন্তার অবসর নাই,—তন্ময়ভাবে, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে, কেবল চারিদিক দেখিতেছেন,——সেই রাজপুত-কলঙ্ক, মহাবৈরী মানসিংহ কোথায়!

'চৈতক' নামে এক অতি সুশিক্ষিত অশ্বোপরি মহারাণা উপবিষ্ট। প্রতাপের যোগ্য অশ্ব।——তেজস্বী, সাহসী ও অসাধারণ বিক্রমশালী। আরোহীর গুণে, চৈতক, যুদ্ধ-কৌশলও সম্যক্ অবগত। সেই চৈতকে আরোহণ করিয়া, নির্ভীক প্রতাপ, ভীমবিক্রমে, মানসিংহের উদ্দেশে, সেই অগণিত মোগল-সৈন্যের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। অগণিত শত্রুগণে তিনি পরিবেষ্টিত;——অথচ গুপ্তভাবে নহে,—ছদ্মবেশে নহে,—আপনাকে এতটুকু লুকাইয়াও নহে,——সম্পূর্ণ পরিচিত করিয়া,—বিশেষ বিশেষত্বে আপনাকে নির্দিষ্ট করিয়া,—'আমি রাণা প্রতাপ'—শত্রুগণকে ইহা জানিতে দিয়া, প্রমত্ত কেশরীর ন্যায়, নির্ভয়ে, তিনি সেই অগণিত শত্রু-সৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি প্রকাণ্ড শ্বেতচ্ছত্র ও উজ্জ্বল রাজলক্ষণ 'লোহিত

সূর্য্যপ্রতিমা সংস্থিত। তাঁহার সম্মুখে লোহিত পতাকা সতেজে উড্ডীন। তাঁহার দেহরক্ষকগণ তাঁহার সাহসেই সাহসী হইয়া, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার অনুসরণে তৎপর। বালকে যেমন খেলার ছলে, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে অসংখ্য কচুবৃক্ষ কচ্ কচ্ কাটিয়া থাকে,——মানসিংহের উদ্দেশে, আপন পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, প্রতাপও তেমনি মোগল-সৈন্য খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। এরূপ বিপুল বিক্রমে ও সুদক্ষতার সহিত তিনি অসিচালনা করিতে লাগিলেন যে, শত্রু-সৈন্য কোনক্রমেই আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। তবে, প্রতাপের দেহ-রক্ষকগণ এই সময়ে একে একে ধরাশায়ী হইল।

কিন্তু তাহাতেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না,——সমান তেজে, সমান সাহসে, সমান অধ্যবসায়ে মানসিংহের উদ্দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। সেই প্রকাণ্ড রাজচ্ছত্র তখনও তাঁহার মস্তকোপরি সমুত্থিত হইয়া,—তাঁহার বীরত্ব, মহত্ব ও সম্মান ঘোষণা করিতে লাগিল।

এইরূপ একে একে শত্রু-সৈন্য মথিত করিয়া, প্রতাপ ক্রমেই মোগল-ব্যূহের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কৈ,—এখানেও ত মানসিংহ নাই? এখানেও ত সেই স্বদেশদ্রোহী, রাজপুত-কুলাঙ্গার উপস্থিত নাই?

তীব্র জ্বালাময় উত্তাপ বুকে বহন করিয়া, ক্রোধোদ্দীপ্ত গোক্ষুরাগর্জ্জনে, আরক্তলোচনে, এবার তিনি এক মহাশত্রুর পানে চাহিলেন। সে শত্রু মানসিংহ নয়,—কিন্তু সে শত্রু,—সেই স্বদেশশত্রু—মোগল আকবরের প্রিয়পুত্র,—সুলতান সেলিম।

"হায়, এত সন্ধানেও সেই স্বদেশদ্রোহী মানসিংহকে পাইলাম না?—যাই হোক, সেলিমকে পাইয়াছি!"

বিষাদ-হর্ষ-উত্তেজিত স্বরে, উচ্ছ্বাসভরে, এই কথা বলিতে বলিতে, প্রতাপ, সেলিমের সম্মুখে উপনীত হইবার ইচ্ছা করিলেন। সুশিক্ষিত

অশ্ব চৈতক, প্রভুর মনোভাব বুঝিয়া, এক লম্ফে প্রভুকে তাঁহার গন্তব্য স্থানে আনিয়া দিল।

বৃহৎ এক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, যুবরাজ সেলিম উপস্থিত মহাযুদ্ধের নেতৃত্ব করিতেছিলেন। অকস্মাৎ সম্মুখে প্রতাপের সেই ভীম-ভৈরব-রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া,—তিনি ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন। ——"ওঃ! কি সাহস! কি অদ্ভুত তেজস্বিতা! বিনা সৈন্যবলে, বিনা রক্ষকে, একাকীই আমার এই অগণিত সৈন্য-সাগরে ঝাঁপ দিল!— ধন্য রাজপুত বীরত্ব!"

হায়! মনে মনে এইরূপ ধন্যবাদ করিবার অবসরও সেলিমের হইল না,—মহাবল প্রতাপ চক্ষের নিমেষে, সেলিমের প্রায় সকল শরীর-রক্ষকেরই প্রাণসংহার করিলেন। তার পর সেই বিশাল হস্তে বিশাল শূল ধারণ করিয়া, মূর্ত্তিমান্ যমের ন্যায় তিনি সেলিমকে লক্ষ্য করিলেন। সে ভীষণ ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া, সেলিমের বাহন—সেই মহাকায় মত্ত মাতঙ্গও ভয়-চকিত হইয়া, ক্ষণেকের জন্য শুণ্ড সঙ্কুচিত করিয়া দাঁড়াইল। আর এদিকে,—বলিয়াছি ত,—যোগ্য আরোহীর যোগ্য অশ্ব!— চৈতকও সময় বুঝিয়া,—প্রভুর মনোভাব জানিয়া, সেই অবসরে, হস্তীর সেই বিশাল মস্তকোপরি, সম্মুখের এক পা তুলিয়া দিল। ঐরাবত তুল্য মহাগজের মস্তকোপরি উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় অশ্বের পদরক্ষা!—— সে দৃশ্যে সমবেত যোদ্ধৃবর্গ ক্ষণেকের জন্য চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইল। কার্য্যকুশল প্রতাপ আর এক লহমা অপেক্ষা না করিয়া, সেলিমকে লক্ষ্য করিয়া, বজ্রকঠিনহস্তে সেই কালান্তক শূল নিক্ষেপ করিলেন।

অতি বড় সৌভাগ্যবশতঃ সেলিম এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। কারণ হস্তিপৃষ্ঠে তাঁহার যে হাওদা ছিল, তাহা লৌহপত্র নির্ম্মিত; প্রতাপের মহাস্ত্র তাহাতে প্রতিহত হইয়া হটিয়া আসিল। কিন্তু সেই রুধির-পিপাসু অস্ত্রের বেগ একেবারে বৃথায় যাইল না,—হাওদার প্রতিহত

হইয়া হটিয়া আসায়, তাহা মাহুতকে বিষম আঘাতিত করিল, এবং সেই আঘাতেই হতভাগ্য মাহুত ভূতলে পড়িয়া গেল। এদিকে নিরঙ্কুশ হওয়ায়, ভীত মাতঙ্গ তৎক্ষণাৎ সেলিমকে লইয়া, তথা হইতে পলায়ন করিল।

তখন অমিতবিক্রমে, ভৈরবগর্জ্জনে, প্রতাপ মোগলসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি একাকী। তাঁহার দেহরক্ষক, সৈন্য, সর্দ্দার,—কেহই তাঁহার নিকটে নাই। হস্তিপৃষ্ঠে পলায়নকালে, সেলিম আপন সৈন্যগণকে ইহা জানাইলেন। তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। শেষ পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া বলিলেন, "যে প্রতাপকে বিনষ্ট বা বন্দী করিতে পারিবে, আমি নিজে তাহাকে এই মহামূল্য হার উপহার দিব।"

মোগল-সৈন্য এবার উৎসাহে মাতিল। তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে প্রতাপকে বেষ্টন করিল। তিন তিন বার প্রতাপের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইল। তিনটি ভল্লাঘাত, একটি গুলিকাঘাত এবং তিনটি তরবারির আঘাত,—তিনি পাইলেন। সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত, রুধির-ধারায় সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত,—তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই,———জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি শত্রুসংহারে কৃতসঙ্কল্প। সেই প্রকাণ্ড শ্বেতচ্ছত্র ও "সূর্য্য-প্রতিমা" তখনও গৌরবসহকারে তাঁহার মস্তকোপরি সংস্থিত।

"কিন্তু হায়! আর বুঝি রক্ষা হয় না,—আর কিঞ্চিৎ বিলম্বেই বুঝি, রাজপুতের সকল আশা-ভরসা চিরদিনের জন্য লোপ পায়!"

অদূরে একটি মহাপ্রাণ বর্ষীয়ান্ বীর, আপন মনে এই কথা বলিতে বলিতে, প্রতাপের সম্মুখীন হইলেন। কাতর নয়নে, নীরব প্রর্থনায়, প্রতাপকে কি জানাইলেন। প্রতাপ সে প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। বর্ষীয়ান্ বীর মনে মনে বলিলেন,

"না, এখন আর বুঝাইবার সময় নাই। হায় রে! মিবারের এ

উজ্জ্বল আলোক আজ নির্ব্বাপিত হইতে চলিয়াছে,——না, আমি জীবিত থাকিতে, এ দৃশ্য দেখিতে পারিব না! জানি, রাজপুতের নিকট মৃত্যু অতি তুচ্ছ; কিন্তু আমার নিকট—দেশের নিকট প্রতাপের মৃত্যু তুচ্ছ নহে! আমার ন্যায় কত রাজপুত প্রতিদিন মরিতেছে, জন্মিতেছে,—আমাদের ন্যায় লোকের মরণ-বাঁচনে পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। কিন্তু প্রতাপের ন্যায় ব্যক্তির মরণ-বাঁচনে, পৃথিবীর বিলক্ষণ যায়-আসে! অতএব প্রতাপকে রক্ষা করিতে হইবে।

"প্রতাপ জীবিত থাকিলে, দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। মিবারের পূর্ব্ব সৌভাগ্য ফিরিয়া না আসুক,—চিতোর স্বাধীন না হউক,—ব্রত উদ্যাপনে ব্যাঘাত ঘটুক,—তথাপি রাজপুতের প্রকৃত আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে,—ক্ষত্রিয়-রক্ত পবিত্র রহিবে,—এবং হিন্দুর কুলবালাগণ মোগলের বেগম বা বাঁদা সাজিয়া, জন্মজন্মান্তরের মহাপাতক সঞ্চয় করিবে না!

"তবে এই সময়,—এই উপযুক্ত অবসর! এই সময়ে মহারাণার জীবন রক্ষা করা আবশ্যক হইতেছে।——মা জন্মভূমি! দুর্ব্বল সন্তানের হৃদয়ে বল দাও;—যেন মা, মরিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও আমি দেশের কিছু কাজ করিয়া যাইতে পারি।"

মুখে কিছু না বলিয়া, সেই মহাপ্রাণ বর্ষীয়ান্ বীর, ধীরে ধীরে প্রতাপের সম্মুখীন হইলেন। এবং তারপর ধীরে ধীরে প্রতাপের সেই ছত্রধারী অনুচরের নিকট ঘেঁসিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে তাহার হাত হইতে সেই রাজছত্র ও সূর্য্য-প্রতিমা কাড়িয়া লইলেন, এবং তখনই আপন অনুচরবৃন্দকে ইঙ্গিতে জানাইলেন,—"আমার আদেশ পালন কর।"

বর্ষীয়ান্ বীর—ঝালাপতি মান্না,—প্রতাপের পুণ্যময় মহাপ্রাণ মাতুল, প্রতাপের মস্তক হইতে সেই রাজছত্র গ্রহণ করিয়া, আপন মস্তকোপরি ধরিতে অনুচরগণকে ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিতমাত্র, এক অনুচর, প্রভুর

আদেশ পালন করিল। পূর্ব্ব সঙ্কেত মত, অমনি সকল অনুচর উচ্চকণ্ঠে তাঁহাকেই "মিবারপতি" বলিয়া সম্বোধন করিল। মূর্খ মোগল-সৈন্য, ঝালাপতিকেই 'প্রতাপসিংহ' ভাবিল। একে রাজচ্ছত্র, তার উপর 'মিবারপতি' সম্বোধন,——তাহাদেরই বা বিশেষ দোষ কি?

প্রতাপ, এতক্ষণে সকল রহস্য বুঝিলেন। বুঝিলেন, তাঁহার প্রাণ-রক্ষার্থ,—মিবারের মঙ্গল কামনা করিয়াই, তাঁহার পিতৃপ্রতিম পূজনীয়—মহামান্য মাতুল—মহামহিমান্বিত ঝালাপতি মান্না, সত্য সত্যই এই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

প্রতাপ অনিচ্ছার সহিত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। শারীরিক অবসন্নতার সহিত তাঁহার নিদারুণ মানসিক কষ্টও হইয়াছিল।—হায়! তাঁহারই জন্য আজ সহস্র সহস্র রাজপুত বীর, হল্‌দিঘাটের সঙ্কীর্ণ গিরিপথে, জন্মের মত দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে!

কতকটা অন্যমনস্ক হইয়াও বটে, আর কতকটা অবসাদগ্রস্ত হওয়ার জন্যও বটে,—প্রতাপ যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিলেন। কয়েকজন বিশ্বাসী ভীল ও রাজপুত-সর্দ্দার, এই সময় তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গেল।

আর এদিকে?—এদিকে সেই অবসরে, সেই মহাপ্রাণ বর্ষীয়ান্ বীর ঝালাপতি মান্না,—অদ্ভুত বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া,—সহস্র সহস্র মোগলের প্রাণ লইয়া, বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন,—জগতে আত্মত্যাগের অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন।

এই মহাবীরের অবসানের সহিত অবশিষ্ট রাজপুত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, এবং সর্ব্ব-নিয়ন্তার ইচ্ছায়—মোগল-শিরে বিজয়-বৈজয়ন্তী শোভা পাইল।

হল্‌দিঘাটের মহা সমরাভিনয় এইরূপে সাঙ্গ হইল। এই মহা আহবে, চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত, অম্লানবদনে জীবন আহুতি দিয়াছিল। ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে এ কথা ঘোষণা করিতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিধির বিধান,—যাহা হইবার, তাহা ত হইল, কিন্তু এই ঘোর বিষাদের মধ্যেও একটি স্বর্গীয় দৃশ্য নয়ন-সমক্ষে প্রকটিত হইতেছে।

হলদিঘাটে—এই দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রে, প্রতাপের পরাজয়ও গৌরব গাথায় পূর্ণ। পরাজয়েও প্রতাপের বীরত্ব, শূরত্ব ও নির্ভীকত্ব—পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। অতি-বড় শত্রুও মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। ফলে, বিজিত মোগল, সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই, শতমুখে প্রতাপের গুণগান করিতে লাগিল।

শত্রুর মুখে শত্রুর গুণগান,—এমন অনুপম মাধুর্য্য ইহসংসারে আর কি আছে! লজ্জাবনতমুখী প্রেম-প্রতিমার স্মিত দৃষ্টিও ইহার নিকট ম্লান-বোধ হয়।

পাষাণে প্রেমাঙ্কুর,—সাহারায় বিকশিত পদ্ম,—নাস্তিকের প্রাণে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ——শক্তের মন আজ প্রতাপের জন্য আর্দ্র হইল!

সেই অপমানিত, তাড়িত, প্রতিহিংসায় জর্জ্জরিত, ভ্রাতৃ-রক্ত-দর্শন-লোলুপ—শক্তের মনে আজ অভাবনীয় ভাবান্তর!———প্রতাপের জন্য আজ শক্তের প্রাণ কাঁদিল!

প্রতাপের সেই অতুল পরাক্রম, লোকবিস্ময়কর বীরত্ব, স্বদেশরক্ষার্থ সেই জীবন-পণ,—তার পর তাঁহাকে রক্ষার্থ একটি মহাপ্রাণ নৃপতির আত্মোৎসর্গ,—এই সকল অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, হঠাৎ শক্তের প্রাণে কেমন একটা মহাভাবের আবির্ভাব হইল।——"হায়! আমিও না একজন রাজপুত? আমিও না শিশোদীয়কুলের একজন কীর্ত্তিমান্ পুরুষ? আমি না এই প্রতাপসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা?"————বিদ্যুতের গতি যেমন এক লহমার মধ্যে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রধাবিত হয়, শক্তের প্রাণেও অকস্মাৎ সেইরূপ একটা চিন্তার তাড়িত উদ্ভূত হইয়া, সমগ্র মনটাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে কেমন এক নূতনতর করিয়া ফেলিল।

শক্ত ভাবিল,—"হায়, আমিও না একজন রাজপুত? আমিও না এই প্রতাপসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা?

"যদি এই, তবে আমার প্রাণে সে স্বদেশ-ভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতি কৈ? আমার জীবনে সে উচ্চ আদর্শ কৈ? কার্য্যক্ষেত্রে আমার সে প্রবল পুরুষকারই বা কোথায়? বৃথা অভিমান,—নিষ্ফল অভিমান,—অনর্থকর অভিমান! স্বজাতি হইয়া আমি স্বজাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছি!——ধিক্ আমাকে!

"আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,——বংশের শেখর, কুলের প্রদীপ,—পবিত্রতার আধার,—রাজপুতজাতির আশা-ভরসার স্থল,—সেই পুণ্যবান্ ভায়ের উপর রাগ তুলিতে গিয়া, আমি অধঃপতনের এমন চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি! স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার সাজিয়া, 'ঘরভেদী বিভীষণ' হইয়া, আমি কিনা ভ্রাতৃরক্তে তৃপ্তিসাধন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি! ধিক্ আমার মনুষ্য-নামে,—ততোধিক আমার হিংসার তর্পণে!

"যাক্,—নরকের আগুন নিবে যাক্; মনের কালি বিলুপ্ত হোক; চণ্ডালতা,—হৃদয়ের ক্রূরতা ও বক্রতা দূর হোক্।——আজ আমি পাষাণে

প্রেমের নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিব। মা, দয়াময়ি, পরমেশ্বরি! অধম সন্তানকে ক্ষমা কর!”

ঝর্ ঝর্ করিয়া শক্তের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এদিকে প্রতাপ যখন সেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করেন, তখন তাঁহার অলক্ষ্যে, দুইজন মোগল-সৈনিক তাঁহার অনুসরণ করে। অনুতপ্ত শক্ত তাহা দেখিতে পান। তিনি বুঝিলেন, এখনও জ্যেষ্ঠের প্রাণ নিরাপদ নহে!——এই দুইজন মোগল অশ্বারোহী, এখনি মর্ম্মাহত প্রতাপের প্রাণ-হনন করিতে পারে।

শক্ত আপন মনে কহিলেন, “না, তা কখনই হইতে দিব না। যাঁহার উপর এই বিশাল সাম্রাজ্যের ভার অর্পিত,—এখনও সহস্র সহস্র রাজপুত যাঁহার মুখের পানে চাহিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ পুনরায় অসিধারণ করিবে. সেই মহান্ জীবনকে আমি কিছুতেই নষ্ট হইতে দিব না।”

আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া, শক্তও অলক্ষ্যে, সেই মোগল-সৈনিক-দ্বয়ের অনুসরণ করিলেন।

ভগ্ন-হৃদয় প্রতাপ,—শূন্যমনে, বিকলচিত্তে, চৈতকে আরোহণ করিয়া চলিয়াছেন। প্রাণ উদাস,—কোন দিকে লক্ষ্য নাই, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার জীবনে যে, আজ কি দারুণ কষ্ট হইতেছে. তাহা কেবল তিনিই বুঝিতেছেন।

অশ্বারোহী মোগল সৈনিকদ্বয় ক্রমেই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সম্মুখে একটি গিরি-তরঙ্গিণী অবস্থিত। অশ্বরাজ চৈতক একলম্ফে প্রভুকে নদী পার করিয়া চলিল। মোগল সৈনিকদ্বয়ের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। চৈতকের ন্যায় অশ্ব তাহারা কোথায় পাইবে? কাজেই নদী পার হইতে তাহাদের কিছু বিলম্ব হইল।

কিন্তু বিলম্ব হইলেও, কিছুক্ষণ পরেই, তাহারা আবার প্রতাপের নিকটবর্ত্তী হইল। প্রতাপের ন্যায় চৈতকের দেহও ক্ষতবিক্ষত, সর্ব্বাঙ্গ

রুধিরধারায় আপ্লুত—সে আর পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতবেগে প্রভুকে লইয়া যাইতে পারিল না। মোগল-সৈনিকদ্বয় দ্রুত অশ্বচালনে, এবার প্রতাপের অতি নিকটবর্ত্তী হইল। তাহারা পশ্চাৎ হইতে প্রতাপের প্রাণবধ করিতে মনস্থ করিল।

এমন সময় নক্ষত্রগতিতে অশ্ব ছুটাইয়া, শক্তসিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং একটি ফাঁকা-বন্দুকের আওয়াজ করিয়া, বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় উচ্চারণ করিলেন,——"হো নীল ঘোড়াকা আশওয়ার!" (হে নীল অশ্বের আরোহী!)

শক্তের এ স্বর, প্রতাপের কর্ণে স্পর্শিল। দারুণ দুঃসময়ে, মধুর মাতৃভাষায় এই প্রিয়-সম্বোধনে, প্রতাপের প্রাণে অমৃতসিঞ্চন হইল। কিন্তু সেই অমৃতসিঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গেই, আবার দারুণ ঘৃণা ও বিরক্তি,—তাঁহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, পশ্চাতে অশ্বারোহণে শক্ত উপস্থিত। কিন্তু একি! দেখিতে-না-দেখিতে, চক্ষের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে,——শক্ত ও কি করিল!——সেই দুই মোগল-সৈনিককে শাণিত কৃপাণে তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী করিল যে?

"কেন?——শক্ত, সহসা এ মোগল-সৈনিকদ্বয়ের প্রাণনাশ করিল কেন? মোগলপক্ষ অবলম্বন করিয়া, মোগলেরই প্রাণনাশ! কেন,—ইহার কারণ কি?

"তবে কি এই মোগল সৈনিকদ্বয় অলক্ষ্যে আমার অনুসরণ করিয়া, আমার প্রাণনাশ করিতে আসিতেছিল?———কিন্তু, শক্তই বা সহসা উহাদের প্রাণবধ করিল কেন?

"কারণ কি তবে এই,—শক্ত স্বহস্তে আমার প্রাণবধ করিয়া, চির-পোষিত প্রতিহিংসা পরিতৃপ্ত করিবে? উহাই কি শক্তের জীবনের ঐকান্তিক সাধ? মোগল-সৈন্যদ্বয় কি উহার সেই সাধে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিল? তাহারা কি আমার প্রাণবধে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল?

তাই কি শক্ত আপন পথ পরিষ্কার করিয়া, আমার নিকট আসিতেছে? ——ব্যাপার ত কিছুই বুঝিতেছি না।”

লিখিতে যত সময় গেল, ইহার সহস্রাংশেরও কম সময়ের মধ্যে, প্রতাপের মনে ইত্যাকার এবং আরও অনেক প্রকার চিন্তার উদয় হইল। কিন্তু চিন্তা যাহাই হউক,—তিনি রাজপুত,—মৃত্যু-ভয় তাঁহার কস্মিন্‌কালে হইতেই পারে না।—তিনিও অটলভাবে শক্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তাঁহার মনে কি ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আপন জীবনে বড় ধিক্কার জন্মিল।———“হায়! আমি পরাজিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছি! এখন বুঝিতেছি, এ প্রাণ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। তবে আর আত্মঘাতী হই কেন, —অভাগা শক্তের চিরদিনের সাধ আজ পূর্ণ করি।”

মনে মনে এই কথা বলিয়া, হৃদয়বান্ প্রতাপ আপন অসি ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর শক্ত নিকটবর্ত্তী হইলে, বুক পাতিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন,—

“আয় শক্ত! এই বুকে, তোর ঐ শাণিত অসি বিদ্ধ কর্। অনেক দিন হইতে তোর সাধ,—আমার রক্তে, তোর উত্তপ্ত প্রাণ শীতল করিবি! তা আয়,—আজ এই সুন্দর সময়, সুন্দর অবসর,—উৎকৃষ্ট সুযোগ,—আয় আয়, আমার এই ঘৃণিত বক্ষে, তোর ঐ তীক্ষ্ণ অসি আমূল বিদ্ধ কর্। স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়া, যে রাজপুত প্রাণ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, তাহার এইরূপ মৃত্যুই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত!

“কি ভাবিতেছিস্? নীরবে—দীন নয়নে, আমার মুখের পানে চাহিয়া, ও কি দেখিতেছিস্? এই নীরব পর্ব্বতশ্রেণী, এই নীরব বনস্থলী, এই নীরব নির্জ্জন স্থান,—চারিদিকে ঐ গম্ভীরা প্রকৃতি,——

মাথার উপর ঐ গম্ভীর অনন্ত আকাশ,—আয় আয় শক্ত! এ ব্যথিত,——এ তাপিত,——এ মর্ম্মাহত জনের মুক্তি কর্।

"কথা শুনিলি নে?—কাছে আসিলি নৈ? তবে, দে—দে—দেরে তোর ঐ শাণিত অসি! আমি আর অশ্ব হইতে নামিব না,———তোর অসি লইয়া, আত্মঘাতী হইয়া, আমি সকল জ্বালা জুড়াইব।"

অনুতপ্ত শক্ত, পূর্ব্ব হইতে যে হৃদয় লইয়া, যে কারণে জ্যেষ্ঠের নিকট আসিতেছিলেন, পাঠকের তাহা জানা আছে। সুতরাং এই দৃশ্যে, শক্তের হৃদয় সমুদ্র যে, কিরূপ আলোড়িত হইতে লাগিল, পাঠক তাহা আপন মন দিয়া বুঝুন।

ঝর্ ঝর্ ধারে শক্তের অপাঙ্গ বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি নীরবে অশ্ব হইতে নামিলেন। নীরবে আপন অসি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। নীরবে নতজানু হইয়া, যুক্তকরে দীননয়নে প্রতাপের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

এতক্ষণে প্রতাপ সকল ব্যাপার বুঝিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। ধীরে ধীরে শক্তের দুই হাত ধরিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহাকে উঠাইলেন। তারপর সাশ্রুনয়নে ধীরে ধীরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

নীরবে এই স্বর্গীয় অভিনয় হইতে লাগিল। নীরবে,—আকাশ মেদিনী, পর্ব্বত বনস্থলী,—এই অভিনয় দেখিতে লাগিল। নীরবে,—পুণ্য পবিত্রতা, প্রীতি ও শান্তি-সরলতা,—তথায় সমবেত হইল। মৃদু-মন্দ সমীরণ সঞ্চালনে, অথবা বিধাতার প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদবর্ষণে, ভ্রাতৃ-দ্বয়ের সর্ব্বশরীর জুড়াইল।

শক্ত প্রতাপের পদধূলি লইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"দাদা! আমি জীবনে কখন দেবতা দেখি নাই, যদি দেখে থাকি, ত সে আপনি! আমি অন্ধ,—আজ আমার চক্ষু ফুটিয়াছে;—আজ আমি আপনাকে চিনিয়াছি!"

প্রতাপও নীরবে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন।

শক্ত আবার বলিলেন, "দাদা! নিজগুণে মূর্খের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কোল দিয়াছেন; এখন আশীর্ব্বাদ করুন,—যেন জীবনে মরণে আপনার পদানত হইয়া থাকিতে পারি,—আর যেন কখন আমার দুর্ম্মতি না হয়।"

প্রতাপ, স্নেহভরে কনিষ্ঠের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। শক্তও যেন কৃতকৃতার্থ ও ধন্য হইলেন।

শক্ত পুনরায় কহিলেন, "দাদা! আজিকার যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া, আত্মধিক্কার করিতেছেন?—জীবন ভারবহ বোধ করিতেছেন? কিন্তু আপনার ন্যায় ভাগ্যবান্ কে? পরাজিত হইয়াও আপনি জেতার অধিক সম্মান পাইয়াছেন।—শত্রু-পক্ষ শতমুখে আপনার বীরত্বের গুণগান করিতেছে। অধিক কি, রণক্ষেত্রে আপনার অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া, আমার ন্যায় অধমাত্মার হৃদয়ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! দাদা, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার ন্যায় বীরব্রত গ্রহণ করিতে পারি;——আপনার ন্যায় স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিতে সক্ষম হই——নচেৎ আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

আশা-লতায় জলসেক হইল। গদ্গদস্বরে প্রতাপ বলিলেন,—

"শক্ত! সত্যই আমার এত সৌভাগ্য? বিধাতার এত দয়া আমার প্রতি? ভাই, সেই জন্যই কি তুই আমায় মোগল-সৈনিকের গুপ্ত-অস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছিস্? দেখ্, তোর কথায় আবার আমার বাঁচিতে সাধ যাইতেছে! না, মরিব না,—বাঁচিব;—যত দিনে হউক, জীবন-ব্রত উদ্যাপিত করিব। মন্ত্রের সাধন করিয়াছি,——মোগলের নিকট মস্তক অবনত করিব না। অদৃষ্টে যা থাক্—আবার দেখিব,—সর্ব্বান্তঃ-করণে ব্রত-পালন করিয়া শক্তিসঞ্চয় করিব।"

তাহাই কর।——পুণ্যপ্রাণ পবিত্রাত্মা তুমি,—তাহাই কর। পুণ্যার্থ-

পর মহাপ্রাণ পুরুষসিংহ তুমি,—তাহাই কর। ব্রত-ধারী ব্রহ্মচর্য্যরত বীরাগ্রগণ্য তুমি,—তাহাই কর। তোমার ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষের কাজও ত এই!

দুই ভ্রাতায় অনেক কথা হইল; কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণ। কারণ, শক্তকে এখনি মোগল-শিবিরে ফিরিতে হইবে। নচেৎ সেলিমের মনে, শক্তসম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উঠিতে পারে।

এই সময়ে প্রতাপের সেই প্রিয়তম অশ্ব—মুমূর্ষুপ্রায় চৈতক একবার সজলনয়নে প্রতাপের পানে চাহিয়া, খুব একটা গভীর ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া, প্রাণত্যাগ করিল। পশুর প্রাণ হইলেও, প্রতাপ তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। সম্পদে বিপদে, দুর্গমে প্রান্তরে, রণে বনে,—এই চৈতক তাঁহার বিশেষ সহায় ছিল। অনেকবার অনেক সঙ্কটপূর্ণ সময়ে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। সেই মহা-সহায় ও রক্ষক হারাইয়া, সহৃদয় প্রতাপ সত্য সত্যই অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পাঠক জানেন, রণস্থল হইতে চৈতক সম্পূর্ণ ক্ষত-বিক্ষত দেহে আসিয়াছিল। এখন এই সকল ক্ষতস্থান হইতে প্রবলবেগে রুধির-ধারা পতিত হওয়ায়, তাহার মৃত্যু হইল। অথবা তাহার কার্য্য ফুরাইয়াছিল,—তাই কর্ম্মস্বামী কাল—তাহাকে স্বস্থানে টানিয়া লইলেন।

মৃত্যু সময়ে সত্য সত্যই চৈতক, একবার সজলনেত্রে প্রভুর পানে চাহিয়াছিল। সত্য সত্যই একটা বিকট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, কি মর্ম্ম-ব্যথা জানাইয়াছিল। সে জানিত যে, প্রতাপ তাহাকে ভালবাসে। হায়! বনের পশুও ভালবাসা পাইলে অকৃতজ্ঞ হয় না! আর আমরা মানুষ, সে তুলনায় কি করি? আপন মনে এক একবার ভাবিয়া দেখিলে কি হয়!

প্রতাপ মনে মনে কহিলেন, "হায়! অদৃষ্ট মন্দ হইলে, এইরূপই হয়। আজিকার যুদ্ধে পরাজয়,—যুদ্ধস্থল হইতে আমার প্রত্যাগমন,—তারপর

আমার এই জীবনাবলম্বন প্রিয়তম চৈতকের মৃত্যু,—পুত্রশোক প্রায় আমার বুকে বিষম বাজিল। ওঃ! কি কঠোর কষ্ট!"

বীর প্রতাপ এবার মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিলেন। শক্ত জ্যেষ্ঠকে সময়োচিত সান্ত্বনা করিয়া, আপন অশ্ব তাঁহাকে দিলেন, এবং সেই মৃত মোগল সৈনিকের একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া সেলিমের নিকট পঁহুছিলেন।

হৃদয়বান্ কৃতজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্ত প্রতাপ,—চৈতককে যে, কিরূপ ভালবাসিতেন, ইতিহাস-পাঠক তাহা চৈতকের "স্মরণস্তম্ভ" স্মরণে বুঝিতে পারিবেন। যেস্থানে চৈতকের মৃত্যু হয়, পুণ্যপ্রাণ প্রতাপ, চৈতকের স্মরণার্থ, সেই স্থানে একটি স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, আপন মহৎ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

এদিকে সেলিম সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও, শক্তকে ক্ষমা করিলেন। ইতিহাস-পাঠক এইখানে সেলিমের প্রকৃত মহত্ত্ব অবগত হইবেন। এদিকে শক্তও নিরাপদে ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া,——ভ্রাতার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া, স্বজাতিকে ভালবাসিতে শিখিয়া, মনের সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

ভ্রাতায় ভ্রাতায় এই আনন্দ-মিলনে, দুঃখের দিনেও, সকলের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার হইল।

ইতি প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড—ব্রত-পালন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"যা হোক ভাই, খুব রঙ্গ শিখেছিলে!"

"কিন্তু তোমাকে ত ঠ'কৃতে হ'য়েছিল ভাই!"

"তা এমন ক'র্‌লে কে না ঠকে? যখন নন্দাই-এর ঘর আলো ক'র্‌বে, তখন হয়তো তাঁকেও একদিন এম্‌নি ঠ'কৃতে হবে ভাই!"

"ওকথা শিকেয় তুলে রাখ।"

"কেন লো, শিকেয় তুলে রাখ্‌বো কেন?"

"দিনমানে চাঁদও উঠ্‌বে না, আর চকোরও নাচ্‌বে না!"

"আমি বল্‌চি,—চাঁদও উঠ্‌বে, চকোরও নাচ্‌বে!"

"উহুঁ।"

"ওকি কথা ভাই! তুমি কি তবে চিরকালই কুমারী থাক্‌বে?"

"তোমার কি বোধ হয়?"

"আমার বোধে-অবোধে কি যায়-আসে? ও কথা তুমি জান, আর তোমার ভাই জানেন।"

সুসজ্জিত ও সুরম্য এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া, দুইটি রমণীর এইরূপ রসালাপ চলিতেছিল। একটি পূর্ণ যুবতী, আর একটি কিশোরী। যুবতীর বয়স অষ্টাদশ; কাঁচা সোণার ন্যায় রং, দিব্য মুখশ্রী, আকর্ণ-

বিস্তৃত চক্ষু, সুকোমল উন্নত বক্ষঃ। চরণচুম্বিত ঘন কেশরাশি এক হস্তে ধরিয়া, সুন্দরী সম্মুখস্থ দর্পণে আপন ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন। ক্ষীণ কটিতট, মেখলামণ্ডিত গুরুনিতম্ব,—পরিধানে একখানি সুচিক্কণ নীলবাস। গলায় একছড়া মণি-মাণিক্য-খচিত মূল্যবান্ হার, এবং দুইকর্ণে দুটি নীল দুল দুলিতেছে। স্মিতমুখী সুভাষিণী,—ভ্রাতৃজায়া; আর কিশোরী কুমারী,—ননদিনী।

কুমারীর বয়স চতুর্দ্দশ। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চাঁদপানা মুখ, সুন্দর অঙ্গসৌষ্টব। বিশাল চক্ষু, চাহনি চঞ্চল। কটাক্ষ বড় মধুর ও সরল। কুমারী পুরুষবেশ পরিধান করিয়া, ভ্রাতৃজায়ার সহিত কৌতুক করিতেছিলেন। ভ্রাতৃজায়া প্রথম তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই,—গৃহে পরপুরুষ প্রবেশ করিল ভাবিয়া, শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। ভ্রাতৃজায়ার আসল নাম ছিল,—যোধবাই কি অহল্যাবাই; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্রমা-কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ রশ্মি ফুটিয়া উঠিত বলিয়া, তাঁহার স্বামী আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন,—জ্যোৎস্নাময়ী। আর কুমারী ননদীর নাম,—যমুনা। এখন সেই জ্যোৎস্না ও যমুনায় মিলিয়া, যে হাস্যপরিহাস চলিতেছিল, পাঠক-পাঠিকাকে আমরা তাহার মাঝখান হইতে একটুখানি আভাস দিলাম।

পুরুষবেশে যমুনার প্রতিকৃতি খুলিত বড় ভাল। রাজপুত রমণীগণ স্বভাবতঃ যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, যমুনা সেরূপ পোষাক সচরাচর পরিত না। সে কখন বাঙ্গালী কুলবালাগণের ন্যায় চারু অঙ্গে মনোহর বাস দিয়া, খাঁটি বাঙ্গালী রমণী সাজিত; কখন মোগল রমণীদিগের ন্যায় গা-জামা পা-জামা পরিয়া, ওড়না দিয়া দেহ আচ্ছাদন করিত; কখন বা রাজপুত অঙ্গনাগণের ন্যায় ঘাঘ্‌রা পরিয়া, পায়ে ঘুমুর দিয়া চঞ্চল হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইত। আর খেয়াল হইলে,—কখন বা বাঙ্গালী বালক, কখন বা যুবক, এবং কখন বা রাজপুত বীর সাজিয়া, সকলকে কৌতুক-তরঙ্গে ভাসাইত। ভ্রাতার সহিত সে অনেকবার বাঙ্গালা

মুলুকে গিয়াছিল। বাঙ্গালীর রীতি নীতি, হাব ভাব, আদব কায়দা, কথাবার্ত্তা,—সকলই সে আয়ত্ত করিয়াছিল। তাহার ক্ষুরধার বুদ্ধি, অসাধারণ অনুকরণ-ক্ষমতা, প্রেমপ্রবণ সরস হৃদয়। তাহার ভাই তাহাকে প্রাণের সমান ভাল বাসিতেন;—তাহার অনেক আবদার-বায়না সহিতেন। পিতামাতা শৈশবেই গত হইয়াছিলেন।

হাস্যময়ী, রঙ্গপ্রিয়া যমুনা,—আজ বাঙ্গালী পুরুষ সাজিয়াছেন। ভ্রাতৃ-জায়ার সহিত আমোদ-আহ্লাদ করাই তাহার উদ্দেশ্য। ভ্রাতৃজায়া জ্যোৎস্নাময়ী তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর মত দেখিতেন। জ্যোৎস্না স্বাভাবিক কিছু ধীর ও গম্ভীর; কিন্তু যমুনার কাছে তাঁহার সেই ধীরতা বা গম্ভীরতা টিকিত না। কথায় না পারিলে শেষ যমুনা কাতু-কুতু দিয়া, ভ্রাতৃজায়ার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিত। ভ্রাতৃজায়া জ্যোৎস্না,—যমুনার নিকট অনেক বাঙ্গালা কথা এবং বাঙ্গালী চাল-চলনও শিখিয়াছিলেন।

এখন সেই সুচিক্কণ কেশগুচ্ছ লইয়া মুকুরে মুখ দেখিতে দেখিতে, বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে জ্যোৎস্না বলিলেন, "আমার বোধে-অবোধে কি যায় আসে? ও কথা তুমি জান,—আর তোমার ভাই জানেন।"

তারপর সস্নেহে, পার্শ্বোপবিষ্টা যমুনার সেই চাঁদপানা মুখে একটী মধুর চুম্বন করিলেন। সেই চুম্বনকালে দুইটি সজীব চাঁদ যেন এক হইল। স্নেহমাখাস্বরে জ্যোৎস্না কহিলেন, "দিদি আমার! এমন করিয়া আর কত দিন কাটিবে? তোমার দাদাকে বলি, যমুনা বিবাহে রাজী হইয়াছে। ——কেমন?"

যমুনা। বউ, এ কথা কি আজ নূতন বলিলে? যা বিধির লিখন, তাতে তোমার আমার হাত কি?

জ্যোৎস্না। বিধির লিখন বটে; কিন্তু আমাদেরও একটু উদ্যোগ-চেষ্টা চাই। আর সকলের মূল,—তোমার ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা না হইলে, শত চেষ্টায়ও কিছু হইবে না।

যমুনা। ইচ্ছা করিলেই কি, বাঞ্ছিত-বস্তু মিলে? না বউ, তা নয়। তা হ'লে ভাবনা কি ছিল।

জ্যোৎস্না। কেন, তোমার দাদা কত স্থান থেকে কত সম্বন্ধ আনিলেন; কত ভাল ভাল পাত্র স্থির করিলেন;—তা কিছুতেই ত তোমার মন উঠিল না?

যমুনা। ব'লে নাও বউ,—ব'লে নাও। তোমার মত জোর-কপাল ——(সাম্‌লাইয়া) হাঁ বউ, হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে মহারাণার পরাজয়ের পর আর কি হ'লো——তোমার বাপের কি কোন সংবাদ রাখ?

জ্যোৎস্না। (হাসিয়া) আর ভাই, কথা চাপা দিলে চলিবে না,—ধরা প'ড়েছ। তা হাঁ ভাই, আমার জোর-কপাল ব'লে কি, তোমার হিংসা হয়? তা নাও না ভাই কেন,—তোমার দাদাকে? তিনি যেমন কবি, তেম্‌নি কবি ভগিনিটিও তাঁর বামে বসিবেন!

ধাঁ করিয়া, জ্যোৎস্নার গালে, এক সোহাগপূর্ণ ঠোনা মারিয়া যমুনা কহিল,—

"তবে নাকি আমাদের বউ রসিকতা জানে না,—সদাই মুখ-ভার ক'রে থাকে?——তা বউ, এমন বোন্‌-ভক্ত ভাই, তোমার ক'টি আছে? রাণাদের ত বৃহৎ গোষ্ঠী। আর মহারাণা ত ধনুকভাঙ্গা পণ ক'রেচেন,—পতিত রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ,—কি কোন সম্বন্ধই রাখ্‌বেন না। তা এক পক্ষে হ'য়েচে ভাল,—ঘরাঘরি ও কাজটা চ'লে যাবে।————কেমন বউ?"

পক্কবিম্বাধরে মধুর হাসি হাসিয়া জ্যোৎস্না উত্তর করিলেন,—"তা গায়ের জোরে যা ব'লে নিতে পারো নাও,—কিন্তু নিজের কথায় নিজে ধরা দিয়েচ ভাই! ও মা, তাই ত বলি, ননদের আমার কোন সম্বন্ধ মনে ধরে না কেন? তা ত বটেই,——'দাদার মতন বর' এখন খপ্ ক'রে পাওয়া যাবে কোথা?"

সেই ভগবতীর মত ঢল ঢল মুখখানি,—সেই জলভরা ভাসা-ভাসা ডাগর চোখ দু'টি,—সেই মরালের মত কম্বু কণ্ঠটি,—সেই মুক্তা-পাঁতির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁতগুলি,—সেই লাল টুক্‌টুকে পাতলা ঠোঁট দু'খানি,——জীবন্ত প্রতিমারূপিণী জ্যোৎস্নাময়ী এবার এক-গাল হাসি হাসিয়া, যমুনার পিঠে ঢলিয়া পড়িলেন। কক্ষমধ্যে যেন বিজলী চমকিয়া গেল।

যমুনা সহজে অপ্রতিভ হবার মেয়ে নয়। জ্যোৎস্না অপেক্ষা সে বিলক্ষণ চতুরা। দুষ্টুমিতে জ্যোৎস্নার গুরুগিরি করিতে পারে। মনে মনে কি ঠাওরাইয়া, যমুনা এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "ফষ্টিনষ্টি যাক্ বউ,—আসল কথা কি জান ভাই!—যেমন তেমন রাজপুতকে ত আমি বিবাহ করিতে পারি না।—আমার যিনি পতি হইবেন,—— তাঁহাকে বীর, ধীর, সম্রান্ত এবং স্বাধীন-ভূপতি হওয়া চাই!——তবে ত ভাই, আমাদের পৈতৃক সম্ভ্রম বজায় থাকিবে!"

জ্যোৎস্না। (চিন্তা করিয়া) কৈ, একজন ছাড়া ত, এমন গুণবান্ পুরুষ, সমস্ত রাজস্থানের মধ্যে আর দেখ'তে পাই না। সে একজন —আমার পিতৃব্য,——মহারাণা প্রতাপসিংহ। তা বাদে ত, আর সকল রাজপুতই পতিত ও পরাধীন;—সকলেই দিল্লীশ্বরের নিকট মাথা নোঙাইয়াছেন।———বোন্, তবে দেখ্‌ছি তুমি আকাশে ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছ;——বর আর তোমার কপালে মিলিতেছে না।

যমুনা। তা না মিলুক,——তোমাকে লইয়া, এমনি হাসি-খুসি করিয়া দিন কাটাইব।

জ্যোৎস্না। সে আর কত দিন বোন্? বয়সের বেগ রোধ করা————

যমুনা। তা সে বিষয় নিয়ে, তোমার আমার অত মাথা ঘামায়ে কাজ নেই——তার চেয়ে এস কিছুক্ষণ দাম্পত্য-প্রণয় উপভোগ করি!

জ্যোৎস্না। সে আবার কি ; কবি-ভায়ের কাছে এ খেলাও শিখেচ নাকি ?

যমুনা সেই এক কথা বলিয়া ফেলিয়া বড় ঠকিয়াছে,——দেখিল, এখনও তাহার জের্ মিটিতেছে না।

হাড়ে-হাড়ে চটিয়া, মনে মনে জ্যোৎস্নার মুণ্ডপাত করিতে করিতে, যমুনা প্রকাশ্যে বলিল,—

"এ দাম্পত্য-প্রণয় কি রকম জান ? এই, আমি যেন তোমার স্বামী, আর তুমি যেন আমার স্ত্রী। তুমি মান ক'রে, মুখ ভার ক'রে ব'সে থাক,—আর আমি তোমার পায়ে ধ'রে সাধি।———কেমন পার্‌বে না ?"

জ্যোৎস্না। নে ভাই, কত খেলাই জানিস্ !——তা তোর যা ইচ্ছা,—কর।

মনে মনে কহিলেন, "আহা, বোন্ রে ! কবে তোরে স্বামীর পাশে দেখে, চক্ষু সার্থক করিব !"

তারপর যমুনাকে বলিলেন, "তা এই পুরুষের পোষাকটা খুলে ফেল ;—এমন ভাবে আর কতক্ষণ থাকিবে ?"

যমুনা। না, না, পোষাক খুলিব কেন ? তা হ'লে আর আমোদ হলো কি ? আমার এই পুরুষবেশেই ত স্বামীর বাহার খুলিবে !

মনে মনে বলিল, "রও, তোমার রসিকতার পাল্‌টি জবাবটা ভালো ক'রে দিই।"

জ্যোৎস্না। তা এই আমি তোমার বামে দাঁড়ালুম। এখন আর কি কর্‌তে হবে,—বল।

সুন্দর যুবক বেশে যমুনা সজ্জিতা ; তিনি স্বামী হইয়া দক্ষিণে দাঁড়াইলেন। আর অপরূপ রূপবতী যুবতী জ্যোৎস্নাময়ী,—লজ্জাবনতমুখে স্ত্রী হইয়া বামে বিরাজ করিলেন। যমুনা একবার বঙ্কিম-নয়নে

জ্যোৎস্নার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "তবে বিধুমুখি! এইবার পালা আরম্ভ করি?"

এই বলিয়া নতজানু হইয়া, কীর্ত্তনের স্থুরে গাহিলেন,———

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা রোচয়তি লোচনচকোরং॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং দেহিমুখকমলমধুপানং॥

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং॥"

জ্যোৎস্না। (হাসিয়া) এত ঠাট্ও শিখেছিলে ভাই! তুমি যদি সত্যি পুরুষ হ'তে, তা হ'লে না জানি, আরও াক ক'ত্তে!

যমুনা। (ভ্রূকুটী করিয়া) এখন ও-কথা ব'ল্তে নেই,—রসভঙ্গ হ'বে।——আমাকে সত্য সত্যই পুরুষ ভাব না?

জ্যোৎস্না। ভাল,—তাই ভাবলুম।——আমায় আর কি ক'ত্তে হ'বে ব'লো।——কেষ্ট-ঠাকুর হ'য়ে আমি আর দাঁড়িয়ে থাক্তে পারি না।

যমুনা। না, না, প্রাণেশ্বরি! আমিই তোমার প্রেমের কৃষ্ণ,——তুমিই আমার প্রেমের রাধা! এখন মানময়ি! মান ত্যাগ ক'রো। প্রিয়ে চারুশীলে! প্রসন্ন হও। তোমা বৈ আর আমি জানিনে কিছু রাধে!——ওাক! ও বউ! চুপ ক'রে রইলে যে! এমন সময় কি আমার মুখের পানে অমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাক্তে আছে? ঐ নীল-বসনে বদন ঝাঁপো,——আমায় দেখে মুখ ফিরোও,——মুখখানায় বিরক্তি, ক্রোধ, ভ্রূকুটি, ঘৃণা এই সব দেখাও,——তবে ত মান মানাবে!

জ্যোৎস্না। না ভাই, এরকম মানের সং দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়।——তুমি অন্য পালা আরম্ভ কর।

যমুনা। তবে তাই হোক্।——প্রাণেশ্বরি! তোমায় আমি বড় ভালবাসি।

জ্যোৎস্না। (স্মিতমুখে নিরুত্তর)

যমুনা। ও বউ, উত্তর দেনা ?

জ্যোৎস্না, এবারও নিরুত্তর।

তখন চঞ্চল যমুনা জ্যোৎস্নার গালে একটা চুমা খাইল। সেই এক চুম্বনেই, জ্যোৎস্নার সেই গোলাপফুল-তুল্য গণ্ডস্থল লাল হইয়া উঠিল। স্বভাবসুন্দরী, মুখে কিছু না বলিয়া, কেবল স্মিতমুখে যমুনার প্রতি একটি স্নিগ্ধ কটাক্ষ করিলেন।

যমুনার তাহাতেও মন উঠিল না। সে বলিল,—

"না ভাই বউ, তুমি আমার স্ত্রী হ'তে পার্‌লে না! আমি বলিলাম, "প্রাণেশ্বরি! তোমায় আমি বড় ভালবাসি",———আর তুমি কিনা চুপ ক'রে রইলে? তুমি অম্‌নি বল, "প্রাণেশ্বর! তোমার ঐ চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে যেন আমি মরিতে পারি!"———কিছু না ব'ল্‌তে পার,—— আমি এখন স্বামী,—নিদেন আমার গালে একটা চুমো-ও খাও!"

জ্যোৎস্না এবারও কিছু বলিলেন না,—চুমাও খাইলেন না,—একটু হাসিলেন মাত্র।

যমুনা মনে মনে বলিল, "না, আর মিছে সময় নষ্ট করা কিছু নয়,— এইবার বউকে শিক্ষা দিই।"

তখন সেই চঞ্চলনয়না—শ্যামাঙ্গী কিশোরী,———সেই সুকুমার যুবা-বেশেই, ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নাকে আলিঙ্গন করিল। তারপর খুব আচ্ছা করিয়া দুই বাহুদ্বারা, জ্যোৎস্নার গলদেশ জড়াইয়া ধরিল। জ্যোৎস্না,———"ওকি, ওকি,—ছাড়্ ভাই ছাড়্,—আমার ঘাড়ে বড় লাগ্‌চে"——বলিতে-না-বলিতে, দুষ্ট যমুনা চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল,———

"ওগো! তোমরা শীঘ্র এস গো,——বউ-এর ঘরে পুরুষ ঢুকেচে,——বউকে বে-আবুর ক'চ্চে!"

জ্যোৎস্না যত ঘাড় ছাড়াইবার চেষ্টা করে, যমুনা তত জোরে চাপিয়া ধরে। জ্যোৎস্না যত যমুনার মুখ চাপ্‌য়া দিতে যায়, যমুনা তত উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইতে থাকে,—

"ওগো, তোমরা শীগ্‌গির এস গো,—সর্ব্বনাশ হ'লো,—সর্ব্বনাশ হ'লো,—বো'র ধর্ম্মনষ্ট হ'লো!"

ক্রমাগত এইরূপ করাতে, জ্যোৎস্না হাঁপাইয়া পড়িল; বুঝি একটু কাঁদিয়াও ফেলিল। দুষ্ট যমুনা কি, তবুও ছাড়ে গা? মাঝে মাঝে কেবল বলিতেছে,———"কেমন, 'দাদার মতন'—আর ব'ল্‌বে?"

এখন, ইহার ফল হইল এই যে, বহির্বাটী হইতে ভৃত্যাদি সব হাঁক-ডাক করিতে করিতে অন্দরে আসিল,—স্বয়ং গৃহস্বামী—পৃথ্বীরাজ অবধি তথায় উপস্থিত হইলেন,—এবং "ব্যাপার কি,—হইয়াছে কি?"—ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এই কথা বলিতে বলিতে জ্যোৎস্নাকে কারণ জিজ্ঞাসিলেন। বলা বাহুল্য, দুষ্ট যমুনা ইতিপূর্ব্বে আপনগৃহে গিয়া, তাড়াতাড়ি সেই পুরুষবেশ ত্যাগ করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে!

নিরুপায় জ্যোৎস্না, তখন আর স্বামীকে কি উত্তর দিবেন!—কীল্ খাইয়া তিনি কীল্ চুরি করিলেন। কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন, "না, এমন কিছু নয়,—ও যমুনার রঙ্গ।"

পৃথ্বীরাজ। তাই ভাল,—আঃ বাঁচলুম। তাই ত বলি, এ দিন-দুপুরে, আমার সাত-রাজার-ধনটীকে, কে চুরি ক'ত্তে এলো!———আমার পাগলী বোন্,—ক্ষেপী বোন্ কিনা। হাজার হোক্,—এখনও বালিকা,—বালিকা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এখন, এই পৃথ্বীরাজ কে, পাঠকের মনে সহজেই, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। আমরাও সংক্ষেপে সে কথা বলিব। এই প্রসঙ্গে, বাকী কথাও পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন।

ইতিহাস-পাঠক অবগত আছেন, সম্রাট আকবর ছলে বলে ও কৌশলে অনেক রাজপুতকে আপনার অধীন ও বশীভূত করিয়াছিলেন, এবং কাহাকে কাহাকেও বা বন্দীও করিয়াছিলেন। বিকানীরের রাজা পৃথ্বীরাজ তাঁহাদের অন্যতম। পৃথ্বীরাজ অদৃষ্ট-দোষে বাহিরের সকল স্বাধীনতাই হারাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরের স্বাধীনতা বিন্দুমাত্রও বিলুপ্ত হয় নাই। কারণ, তিনি দুর্লভ কবি-জীবন লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত কবি বা হৃদয়বান্ পুরুষ, গ্রহবৈগুণ্যে, নাগপাশে বদ্ধ হইলেও, মনের স্বাধীনতা, তেজস্বিতা ও ন্যায়পরতা বিসর্জ্জন করেন না। ইহা ব্যতীত সারল্য, সহৃদয়তা, অমায়িকতা, গুণগ্রাহিতা ও উদারতা,—কবি-হৃদয়ের অলঙ্কার। বিকানীর-রাজ পৃথ্বীরাজ,—এ সকল গুণেরই পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। তাঁহার তেজস্বিনী ও মর্ম্মস্পর্শিনী কবিতায় অনেকে মুগ্ধ হইত।

দিল্লীশ্বর এই রাজপুত কবিকে কৌশলে বন্দী করিয়া, আপন সভাসদ্-দলভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখে রাখিতে

এবং যথোচিত সম্মান-সংবৰ্দ্ধনা, করিতে সম্রাট ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু বনের পাখীকে স্বর্ণ-পিঞ্জরে রাখিয়া উপাদেয় আহার দিলেই কি, পাখী পরিতৃপ্ত হয়? পৃথ্বীরাজের সংসারের আর সবই ছিল,——স্নেহময়ী ভগিনী,—প্রেমময়ী সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী, অনুগত দাস দাসী এবং অপোষ্য কুপোষ্য ও আত্মীয় কুটুম্ব,—সকলই ছিল,—ছিল না কেবল স্বদেশের কোন কাজ করিবার শক্তি,—জননী-জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ আত্মোৎসর্গ করিবার শক্তি! রাজপুত হইয়া, বীর-কবি হইয়া, যিনি এ শক্তি হারাইলেন, তাঁহার বাড়া দুঃখী আর কে? কত দিন—কত রাত্রি তিনি চিন্তাকুল অন্তরে, বিষাদভরে, আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াছেন, এবং ইষ্টদেবতার চরণে আপন দুর্ব্বহ জীবনের অবসান প্রার্থনা করিয়াছেন। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মনে মনে বলিয়াছেন,—

“হায়! বৃথায় এ নিষ্ফল দেহ-ভার বহন করিতেছি! পাপ মোগল মিবারের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিল, আর আমি কিনা সেই মিবারবাসী হইয়া, সেই মোগলেরই অনুগ্রহভাজন হইয়া বাঁচিয়া আছি! স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা, জননী-জন্মভূমির উদ্ধার, ইহা শুধু আমার কল্পনারই বিষয়ীভূত হইয়া রহিল! ধন্য সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ!—ধন্য মহারাণা প্রতাপসিংহ! কেবল সেই মহাপুরুষই আজিও দেশের জন্য বুক চিরিয়া রক্ত দিতেছেন।—হায়! এ শুভদিনে যদি আমি তাঁর একজন পতাকাধারী অনুচর হইয়াও তাঁর পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিতাম! তাহা হইলেও জীবন সফল হইত;——তাহা হইলেও এ অরুন্তুদ যন্ত্রণায় দিবানিশি দগ্ধ হইতে হইত না।”

সত্য,—এমন মহাপ্রাণ পুরুষ বাঁচিয়া থাকিয়াও, দেশের জন্য কিছু করিতে পারিতেছেন না! যাঁহার উদ্দীপনময়ী কবিতার দুই চারি চরণ শ্রবণ করিলেই, রাজপুতবীরের বল দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইতে পারিত;—যাঁহার সাহায্য পাইলে,—ব্রতধারী প্রতাপ, আরও অনেকদূর অগ্রসর

হইতে পারিতেন, সেই বিকানীর-রাজ বীরকবি পৃথ্বীরাজ আজ আকবরের মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ!—এ ক্ষোভ কি রাখিবার স্থান আছে?

সুখের মধ্যে, একটি বিষয়ে পৃথ্বীরাজ বড় ভাগ্যবান্। বুঝি এই ভাগ্যবলে, এত মনঃকষ্টের মধ্যে, আজিও তিনি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন্। সে বিষয়টি,—তাঁহার সহধর্ম্মিণী। বস্তুতঃ কবির স্ত্রী-ভাগ্য বড় উজ্জ্বল। সে ঔজ্জ্বল্য এত যে, সংসারের আর সহস্র দুঃখের বিনিময়েও, মানুষ তাহা লইয়াই সুখী হইতে পারে।

রূপে গুণে এই স্ত্রী-রত্ন অতুলনীয়। কবি-কল্পনা নহে,—ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

এই রমণীরত্নের ঈষৎ পরিচয় আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দিয়াছি। ইনিই সেই জ্যোৎস্নাময়ী। লাবণ্যময়ী, প্রেমময়ী, স্নেহময়ী—জ্যোৎস্নাময়ী। পতিরতা, পতিব্রতা, সতীসাধ্বী—জ্যোৎস্নাময়ী। মহাপাপনিবারিণী, সতীত্ব-রক্ষাকারিণী, তেজস্বিনী—জ্যোৎস্নাময়ী। আর্য্য-কুললক্ষ্মী, সিংহবলশালিনী, প্রতিমারূপিণী,—জ্যোৎস্নাময়ী। জ্যোৎস্নার প্রতি এত উচ্চ বিশেষণ, আমরা অযথা প্রয়োগ করিলাম না,—পাঠক যথাকালে ইহার পরিচয় পাইবেন।

এই জ্যোৎস্না,—মহারাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রী,—শক্তসিংহের কন্যা;—পাঠক পাঠিকার একথাটিও জানিয়া রাখা ভাল।

জ্যোৎস্না যেমন পবিত্রকুলের কন্যা, তদুপযুক্ত পাত্রেও তিনি সমর্পিতা।——পৃথ্বীরাজ পরম রূপবান্, ও বিদ্বান্।—এমন মণি-কাঞ্চন-যোগ কি একেবারে নিষ্ফল হইতে পারে?

যমুনার দৌরাত্ম্যে, পৃথ্বীরাজ ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরে আসিতে বাধ্য হইয়া, পরিহাসচ্ছলে স্মিতমুখে প্রণয়িনীকে কহিলেন, "তাই ভাল,—বাঁচলুম। তাই ত বলি,—এ দিন-দুপুরে, আমার সাতরাজার-ধনটিকে, কে চুরি ক'র্ত্তে এলো?"

তার পর, এ-কথা সে-কথার পর পৃথ্বীরাজ প্রেমপরিপ্লুতস্বরে বলিলেন, "প্রিয়ে! তোমার মুখ দেখিয়া আমি সকল কষ্ট ভুলিয়া আছি। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে,—তুমিই আমার জীবন-সঙ্গিনী।——চন্দ্রাননি! এখন যমুনার বিয়ের কি করি বল দেখি? ওকে এই কুমারী অবস্থায় আর কতকাল রাখিব?"

সতী, স্বামীর হাতখানি আপন হাতে রাখিয়া, মধুমাখাস্বরে উত্তর করিলেন, "আমিও সর্ব্বদাই ইহা ভাবি। অদৃষ্টে যে কি আছে, কিছু বুঝিতে পারি না। এত স্থান হইতে—সম্বন্ধ আসিল,—এত লোক বিবাহ-প্রার্থী হইল, তা কেমন ভবিতব্য!—কোনটাই পাকা হইল না।"

পৃথ্বীরাজ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বাবা থাকিতেন,—মা থাকিতেন,—আমাকে এ ভাবনা ভাবতে হইত না। তাঁরা তাঁদের মনোমত পাত্রেই কন্যাদান করিয়া সুখী হইতেন। কিন্তু আমার মনোমত পাত্র ত আমি খুঁজিয়া পাই না।

"রাজপুতের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কন্যা ও ভগিনীর বিবাহ দেওয়া, একটা মহা দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কত হতভাগ্য, তুচ্ছ অর্থ ও সম্পদলোভে, পবিত্র বংশগৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া, ধর্ম্ম ও আভিজাত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, মোগলের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করিতেছে!——হায়! অবশেষে আমাকেও কি সেই পথের পথিক হইতে হইবে? আর্য্যরক্ত দেহে ধারণ করিয়া, প্রাণ থাকিতে ত আমি সে কাজ করিতে পারিব না! অবস্থাবিপর্য্যয়ে বাহিরের স্বাধীনতা হারাইয়াছি বটে; কিন্তু মনের স্বাধীনতা এখনও আমার অক্ষুণ্ণ আছে।—যমুনা কি আমার সে স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিবে?—ভগবান্, তুমিই মুখ রেখো!

"কিন্তু এমন অবস্থাতেই বা আর কত দিন নিশ্চিন্ত থাকি? হিন্দুর ঘরে এত বড় অবিবাহিতা কন্যা রাখিলে, শাস্ত্রানুসারে পাপ হয়। জানিয়া শুনিয়াও আমি সে পাপ বহন করিতেছি;—পূর্ব্বপুরুষগণকে

নিরয়গামী করিতেছি। কিন্তু মুসলমানের করে ভগিনী দান করিলে, পাপ-ভার কি আরও বৃদ্ধি হইবে না?——না, প্রাণ থাকিতে আমি তাহা পারিব না! ইহাতে যমুনার অদৃষ্টে চির-কৌমার্য্য থাকে,—সেও বরং শ্রেয়ঃ———প্রিয়ে, এ বিষয়ে তুমি কিরূপ বিবেচনা কর?"

জ্যোৎস্না। স্বামিন্, তুমি যাহা ভাল বুঝিবে, আমার পক্ষে তাহাই ভাল; তুমি যাহা মন্দ মনে করিবে, আমার পক্ষে তাহাই মন্দ।——— আমার আবার স্বতন্ত্র বিবেচনা কি?

পৃথ্বীরাজ। তবু? যমুনার মনের ভাব তুমি কিরূপ বুঝ—কিরূপ পাত্রে সে পরিণীতা হইতে ইচ্ছা করে?

জ্যোৎস্না একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাহা বুঝিয়াছি এবং যতদুর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে পরিণাম বড় ভাল বোধ হয় না।"

পৃথ্বীরাজ উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি!"

জ্যোৎস্না। যমুনার মনের ভাব,—কোন পতিত রাজপুতকে সে বিবাহ করিবে না। যদি বিবাহ করিতে হয়, ত আমার পিতৃবংশীয় কোন বীরকে।

পৃথ্বীরাজ। (সাহ্লাদে) আমারই ভগিনীর যোগ্য কথা বটে।

জ্যোৎস্না। কথা বটে, কিন্তু সে পক্ষে অন্তরায় অনেক।

পৃথ্বীরাজ। অন্তরায় যে অনেক, তাহা জানি। তবু প্রিয়ে, যমুনার যে এরূপ উচ্চ প্রবৃত্তি আছে, ইহাও একটা বিশেষ আনন্দের কথা। সকলের প্রবৃত্তিও এমন হয় না।—হায়, ঈশ্বর কি তাহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন না?

জ্যোৎস্না। তিনি ইচ্ছা করিলে সকলই সম্ভবে। তা আমাদের কি সে শুভ অদৃষ্ট হইবে?—যমুনা কি বাঞ্ছিত পাত্রে পরিণীতা হইবে?—— হাঁ, সেদিন বলিতে বলিতে বন্ধ করিলে;—হলদিঘাটের যুদ্ধে মহারাণার পরাজয়ের পর পিতৃদেব কি করিলেন?

পৃথ্বীরাজ। প্রিয়ে, সে বড় শুভ সংবাদ। মহারাণার পরাজয়ে অবশ্যই দুঃখিত হইয়াছি বটে, কিন্তু তোমার পিতার সহিত তাঁহার অভাবনীয় মিলনে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। বুঝিয়াছি, এতদিনে বিধাতা পবিত্র শিশোদীয়-কুল রক্ষা করিলেন। এতদিনে মহারাণা প্রতাপসিংহের ব্রত উদ্‌যাপনের পথ পরিষ্কার হইল।

জ্যোৎস্না। আর আমারও মুখ উজ্জ্বল হইল! প্রাণেশ্বর! বলিব কি, যেদিন শুনিলাম, পিতা আমার পিতৃব্যের সহিত বিবাদ করিয়া, প্রতিহিংসা-পরবশে মোগলের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে আমি মরমে মরিয়া গেলাম। অন্যের নিকট ত দূরের কথা,—তোমার নিকটও মুখ তুলিয়া কথা কহিতে আমার লজ্জাবোধ হইত। কত রাত্রি, তুমি জান না,—তুমি ঘুমাইলে আমি মুক্ত বাতায়নদ্বারে বসিয়া, যুক্তকরে, অনন্ত আকাশ পানে চাহিয়া, নীরব প্রার্থনায় সেই বিশ্বেশ্বরের চরণ অর্চ্চনা করিয়াছি;—আমার অপাঙ্গ বহিয়া দর দর ধারে জল পড়িয়াছে;—তারপর উঠিয়া তোমার চরণতলে শয়ন করিয়াছি। বিধাতা এতদিনে আমার সে মর্ম্মকাতরতার প্রতিবিধান করিয়াছেন। পিতা ও পিতৃব্যের মধ্যে যে শান্তিস্থাপন হইয়াছে, ইহা মিবারের একটি শুভ লক্ষণ।

পৃথ্বীরাজ। সার কথা। গৃহ-বিবাদই যত অনর্থের মূল। এই গৃহ-বিবাদেই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। রাজপুতজাতির আজ যে এত অবনতি, তাহার মূলেও এই গৃহবিবাদ। তোমার পিতার ও পিতৃব্যের মনোবিবাদ যে মিটিবে, কেহ আশা করে নাই। শুনিয়াছি, মোগল এজন্য চিন্তিত।

জ্যোৎস্না। তা হইবার কথা।—এখন যে কথা বলিতেছিলাম।—পিতার সহিত পিতৃব্যের যে মিলন হইয়াছে, ইহাতে যমুনার মনোরথ সিদ্ধির একটা উপায় দেখিতেছি।

পৃথ্বীরাজ। (উৎসুকভাবে) যমুনার মনোরথ সিদ্ধি? কি, বল দেখি?

জ্যোৎস্না। এখন আমার পিতৃব্যের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার অমরের সহিত যমুনার বিবাহ হইলেও হইতে পারে।

পৃথ্বীরাজ বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "মহারাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত যমুনার বিবাহ? আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হইবে?"

জ্যোৎস্না। তুমি আমার পিতাকে পত্র লিখিয়া এ বিষয় একবার জানিতে পার?

পৃথ্বীরাজ। অতি উত্তম পরামর্শ। কিন্তু প্রিয়ে, শত্রুপুরীতে বাস করিয়া, এতটা সৌভাগ্য আমাদের ঘটিবে কিনা, জানি না। হায়! কত মোগলের কলুষিত দৃষ্টি যমুনার উপর পড়িয়াছে। কত পাপিষ্ঠ, হীন প্রলোভনে আমাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। কত স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার আপনাদের মুখ পোড়াইয়া, আমাকেও তাহাদের দলভুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। এমত অবস্থায় এ সংবাদ যদি সম্রাটের কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে কি তিনি সহজে আমাদের এ শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিবেন?

জ্যোৎস্না। ভাবনার কথা বটে।

পৃথ্বীরাজ। দেখ, মহারাণাকে আমি প্রকৃতই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকি। তাঁহার পুত্রের সহিত আমার ভগিনীর বিবাহ হইতে পারে,—এ কল্পনায়ও আমার মনে আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। প্রিয়ে, তুমি ত জান, আমি প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবার সময় মহারাণার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া শয্যাত্যাগ করি। তিনি আমার ধ্যান, জ্ঞান, জীবনাদর্শ,—ইহলোকে প্রত্যক্ষ দেবতা।—তাঁহার পুত্রের সহিত যমুনার বিবাহ? আমাদের এ সৌভাগ্য হইবে কি?

জ্যোৎস্না। হয় না হয়, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হানি কি?

পৃথ্বীরাজ। ভাল, তাহাই হইবে। ইতিমধ্যে তুমি যমুনার মনটা একবার ভাল করিয়া বুঝিও।

জ্যোৎস্না। ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি।——প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চাও?

পৃথ্বীরাজ। (ঈষৎ হাসিয়া) কি?

জ্যোৎস্না। পিতৃদেব মোগলের সহিত মিলিত হইবার সময়, আর-আর জিনিসের সঙ্গে, আপনাদের পরিবারের কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি আনাইয়াছিলেন,—মনে আছে?

পৃথ্বীরাজ। হাঁ, তাহা হইতেই ত আমি পুণ্যশ্লোক প্রতাপসিংহের—ঐ প্রস্তর-ফলক খোদিত প্রতিমূর্ত্তিখানি সংগ্রহ করিয়াছি।

জ্যোৎস্না। ইহা ব্যতীত আরও কয়খানি চিত্র আমার কাছে আছে। এক খানিতে আমার পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতাদিগের—সকলেরই প্রতিকৃতি আছে। সেখানি কিছু বড়। সেখানিতে অমরের ছবিও আছে। যমুনা আমার নিকট হইতে সেখানি চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। বলে, তাহা আর আমাকে ফিরাইয়া দিবে না। ঘটনাক্রমে একদিন আমি দেখি, যমুনা আর সকল ছবিগুলি একরূপ মুছিয়া ফেলিয়া, কেবল অমরের ছবিটি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে আমার অনুমান হয়, অমরকে সে মনে মনে ভাল বাসিয়াছে।

পৃথ্বীরাজ একটু হাসিলেন। তিনি সহৃদয় কবি। লৌকিক ও সামাজিক নিয়মের বড় একটা ধার ধারেন না। স্ত্রীকে বলিলেন, "প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াই প্রণয় সংস্থাপন! আসল মূর্ত্তি দেখিলে,————"

এতদূর বলিয়া ফেলিয়া, যেন তাঁহারা হুঁস হইল। একটু থতমত খাইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, এটা তোমার একটা বানানো কথা! যমুনা বোধ হয় আজ তোমাকে লইয়া খুব ভারি-রকমের একটা রহস্য করিয়াছে, তুমি তার জবাব দিতে না পারিয়া, এই, আজগুবি গল্প রচনা করিলে!"

স্বর্ণপ্রতিমা জ্যোৎস্না সেই ঢল ঢল মুখে, একটু মধুর হাসি হাসিয়া, স্বামীকে বলিলেন,—

"হাঁ, কবি হইলে মুখে কথা জোগায় খুব। ভগিনীর প্রণয়ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া একটা গুরুতর রহস্য করিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ চমক হওয়ায়, কথাটা উল্‌টাইয়া লইলেন। কি, কি,—'প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াই প্রণয় সংস্থাপন,—আসল মূর্ত্তি দেখিলে',—কি, কি, ভগিনী কি হইতেন? বল, বল,—ভাই-বোনে রসিকতাটা খুলিবে ভাল। কবি হ'লে এমনি অসামাস হয় বটে।"

পৃথ্বীরাজ হারি মানিয়া মনে মনে কহিলেন,---

"প্রেমরাজ্যের বিধানই এইরূপ বটে। কখন প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া, কখন বা কাহারও মুখে কাহিনী শুনিয়া, আর কখন বা স্বপ্নদর্শন করিয়াও, প্রেমিক প্রেমিকা আপন আপন মনের-মানুষ নির্ণয় করেন। এমত অবস্থায়, দর্শনে ও কথোপকথনে যে, প্রেম জন্মিতে পারে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সাধারণ লোকে প্রণয়ের এ অপূর্ব্ব রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, উপহাস করিয়া থাকে মাত্র।——যমুনা এখন বয়ঃস্থা। মহারাণার অলৌকিক মহত্ত্বের কথা শুনিয়া ও অমরের সেই দেবতুল্য মূর্ত্তি দেখিয়া,—অমরের প্রতি যে, তাহার অনুরাগ জন্মিবে, ইহা আর বেশী কথা কি?' চিত্রে মানুষের বাহ্য-আকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতিরও ছাব্ উঠে। সে ছাব্ সকলে দেখিতে জানে না——আহা! ভগিনী আমার উচ্চকুলে, সর্ব্বোচ্চ পাত্রকেই পতি মনোনীত করিয়াছে।——ভগবান্ কি তাহার মনস্কাম পূর্ণ করিবে না?"

প্রকাশ্যে কহিলেন, "প্রিয়ে, আমি শীঘ্রই কৌশলে শ্বশুর মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিব।—এখন যমুনার অদৃষ্ট।"

জ্যোৎস্না। আমার অনুমান সত্য কি না, একবার দেখিবে না? এস না, যমুনার ঘরের দিকে যাই;—আমি দূর হইতে তাহার হাবভাব এবং হয়ত আরও কিছু তোমাকে দেখাইতে পারিব।

পৃথ্বীরাজ অন্তরে ইচ্ছুক হইলেও, প্রকাশ্যে এতদূর করিতে কুণ্ঠিত

হইলেন। তাঁহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল। বিশেষতঃ, ইতিপূর্ব্বে একটা বে-ফাস কথা বলিয়া ফেলিয়া স্ত্রীর নিকট তিনি বড় লজ্জিত হইয়াছেন। তাই এবার খুব হুঁসিয়ার হইয়া বলিলেন,—

"না না,—আমি আর উহা কি দেখিব? যাহা দেখিবার হয়, তুমিই দেখিও। আর মনে কর বুঝি, আমার আদৌ গাম্ভীর্য্য নাই?——খুবই আছে। তবে তোমার মুখ দেখিলে, আমি কেমন হইয়া যাই,—সেই যা কথা।"

পৃথ্বীরাজ আদরে আদারিণীর মুখচুম্বন করিলেন। আদরিণী পত্নীও স্মিতমুখে স্বামীর প্রতি স্নিগ্ধ কটাক্ষ করিলেন।
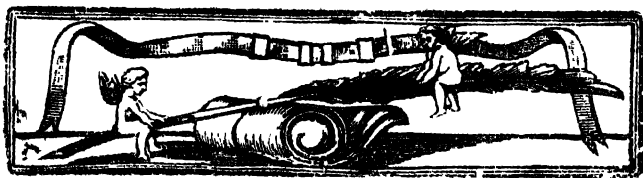
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একি! সত্য,—জ্যোৎস্না যাহা বলিয়াছে, তাহা প্রকৃত ব্যাপার! ওকি যমুনা? তোমার সেই চঞ্চল-স্বভাব এখন কোথায় গেল? সেই হরিণ-শিশুর ন্যায় ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি আর নাই যে? সেই কল্‌কল্‌ কথা, খল্‌খল্‌ হাসি, রং-তামাসা ঠাট-ঠমকের সেই তরঙ্গ-বেতর ভঙ্গি,—— আর দেখিতে পাইতেছি না যে? কোথায় তোমার সেই চঞ্চল চাহনি? কোথায় তোমার সেই পুরুষ-বেশের বাহার? আর কোথায় বা তোমার সেই সরস মানভঞ্জনের পালা? বলি, একদৃষ্টে ও দেখিতেছ কি? চোখের পলক যে আর পড়ে না! ওকি, সেই হাসি-হাসি মুখখানা, কেমন ম্লান হইয়া যাইতেছে না? আবার ওকি, ঐ ডাগর চোখ দুটা অশ্রু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল? আ মরি মরি!—আবার ঐ পরিপূর্ণ গাল দু'টি বহিয়া না দুইটি মন্দাকিনী-ধারা দেখা দিয়েছে? যমুনে, বিষাদেও তুমি এত শোভাময়ী?

হাঁ, তাই ত! পালঙ্কে অর্দ্ধ-শায়িতা অবস্থায়, নির্নিমেষ নয়নে, তুমি ও কাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছ? হাতে ধরিয়া বুঝি আশ মিটিল না,—তাই ও পবিত্র মূর্ত্তি বুকে রাখিয়া দেখিতেছ? কে ও ভাগ্যবান্? ঐ কি কুমার অমরসিংহের প্রতিমূর্ত্তি? ঐ কি তোমার প্রণয়দেবতা?

ঐ কি তোমার মনচোর ? হায় বালিকে ! কেন তুমি পতঙ্গ হইয়া আগুনে ঝাঁপ দিলে ?

জ্যোৎস্না যাহা বলিয়াছিল, তা-ই স্ফুট। যমুনা, রাণা-পরিবারের সেই আর-আর প্রতিমূর্ত্তিগুলি একরূপ মুছিয়া ফেলিয়া, কেবল অমরের মূর্ত্তিটি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে ! অমরের মূর্ত্তিটি সে একান্ত মনে দেখিতেছিল—মনের যদি একটা চোখ থাকে, তবে সেই চোখ দিয়াই দেখিতেছিল !

দেখিতেছিল—সেই মূর্ত্তিটিকে ; কিন্তু পান করিতেছিল,—তাহার রূপ-সুধাকে। বালিকা কখন মূর্ত্তিটির মুখচুম্বন করিল ; কখন মূর্ত্তিটিকে বুকে রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিল ; আবার কখন বা, সম্মুখে একটা কোন-কিছুর উপর মূর্ত্তিটাকে ঠেস দিয়া রাখিয়া, যুক্তকরে সজলনয়নে কি প্রার্থনা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে, সরলা যমুনা আপনা আপনি বলিল,—

"হায়, দরিদ্রের রত্ন-সিংহাসনে সাধ ! কি পুণ্য করিয়াছি যে, এ দেবতাকে লাভ করিব ? ঐ বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি,—উন্নত ললাট, বিশাল বক্ষঃ, আজানুলম্বিত বাহু, মহত্ত্ব-বিকসিত করুণ নয়ন,—আ মরি মরি ! এ অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধারকে কি বক্ষে ধারণ করিতে পাইব ? আমার এ রমণী-জন্মের সাধ কি মিটিবে ? না, না, কোন ভাগ্যবতী বরাননীর জন্য বিধাতা হয়ত এ পুরুষরত্নের সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমি ভিখারিণীর ন্যায় বৃথায় লোলুপ-দৃষ্টি করিতেছি !

"মহারাণা এখন সপরিবারে বনবাসী,—সুতরাং ইনিও পিতার সমভিব্যাহারী হইয়াছেন। শুনিয়াছি, ব্রত উদ্‌যাপন না হইলে, মহারাণা কোনরূপ আনন্দ-উৎসব করিবেন না,—তাই আজিও ইনি অপরিণীত আছেন। কিন্তু ব্রত উদ্‌যাপন হইলে,——তারপর ? তারপর অবশ্যই

ইনি বিবাহিত হইবেন।———একি, আমার নিশ্বাস পড়ে কেন? উঁহার বিবাহের কথায়, আমার চোখে জল আসে কেন? বুকের ভিতর এমন করিতে থাকে কেন? হায়! আমি কি ছার সামান্যা নারী,——মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্রবধূ হইবার আশায়, কত শত কুমারী প্রতিদিন শিবপূজা করিতেছে! কত পিতা মাতা ভ্রাতা, ঐ অতুলনীয় পাত্রে সম্বন্ধ স্থির করিবে বলিয়া, আশ্বাসিত হইয়া রহিয়াছে!

"তবে আর আমি কেন বৃথায় এ তুষানল বুকে বহন করিতেছি? দুরাশায় কেন পুড়িয়া মরিতেছি? ভুলিয়া যাই,—স্মৃতি-মূল হৃদয় হইতে উৎপাটিত করি,—স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হই।

"হা! তাও কি হয়? কাজটা কি এত সহজ? ভোলা কি মুখের কথা? মনোরাজ্যের যিনি আমার রাজা, হৃদয়ের যিনি অধীশ্বর,—জীবনের যিনি অবলম্বন,—পাইব না বলিয়া, তাঁহাকে ভুলিয়া যাইব? আমি কল্পনায় মূর্ত্তি গড়িয়া, কল্পনায় সংসার পাতিয়া, নিজে কল্পনাময়ী হইয়া, যাঁহাকে লইয়া এতদিন কাটাইলাম,—পাইলাম না বা পাইব না বলিয়া, তাঁহাকে বিস্মৃত হইব? না, আমার দ্বারা তাহা হওয়া অসম্ভব।

"আচ্ছা, প্রস্তর-খোদিত এই নির্জ্জীব মূর্ত্তি দেখার পর, আমার অদৃষ্টে কি আর কিছু হইবে না? সেই জীবনসর্ব্বস্বকে একবার দেখা,—চর্ম্মচক্ষে একবার দেখা,—প্রাণ মন সকল ইন্দ্রিয় দিয়া একবার দেখা—আমার ভাগ্যে ঘটিবে না কি? কেন, দেখে ত সকলেই। সুন্দরকে দেখিবার অধিকারে ত কেহ বঞ্চিত নয়? তবে আমিও একবার দেখিব। সেই মুখ,—যাহা দেখিলে স্বর্গের কথা মনে পড়ে,—অতীতের অনেক সুখ-স্বপ্ন হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠে,—যাহা দেখিতে দেখিতে মরিতেও সঙ্কোচ হয় না,—সেই মুখ একবার—একটিবারের জন্য দেখিব। এবং তার পর?—তার পর সেই মুখ দেখিতে দেখিতে, মনে মনে একটু কাঁদিব,—শেষ লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়া; ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে

এ দুর্ব্বহ জীবনের অবসান করিব!—হায়, আমার এ সাধও কি অপূর্ণ থাকিবে?

"কোথায় এই লোককোলাহলপূর্ণ, কৃত্রিমতাময়ী দিল্লী নগরী,—আর কোথায় সেই নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, স্বভাবসুন্দর আরাবলীর পার্ব্বত্য-প্রদেশ! আমি মোগলের এই ভোগবিলাসের রাজ্যে বসিয়া, স্বর্গের সেই অনাবিল অপরূপ শোভা সন্দর্শন করিতেছি!——হায়, যদি কোনরূপে এ সোণার পিঞ্জর একবার ভাঙ্গিতে পারি, তাহা হইলে বন-বিহঙ্গিনীর ন্যায় অনন্তশূন্যে উড়িয়া, স্বাধীনতার পবিত্র গীতি গাহিয়া, সেই স্বদেশ-প্রেমিক মহারাণার দয়া আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই!—এবং তারপর? তারপর পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার—আমার বাঞ্ছিত ধনকে তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লই।

"বউএর মুখে শুনিয়াছি, ইনিও পিতার অনেক গুণ পাইয়াছেন। স্বদেশের জন্য অশ্রুবর্ষণ,—স্বাধীনতার জন্য সকল সুখ বিসর্জ্জন,—কঠোর ব্রতপালন,—ইনিও পিতার সহিত সমানভাবে করিতেছেন। বীরত্বে শূরত্বে, উচ্চাশয়তায়,—ইনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত বংশধর। এত গুণের উপর আবার ঐ ভুবনমোহন রূপ!——আ মরি মরি! যেন জন্ম-জন্ম ঐ রূপ-রশ্মিতে পুড়িয়া মরিতে পাই।

"কিন্তু আমি এ কি ভাবিতেছি? কোথায় তিনি বনচারী, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী বীরপুরুষ,—আর কোথায় আমি এই ভোগবিলাসরতা, সর্ব্ববিধ অভ্যাসী-অধীনা, ক্ষীণপ্রাণা, অবরুদ্ধা রমণী!—স্বর্গমর্ত্ত্যব্যবধান। কিন্তু ব্যবধান স্বর্গ মর্ত্ত্য হইলেও, আকাঙ্ক্ষার ত ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই? হায়, এখন আর আমি আমাতে নাই,—প্রবৃত্তি-স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছি! আমার জীবন-যৌবন সকলই কুমারের চরণে অর্পণ করিয়াছি। এ জন্মে আমি আর কাহারও হইব না। বিধাতা সেই বাঞ্ছিত-ধনকে মিলাইয়া দেন, ভালই,—নচেৎ আমি আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া,

মনে মনে তাঁহাকে ভজনা করিব। মিলন বা দর্শন,—ভাগ্যে না ঘটে, অদৃশ্য দেবতার ন্যায় আমি চিরদিন তাঁহাকে মনে মনে বন্দনা করিয়া প্রেমপূজা সাঙ্গ করিব!——হা হতভাগ্য মোগল!"

দূর হইতে জ্যোৎস্না সাশ্রুনয়নে এই করুণ-দৃশ্য দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণও কাঁদিয়া উঠিল। তিনিও মর্ম্মাহত অন্তরে যমুনার মুখের শেষ কথাটি লইয়া, মনে মনে বলিলেন,—

"হা হতভাগ্য মোগল! আজ যদি তুমি না বাদ সাধিতে? স্বামীকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ বলিয়াই না আমাদের এই দশা? নহিলে কি উপযুক্ত পাত্র অভাবে, যমুনা আজিও অবিবাহিতা থাকে?—আমার ভ্রাতা অমরের সহিত বিবাহ হওয়া কি, আজ তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়?"

তার পর মনে মনে বলিলেন, "ভগিনি! তোমার প্রাণের সকল কথাই আজ আমি শুনিলাম,—প্রাণপণে আমি তোমার জন্য চেষ্টা করিব।—যাহাতে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হয়, আমি বিধিমতে তাহার উপায় দেখিব। থাক্, আজ আর কোন কথা বলিব না,—ইহা রহস্যের সময় নয়।"

রাত্রে শয়নকালে, জ্যোৎস্না স্বামীকে সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া পৃথ্বীরাজ বড় চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। আকাশ-পাতাল ভাবিতে তাঁহার রাত পোহাইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রাতে তিনি যমুনাকে ডাকিলেন। বলিলেন, "ভগিনি! পূর্ব্ব-জন্মের দুষ্কৃতিফলে, আমি ইহজীবনের স্বাধীনতাসুখ হারাইয়াছি। লৌহশৃঙ্খলে-আবদ্ধ সিংহের ন্যায় আমার সকল বীর্য্য লোপ পাইয়াছে। আমার দুরদৃষ্টের সহিত তোমারও অদৃষ্ট-সূত্র গ্রথিত হইয়াছে। শৈশবেই তুমি পিতামাতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছ;—আমি অক্ষম ভ্রাতা—আমিও তোমায় সুখী করিতে পারিলাম না।"

অপরাধীর ন্যায় যমুনা সন্দেহাকুলচিত্তে বলিল, "দাদা, এতদিন পরে আজ একথা কেন? আমার জন্য সহসা আপনি কি মনঃকষ্ট পাইলেন,—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

মনে মনে কহিল, "আমার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ কি কেহ জানিতে পারিয়াছে? যে মনাগ্নিতে আমি অহরহ পুড়িতেছি, বউ কি তাহা জানিতে পারিয়া, দাদাকে বলিয়া দিয়াছে? না, বাহিরে ত আমি খুব আমোদপ্রিয়া ও ক্রীড়াশীলা! মনের ভাব কি তবে মুখে প্রতিভাত হইয়াছে? আর ব্যথার ব্যথী—অন্তর্দর্শী দাদা আমার, কি তাহা জানিতে পারিয়া, চিন্তাকুল হইয়াছেন?"

পৃথ্বীরাজ উত্তর করিলেন,—

"যমুনে, মনঃকষ্টের কারণ একটা নয়। হঠাৎ যে, এ কষ্ট আজ হইয়াছে, তাও নয়। ভগিনি, তুমি বালিকা,—তুমি জান না,—রাজপুত-জাতি স্বাধীনতা হারাইলে, কিরূপ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় দিন অতিবাহিত করে! চক্ষের উপর দেখিতেছি, পাপ মোগল মিবারের সর্ব্বনাশ করিতেছে,—কৌশলে ও প্রলোভনে রাজপুত জাতিকে হস্তের ক্রীড়নক করিয়া তুলিয়াছে,—একে একে সকল রাজপুতই জাতীয় ধর্ম্মে, আভিজাত্যে ও বংশমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিতেছে,——আর আমি কবি ও স্বদেশবৎসল বীর,—আমি লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া, নীরবে তাহা সহ্য করিতেছি! কোথায় আমার কবিতার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে সহস্র সহস্র রাজপুত মাতিয়া উঠিবে,—কোথায় আমি সকলের আদর্শস্থানীয় হইয়া, সর্ব্বাগ্রে মোগল বিরুদ্ধে অসি উত্তোলিত করিব,—না, অদৃষ্টদোষে, সেই আমিই আজ মোগলের অনুগ্রহাস্পদ হইয়া বাঁচিয়া আছি! ভগিনি, এ সব মনে করিলে বুক ফাটিয়া যায়, মস্তক ঘুরিতে থাকে,—চক্ষে অন্ধকার দেখি।——তাই বলিতেছিলাম, মনঃকষ্ট একটা নয়,—এবং হঠাৎ যে ইহা হইয়াছে, তাহাও নয়।"

অদূরে জ্যোৎস্না দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বামীর মুখের কথাগুলি তিনি একাগ্রমনে শুনিতেছিলেন। পৃথ্বীরাজ স্ত্রীকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। জ্যোৎস্না স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পৃথ্বীরাজ পুনরায় যমুনাকে বলিলেন,—

"তারপর তোমার বিষয়।———দেখ, এখন আর লজ্জা বা সঙ্কোচের সময় নাই। তুমি আর কিছু লুকাইও না। ভগিনি! তোমার উচ্চসঙ্কল্প ও মনোনয়নের বিষয় অবগত হইয়া, আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি।——ওকি, চলিয়া যাইও না। যাহা বলি, মন দিয়া শুন।"

সেই চঞ্চলা যমুনা,—লজ্জায় যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল, চোখ দু'টি ছল ছল করিতে লাগিল, বুক কাঁপিয়া উঠিল।

বালিকা, মনে মনে ভ্রাতৃজায়া জ্যোৎস্নার মুণ্ডপাত করিয়া মনে মনেই বলিল, "আচ্ছা, এর ফল তোলা রহিল!"

জ্যোৎস্না গিয়া লজ্জাবনতমুখী যমুনার গলদেশ বেষ্টন করিয়া দাড়াইলেন। তখন যমুনা যেন একটু নিষ্কৃতি পাইয়া, জ্যোৎস্নার বুকে মাথা রাখিয়া, ভূমিপানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু যমুনা কি দুষ্ট দেখ গা! যাহাকে আশ্রয় করিয়া দাড়াইয়াছে, তাহাকেই নষ্টামি করিয়া কষ্ট দিতেছ!—ঐ দেখ, দুষ্ট যমুনা, চুপে চুপে জ্যোৎস্নার পশ্চাদ্দিকে হাতটি লইয়া গিয়া, জ্যোৎস্নার কোমল অঙ্গে ধীরে ধীরে দুইটি চিম্‌টী কাটিল। স্নেহময়ী জ্যোৎস্না যমুনাকে কিছু বলিলেন না। মনে মনে কহিলেন, "আহা, বালিকা! চঞ্চলতা এখনও ষোল আনাই আছে।"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন, "যমুনা, প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ হয়, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা কামনা করি। কিন্তু যেস্থানে এখন আমরা আছি, এস্থানে থাকিয়া সে আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। কৌশলে তোমাকে মহারাণার নিকট পাঠাইব স্থির করিয়াছি;——তুমি সম্মত আছ?"

সে কথা আর একবার বলিতে!——যমুনার বুকের ভিতর সমুদ্র-মন্থন হইতে লাগিল।

মৌনে সম্মতিলক্ষণ বুঝিয়া, পৃথ্বীরাজ আবার বলিলেন,—

"তারপর আর এক কাজ করিতে হইবে। (চারিদিক্ চাহিয়া চুপে চুপে) দেখ, ঐই আকবর বড় চতুর ও রাজনীতিজ্ঞ। যতদিন ইঁহার হস্তে মোগল-রাজত্ব থাকিবে, ততদিন রাজপুতের আশা-ভরসা বড় কম। ভরসার মধ্যে কেবল এক ভরসা,—পুণ্যশ্লোক প্রতাপসিংহ। কেবল তিনিই আজিও উন্নত মস্তকে—সমুদ্রবক্ষে উন্নত গিরির ন্যায়—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন। যমুনে, তোমাকে তাঁহার এই মহাব্রতের সহায় হইতে হইবে। তবেই তুমি আমার প্রকৃত ভগিনীর কাজ করিবে,—

তবেই আমি এ পরাধীন জীবনেও কতকটা সান্ত্বনা পাইব। যখন মহারাণা বড় দুঃখে কাতরপ্রাণ হইয়া কাহারও সান্ত্বনা-বাণী পাইবার আশা করিতেছেন বুঝিবে,—তখন তুমি স্নেহময়ী কন্যার ন্যায় তাঁহাকে আমার এই মধুর কবিতা-গাথা শুনাইবে। যখন মোগলের দৌরাত্ম্য ও স্বজাতির বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া, তিনি অশ্রুবর্ষণ করিবেন দেখিবে, তখন তুমি মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণু-প্রতিমারূপে তাঁহাকে আশার মোহিনী বাণী শুনাইবে। যখন দারিদ্র্য ও নিরাশা মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাকে অস্থির করিতেছে জানিবে,—তখন তাঁহাকে ভগবানের নামগান শুনাইয়া প্রকৃতিস্থ করিবে। তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন, অন্ততঃ একজন রাজপুতও তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, বন্দী দশায়ও, শত্রুগৃহে বসিয়া, তাঁহার চরণে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে,—এবং আপন ভগিনীকে তাঁহার দুঃখের সমভাগিনী করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে। দেখ, প্রকৃত সহানুভূতি বড় উচ্চ জিনিস। এই সহানুভূতি প্রভাবে, অনেক অসাধ্যও সুসাধ্য হয়। মহারাণা যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, তাঁহার এই মহাব্রত-গ্রহণে আমি প্রকৃতই তাঁহার একজন ভক্ত হইয়াছি,—এবং সময় সময়—প্রসঙ্গক্রমে সম্রাট-সভায়ও তাঁহার মহত্ত্ব-কাহিনী আলোচনা করিয়া, বিধর্ম্মী যবনের হৃদয়ও বিচলিত করিতে সমর্থ হই।

জ্যোৎস্না বলিলেন, "তারপর? আসল বিষয়ের——"

পৃথ্বীরাজ স্মিতমুখে কহিলেন, "ইহাতেই আমার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মহারাণা অন্তর্দর্শী মহাপুরুষ,—তাঁহার আর কিছু বুঝিতে বাকী থাকিবে না। ইহা ব্যতীত, তাঁহাকে এবং তোমার পিতাকে স্বতন্ত্র দুইখানি পত্রও আমি লিখিব,—তাহাতে সকল বিষয় পরিষ্কার রূপে উল্লিখিত হইবে।"

পৃথ্বীরাজ পুনরায় বলিলেন,—

"তারপর, আর এক কথা! যমুনাকে এখান হইতে গোপনে পুরুষ-

বেশে যাইতে হইবে।———স্নেহময়ী ভগিনি আমার! পারিবে কি? হায়, ভ্রাতার আবাস হইতে ভগিনীকে চোরের মত পলাইতে হইবে! প্রাণ ধরিয়া এ দৃশ্যও আমায় দেখিতে হইল! যমুনে, পথ আর নাই,—তাই এ ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিব, স্থির করিয়াছি। নহিলে, মোগল সহস্র প্রকারে বাধা দিবে। পাপ মোগলের কুটিল কটাক্ষ নিয়ত তোমার প্রতি বিন্যস্ত রহিয়াছে।—পাছে তোমাকে মোগলের——হায়! কি বলিব, বুক বিদীর্ণ হয়,—ভগবন্, ক্ষত্রিয়রক্তের পরিণাম শেষে এই হইল!——পাছে তোমাকে মোগলের বাঁদী হইতে হয়,—পাছে নীচাশয় রাজপুত কুলাঙ্গারগণ আপনাদের ন্যায় আমার এই শেষ-সৌভাগ্যটুকুও ঘুচাইয়া দেয়,—পাছে স্বয়ং সম্রাটও এই কার্য্যের জন্য তাঁহার সূক্ষ্ম রাজনৈতিক জাল বিস্তার করেন—এই আশঙ্কায়, আমি এই কঠিন—কষ্টকর কার্য্যে স্থিরচিত্ত হইয়াছি। ভগিনি! সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি মনোমত পতি লাভ করিয়া,—মহারাণার পুত্রবধূ হইয়া, তাঁহার পরিবারে শান্তিদায়িনী দেবীরূপে বিরাজ কর।——পিতৃপুরুষের নাম,—পৃথ্বীরাজের এই ভাবপ্রবণ জীবনের অনুষ্ঠান,—যেন তাহাতে আরও গৌরবান্বিত হয়। আমার পরম সৌভাগ্য যে, সম্রাট নিজে, এ বিষয়ে আমাকে অনুগৃহীত করিতে, আজিও চেষ্টা পান নাই। কিন্তু কাল যেরূপ বিষম পড়িয়াছে, তাহাতে সকলই সম্ভবে। এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া, আমি তোমাকে গোপনে, ছদ্মবেশে সুদূর আরাবলীর সেই পর্ব্বতময়প্রদেশে পাঠাইতে স্থির করিয়াছি।—অবসর ও সুযোগ পাইলেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিব। খুব সাবধানে থাকিও,—ঘুণাক্ষরেও যেন একথা কেহ জানিতে না পারে।”

পৃথ্বীরাজ প্রস্থান করিলেন।

যমুনা দাদার কথায় কোন উত্তর দিতে না পারিয়া, এতক্ষণের পর যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার শাপে বর হইল ভাবিয়া, সে মনে

মনে সুখী হইল। তবে স্নেহময় ভাইকে—স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়াকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া, দুঃখিতও হইল। এই সুখদুঃখের মাত্রা, বুদ্ধিমতী পাঠিকাই নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিবেন। এ পক্ষে আমাদের কোন কথা না কওয়াই ভাল। তবে অনেকরূপ রঙ্গ-রহস্য ও তর্ক-আলোচনার পর, জ্যোৎস্নাকে যমুনা একদিন বলিয়াছিল,—"প্রাণ বড় না প্রেম বড ?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দিল্লী নগরীতে আজ মহা মহোৎসব। আজ 'নরোজা' উৎসব! আজ দিল্লীশ্বরের 'খোসরোজ' বা 'আনন্দ-বাসর'। আজ 'নবম বাসরীয়' মহিলা-মেলা। আজ নববর্ষের নূতন আমোদ। আজ আকবরের সখের বাজার ও সৌন্দর্য্যের হাট। আজ সতীর সতীত্ব ক্রয়-বিক্রয়ের দিন। আজ রাজপুতের মৃত্যু অপেক্ষাও মর্ম্মপীড়ক দিন।——ওহো! সেই দিনের কথা, আজ এই অধম লেখককে বলিতে হইবে।

জগৎ-জোড়া যাঁর নাম,—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া, যিনি হিন্দু-মুসলমানের নিকট সমান শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন,—সত্যের অনুরোধে, আজ তাঁহার কলঙ্ক-কালিমা এই কাব্যচিত্রে ঢালিতে হইল। এ কলঙ্ক দুরপনেয়,—তাই উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। আলোকের পার্শ্বে ছায়া দিয়া যেমন চিত্র সম্পূর্ণ করিতে হয়,—পুণ্যশ্লোক দরিদ্র প্রতাপের পার্শ্বে, তেমনি রাজরাজেশ্বর মোগল-সম্রাটের সেই "নরোজা" কাহিনীটী বর্ণন করিয়া, আমরা এই কাব্য-গ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষা করিব। আকবর-ভক্ত পাঠক-পাঠিকা, লেখকের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

আবুলফজল মহাশয় "নরোজা" শব্দের অর্থটা কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে কৌশলে, আকবরের এই দুরপনেয় কলঙ্কটি ক্ষালন

করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু মিথ্যার আবরণে সত্যকে চাপা দিতে গিয়া, সত্যকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া ফেলিয়াছেন। আবুলফজল বলেন, প্রতি মাসের প্রধান উৎসবের পরবর্ত্তী নবম দিনে 'নরোজা' বা 'নও-রোজ' আরব্ধ হইত,—নববর্ষের দিন নহে। সেই 'নও-রোজের' দিন সকল মুসলমানই আমোদ-আহ্লাদ করিত।—তা যাউক, ঐ ঐতিহাসিক দিন-নির্ঘণ্ট; ঐতিহাসিকগণই এ সূক্ষ্ম কালনির্ণয় করিবেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় কথাটি আমরা কিছুতেই মানিতে পারি না। আবুলফজল মহাশয় বলেন, সেদিন সম্রাট যে, একটি মহিলা-মেলা বসাইতেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, রাজ্যের মুসলমান বণিক-বনিতাগণ সেই মেলায় সমবেত হইত, আর বেগমগণ নিজে নিজে সখ্ করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন। তবে সম্রাট যে ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত থাকিতেন, তাহার একমাত্র কারণ,—রাজনৈতিক বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতালাভের ইচ্ছা। অর্থাৎ রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা, প্রজাসাধারণের মনের ভাব, রাজ-কর্ম্মচারিগণের কার্য্য-প্রণালী এবং পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য ও উৎপত্তি বিবরণাদি অবগত হওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য,—অন্য কোনরূপ কুভাব তাঁহার মনে স্থান পাইত না।

আবুলফজল মহাশয় কবি হউন, আর ঐতিহাসিকই হউন,—আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তিনি মুসলমান, আকবরের অনুগৃহীত,—রাজ-সভায় "রাজ-কবি" বলিয়া সম্মানিত;—তাঁহার এই মন্তব্য তাঁহারই যোগ্য হইয়াছে;—আমরা কিন্তু এই মত দিতে পারিলাম না।

ভট্ট-কবিগণ কি তবে সকলেই মিথ্যাবাদী? বীর-কবি পৃথ্বীরাজ অবধি কি তবে মিথ্যা কহিয়াছেন? না, এ কথা মানিতে আমরা প্রস্তুত নই,—ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

আর, তর্কের খাতিরে, আবুলফজল মহাশয়ের ঐ কথা হইতেও, দিল্লীশ্বরের দুর্নীতি প্রতিপন্ন করা যায়। সহস্র সৎ উদ্দেশ্য থাকুক,—তিনি পুরুষ হইয়া ছদ্মবেশে রমণী-সমাজে যান কি বলিয়া? মহিলা-মেলাটি ত,

কেবল তাঁহার আত্মপরিবার লইয়া নহে,—তাহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান রমণী এবং আকবরের বশ্য অনেক সম্ভ্রান্ত রাজপুত রমণীও যোগদান করিয়া থাকেন।—রাজা হইয়া, ছদ্মবেশে—চোরের মত, তোমার সেখানে যাওয়া কেন বাপু? রাজ্যের অবস্থা ও গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবে? মিথ্যা কথা। ইচ্ছা করিলে অন্য সহস্র উপায়ে তুমি তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতে। আর, এই মহিলা মেলাটিও কিছু, ঐ উদ্দেশ্যসাধনের তেমন প্রকৃষ্ট পন্থাও নয়।

তা আসল কথাটা কি জান,—'পরকীয়া আস্বাদনের' প্রবৃত্তিটা—দিল্লীশ্বরের পূর্ণমাত্রায় ছিল। তবে তিনি চতুর ও বুদ্ধিমান্,—তাই একটা মেলার ঠাট্ বানাইয়া, মূর্খ লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া, নাম কেনার সহিত, গুপ্ত-অভিসন্ধিটাও সিদ্ধ করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িয়াছে। দুর্ব্বল হরিণী শিকার করিতে করিতে, আজ তিনি সিংহীর মুখে পড়িয়াছেন। পাপের বিধানই এইরূপ। সেই কথাটি বলিবার জন্যই আমাদের এই অবতরণিকা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রকাণ্ড এক সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে, রূপের হাট ও সৌন্দর্য্যের মেলা বসিয়াছে। এ সৌন্দর্য্য ও রূপ,—কবি-কল্পনা নহে, পটে-আঁকা ছবি নহে, কিংবা কেবলই অন্তরে উপলব্ধি করিবার জিনিস নহে,——প্রত্যক্ষ, বাস্তব, জীবন্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,—দর্শন ও স্পর্শনের বিষয়ীভূত।

ওঃ! ওদিক্‌টায় আর চাওয়া যায় না,—চোখ্‌ যে ঝলসিয়া গেল! এদিকেও যে, দেখি তাই। ওদিকে,——ঐ ওদিকে,—ঈস্‌! সর্ব্বত্রই যে দেখি একরূপ। একি,——সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে,——সর্ব্বত্রই যে পরিপূর্ণ,——কোন দিক্‌ যে শূন্য দেখি না! যুবতী, প্রৌঢ়া, কিশোরী, বালিকা,——এ যে দেখিতেছি, সত্য সত্যই রমণী-রাজ্য! ষোড়শী, অষ্টাদশী, চতুর্দ্দশী, বিংশী,—সকল সুন্দরীরই যে সমাবেশ দেখিতেছি। এই রাজ্যে আসিয়া, রক্তমাংসের শরীর দিল্লীশ্বর, নির্ব্বিকার-চিত্তে, রাজ্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন?

ও হরি! মুনিরও যাহাতে মন টলে, পরমহংস-যতিরও যাহাতে চিত্ত-বিকৃতি হয়, সংযমী-সাধুরও যাহাতে পতন ঘটে, সেই সুখ-সরস মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে,—নীরস রাজনৈতিক সমস্যা অবধারিত হইবে? হারি মানিলাম ভাই,—তোমারই জয় হউক!

জয় হয় হোক্,—কিন্তু আসল কথাটা ভাই, তোমায় শুনিতে হইতেছে।

প্রকাণ্ড এক সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে, মোহিনী-মেলা বসিয়াছে। কবিগণ একটি মোহিনী মূর্ত্তি বর্ণন করিতে;—কত আয়াস, কত যত্ন, কত-কি করিয়া থাকেন;—কত খুঁটানাটী লইয়া, কত রং ফলাইয়া, কত লিপি-চাতুর্য্য দেখাইয়া, তবে প্রস্তাবিত চিত্রটি মোটামুটি শেষ করেন;—আর আমি অকৃতী ক্ষুদ্র লেখক,——বর্ণনার সে শক্তি নাই, ভাষার সে তেজ নাই, বলিবার সে ভঙ্গি নাই, রং ফলাইবার সে ক্ষমতা নাই,—আমি কি লইয়া, সেই শত সহস্র বরাননী, বিম্বাধরী, কম্বুকণ্ঠি, প্রস্ফুটিত ফুল্ল শতদলের শোভা বর্ণন করিব? পাঠিকা সুন্দরী, সম্মুখস্থ স্বচ্ছদর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্বটি দেখুন;—আর পাঠক মহাশয়, যাঁহাকে মনে মনে বড় ভালবাসেন, তাঁহার রূপটি ধ্যান করুন। ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থায়, মোহিনী-মেলার মোহিনী-দিগের রূপবর্ণনা করিবার সামর্থ্য,—এ ক্ষুদ্র লেখকের নাই।

লাল, নীল, শ্বেত, পীত নানাবর্ণের সূক্ষ্ম বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া,—কিঙ্কিনী নূপুরের মধুর শব্দ করিয়া,—গলে গজমতি হার দোলাইয়া,—নিতম্বে মেখলা পরিয়া, অধরে হাসি ও হৃদয়ে স্বপ্ন লইয়া,—ধীর-মন্থর-গতিতে, রাজপুত যুবতীবৃন্দ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। সুন্দরীগণের অঙ্গের বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ও আভাযুক্ত যে, শরীরের সর্ব্বল লাবণ্য, যেন তাহাতে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সে কাঁচা সোণার রং,—লাল, নীল, শ্বেত, পীত আভায় পড়িয়া, দ্বিগুণ শোভায় পরিণত হইয়াছে। আবার সেই সোণার অঙ্গ হইতে আতর গোলাপের সৌরভ চারিদিক ভরপুর করিতেছে। সুবাসিত তাম্বুলরাগরঞ্জিত অধর, সুসজ্জিত সুগন্ধযুক্ত কেশদাম, মদনের ক্রীড়াকুঞ্জ, স্বরূপ উন্নত বক্ষঃ, চঞ্চল কটাক্ষ, মধুর মুখশ্রী——যেন রাশিকৃত সোণার কমলিনী 'নরোজা'-সরোবরে প্রস্ফুটিত। এই সরোবর-সম্মুখে আসিয়া, ছদ্মবেশী মোগলসম্রাট নাকি নির্ব্বিকারচিত্তে রাজ্যের প্রতিনিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন!

আবার ওদিকে দেখ,—রূপবতী সাহজী,—আমীর-উজীর-পত্নী, বেগম, বেগম-কন্যা,——বহুমূল্য সাটিন-কিংখাপ-মখমল-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া,—মণি-মুক্তাখচিত কারুকার্য্যনির্ম্মিত সূক্ষ্ম মখমল ওড়না গায়ে দিয়া, বিলম্বিত বেণী দোলাইয়া,—হীরকমাণিক্যে ভূষিত হইয়া,—উচ্চ মধুর হাস্যে পরস্পর রঙ্গরসে মত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের মত তীক্ষ্ণ রূপ-রশ্মি,—তদুপরি সেই উজ্জ্বল পরিচ্ছদ,—চক্ষু ঝলসিয়া দেয়। পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, দুধে-আলতা রং, পীনোন্নত পয়োধর, উদ্দীপ্ত রূপশ্রী,———ওঃ! দেহের সর্ব্বাঙ্গ হইতে রূপ যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে! সে তীব্র কটাক্ষ, চঞ্চল চাহনি, মত্ততাপূর্ণ হাবভাব-বিলাস-ভঙ্গি,——প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। কণ্ঠস্বরে, কথোপকথনে, আনন্দ-অশ্রুতে,—রূপ পূর্ণরূপে প্রকটিত। আমোদ করিতে করিতে, একে অন্যের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে,——সোহাগ করিতে করিতে একজন আর একজনের গায়ে পিচকারী করিয়া গোলাপজল দিতেছে,——কাহারও বা সর্ব্বাঙ্গ তাহাতে আর্দ্র হইতেছে,——কেহ বা ফুলের তোড়া ছুড়িয়া কাহাকে মারিতেছে,——কেহ বা ফুলের বিছানায় শুইয়া গড়াগড়ি দিতেছে,——সর্ব্বত্রই এইরূপ বিলাস-তরঙ্গ। বাঁদীগণ মুহুর্মুহু গোলাপ-আতরের কার্ব্বা-ভাঙ্গিয়া, মোগল-সুন্দরীগণের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। স্বর্ণ-সম্পুটে-রক্ষিত সুগন্ধ মসলাযুক্ত তাম্বুল লইয়া, কেহ বা তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে। সে বিলাসিনী মোগল-রমণীগণের বিলাস-লীলা ও হাবভাব অঙ্গভঙ্গি,—বর্ণনাতীত। স্বভাবের শোভার সহিত কৃত্রিম শোভার মিলন।—সত্যই যেন একটা সজীব রূপের হাট বসিয়াছে।——এই হাটে নাকি দিল্লীশ্বর রাজনৈতিক পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে আসিয়াছেন!

যে স্থানে এই মেলা বসিয়াছে, তাহার চারিদিক্ উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। খুব ফর্দা একটা জায়গায় আসর হইয়াছে। উপরে চন্দ্রাতপ আচ্ছাদিত, নিম্নে গালিচা-বিছানো মখমল-মণ্ডিত আসন। ফুলের ঝাড়, ফুলের তোড়া,

ফুলের মালা চারিদিকে সুশোভিত। মধ্যে মধ্যে বাদসাহ ও বেগমদিগের প্রতিকৃতি সজ্জিত। আশে পাশে চতুর্দ্দিকে স্বচ্ছদর্পণ শোভা পাইতেছে। সুন্দরীগণ মধ্যে মধ্যে সেই অমল ধবল উজ্জ্বল মুকুরে মুখ দেখিয়া, আপন রূপে আপনি গর্ব্বিত হইতেছেন। কোথাও গদি-আঁটা কাষ্ঠাসন, কোথাও মার্‌বেল পাথরের আসন, কোথাও বা দুই একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্ক,——সুন্দরীগণের বিশ্রামের জন্য রক্ষিত হইয়াছে। ফুলদান, গোলাপদান, আতরদান,——ইহাও যথানিয়মে সজ্জিত রহিয়াছে। কোথাও বা স্ফটিক-পাত্রে সুরা সুশোভিত। কোন মোগলিনী সুধাবোধে তাহা পান করিতেছে এবং আপন উন্মত্তযৌবনে আরও উন্মাদিনী শক্তি আনিতেছে। একস্থানে প্রস্তরপাত্রে এবং কাচপাত্রে নানাবিধ সুস্বাদু ফলমূল, মিষ্টান্ন ও শীতল পানীয়-জল রহিয়াছে। আদর করিয়া কেহ কাহাকে মিষ্ট-মুখ করাইতেছে,—একজন আর একজনকে আপ্যায়িত করিতেছে। কোথাও নর্ত্তকীদল মধুর নৃত্য-গীত করিতেছে,——কোথাও বা পঞ্চমতানে বাইজীর গান হইতেছে। কোথাও বা শুধু সারেঙ্গ ও সেতার বাদিত হইতেছে। ঝিঁঝিঁট, খাম্বাজ, আশোয়ারী, টোড়ী,—এই সব রাগিনী আলাপ হইতেছে। সুন্দরী শ্রোতা, সুন্দরী গায়িকা, সুন্দরী বাদিকা,—সুন্দরীই সব। এই সৌন্দর্য্যের বাসরে কেবল একমাত্র পুরুষ,—আকবর বাদসাহ। তাঁহার এই আনন্দ-আসরে লুকাইয়া অসিবার কারণ নাকি,——প্রজাসাধারণের মনের ভাব অবগত হওয়া!

মোগল-রমণীগণ আজ রাজপুত-রমণীগণের সহিত,——হলাহলা গলাগলা করিয়া মিশিতেছেন। আজ তাঁহাদের এক-গলা ভাব। কত কথা, কত বার্ত্তা, কত হাসি, কত গল্প, কত কি আজ হইতেছে! কাহার স্বামী কত রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, যোদ্ধা, বীর,—কার কত ধনদৌলত-ঐশ্বর্য্য,———সেই সব কথা আজ কত রকমে ব্যাখ্যাত হই-তেছে। মধ্যে সম্রাটেরও গুণগান না হইতেছে, এমন নয়। মোগলরমণী-

গণ আজ রাজপুত রমণীর গলা জড়াইয়া বেড়াইতেছেন,—মুখচুম্বন করিতেছেন,—তাঁহাদের সহিত সখিত্ব, বন্ধুত্ব, করিতেছেন,—কুটুম্বিতা পাতাইতেছেন,—ভাবের ফোয়ারা ছুটাইতেছেন। হুড়াহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, হাসির গর্রা,—এ সকলেরও অপ্রতুল ছিল না। পিচকারী করিয়া গোলাপজল গায়ে-দেওয়া, কাহাকে বা পুরুষ সাজাইয়া আমোদ করা, কাহারও বা সখের ভিখারিণী সাজা,——ইহাও চলিতে লাগিল। গোলাপ-জলে সিক্তবসনা কোন সুন্দরীর শোভা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। সব সুন্দর, সব শোভাময়। তর-তর-তর রূপের তরঙ্গে 'নরোজা'-নদী উপচিয়া উঠিল। সেই নদীর কিনারায় দাঁড়াইয়া, "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" নাকি, রাজ্যের স্থায়িত্ব চিন্তা করিতেছেন!

আবার এদিকে দেখ,—চারিপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ পণ্য বীথিকা। টুপি, মোজা, ঘাঘরা, ওড়্না, বাসন, খেল্না,—কত কি সাজান রহিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান বণিক-বনিতাগণ কত মূল্যবান্ বস্ত্রাদি আনিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া, মহিলা-মেলায় আজ তাহারা দ্বিগুণ—ত্রিগুণ দরে আপন আপন দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। রাজপুত ও মোগল-রমণীগণ আপন আপন পছন্দমত সেই সব দ্রব্য ক্রয় করিলেন। আগামী বৎসরে আনিবার জন্য, তাহাদিগকে কোন কোন জিনিসের ফরমাইসও দিলেন। এখানেও সুন্দরীর ভিড় কম নয়—ক্রেতাও সুন্দরী, বিক্রেতাও সুন্দরী। সুন্দরের মধ্যে যা,—মোগলকুল-তিলক আকবর! তা তিনি নাকি ঐ প্রচ্ছন্নবেশে থাকিয়া, রাজ্যের অভাব-অভিযোগ অবগত হইতেছেন!

মাথা করিতেছেন! আপন জগৎ-জোড়া নামে দুরপনেয় কলঙ্ক অর্পণ করিতেছেন! আকণ্ঠ ভরিয়া রূপ-সুধা পান করিতেছেন! সতীর সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা করিতেছেন! কাম-কলুষিত-দেহে জর-জর হইতেছেন!—— সেই রূপের হাটে কাহাকে মনোনীত করিয়া, তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

হায়! কে সেই লোকললামভূতা সুন্দরী? কে সেই সৌন্দর্য্যময়ী শোভারাণী? কে সেই মোহিনী-প্রতিমা? কে সেই বরাননী পর-রমণী?

তিনি হিন্দু না মুসলমান? সতী না কলঙ্কিনী? পুণ্য-প্রতিমা না পিশাচিনী?

তিনি যেই হউন, আজি তাঁহার পুণ্য-কাহিনী লিখিয়া, এই অধম লেখক কৃতার্থ হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মেলার আসরে হিন্দু মুসলমান, প্রায় সকল রমণীই যথেষ্ট আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিলেন ;—কেবল একটি রমণী কিছু বিষণ্ণভাবে গম্ভীর হইয়া, একখানি আসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, তথাপি তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখাইতেছে। তাঁহার কাছে কেহ আসিতেছে না,—তথাপি তিনি আপন মনে সাম্রাজ্ঞীর ন্যায় উচ্চ চিন্তায় নিরত রহিয়াছেন। তিনি কিছুতে মিশিতেছেন না—তথাপি সকল আনন্দই যেন তাঁহার মন আকর্ষণের চেষ্টা পাইতেছে। সেই জনতা-কোলাহলের মধ্যে, করলগ্ন-কপোলে, কেবল তিনি আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছেন। আর সকলে ভিড় বাড়াইতেছে মাত্র। তিনি রমণীরত্ন।

আনন্দ-স্রোত একটু মন্দীভূত হইলে, বাদসাহের এক কন্যা আসিয়া তাঁহার কাছ-ঘেঁসিয়া বসিলেন। বলিলেন,—

"ভাই! আজিকার এই আনন্দের দিনে, তুমি এমন বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছ কেন?

এতক্ষণে যেন সুন্দরীর চমক ভাঙ্গিল। লজ্জিতভাবে বলিলেন,

"না, আমি এখানে বসিয়াই উৎসবের সকল আনন্দই উপভোগ করিয়াছি।"

"কৈ, আমি ত বরাবর দেখিতেছি, তুমি এই ভাবে বসিয়া আছ!—এরূপ বিষণ্ণভাবে থাকিবার কারণ; আমায় বলিবে?"

"সাহাজাদীর এই অনুগ্রহ-প্রশ্নে আমি বিশেষ বাধিত হইলাম।—কৈ, না, আমি ত বেশ প্রফুল্লভাবেই আছি।"

সুন্দরীর অধরে হাসির রেখা দিল; নয়নকোণে কিন্তু এক বিন্দু জল আসিল।

"না ভাই, তুমি কারণটা ভাঙ্গিলে না!—আমি বলিব, তোমার মনোব্যথা কি?"

সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "কি?"

"হিন্দু-মুসলমান-রমণীগণ এরূপ একসঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া আমোদ করে,—ইহা তুমি পছন্দ কর না!—কেমন, না?"

গাম্ভীর্য্যময়ী রমণী এবারও একটু হাসিলেন, বলিলেন,—

"না, তা কেন? রাজপুত রমণীগণ ত এখন আপনাদের সখি ও কুটুম্বিনীর মধ্যে গণ্য!"

"মুখে ত ইহা বলিলে, কিন্তু তোমার অন্তরে কি এই ভাব আছে?—না,—নিশ্চয়ই না। দেখ, বাদসাহের কন্যা হইয়া অবশ্য একটু উচ্চ বুদ্ধি ধরি!"

যুবতী এবার আর কোন কথা কহিলেন না,—জোরে একটু নিশ্বাস ফেলিলেন।

বাদসাহ-পুত্রী বলিতে লাগিলেন,—

"তুমি পৃথ্বীরাজের সহধর্ম্মিণী;—সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে তোমার প্রবৃত্তি যে উচ্চ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি!—রাজপুতরমণীগণ যে, আমাদের সহিত এইরূপ মিশিতেছে,—ইহা তোমার কষ্টের কারণ।—কেমন, না? গোপন করিলে আর কি হইবে ভাই? তোমার ঐ দীর্ঘশ্বাস ও চক্ষের দৃষ্টিই, তোমার মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু তাও বলি,

এখন আর তোমাদের মনে মনে এরকম মানের কান্না কাঁদা সাজে না,—আপনাদের অবস্থা ভাবিয়া দেখ!”

সুন্দরী এবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একবার মনে করিলেন, নিরুত্তরে তথা হইতে অন্যত্র গিয়া বসিবেন। কিন্তু অভিমানের বেগটা রোধ করিতে পারিলেন না। গ্রীবা বাঁকাইয়া, চক্ষের দৃষ্টি স্থির করিয়া, একটু দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—

“অবস্থা ভাবিয়া দেখিব কিরূপ?”

বাদসাহ-পুত্রী। না, আর কিছু নয়,—তোমার স্বামী এখন আমার পিতার আশ্রিত,—ইহা যেন স্মরণ থাকে।

শিরায় শিরায় অতি দ্রুতগতিতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া, সেই তেজস্বিনী আর্য্যরমণীর মুখখানি লাল করিয়া তুলিল। চক্ষের দৃষ্টি আরও স্থির হইল। সহসা সর্ব্বশরীরের উপর দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ চলিয়া গেল। অদূরে যবনিকা-অন্তরালে, এক কামোন্মত্ত পিশাচ, সে শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। দৈবগতিকে, সেই মর্ম্মাহত রমণীও, এই সময়ে সেই কামোন্মত্ত পশুকে, চকিতের ন্যায় একবার দেখিলেন। পাপমূর্ত্তিকে একবার দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল।

একটু স্তব্ধ থাকিয়া, রমণী ধীরগম্ভীরভাবে বলিলেন, “সাহজাদি! অবস্থা কাহারও চিরদিন সমভাবে থাকে না। আজ রাজা, কাল পথের কাঙাল,——ইহাই জগতের রীতি। অবস্থার তুলনা দিয়া, আর এক-জনকে মর্ম্মাহত করা, বাদসাহ-পুত্রীর কর্ত্তব্য নয়।”

“বাদসাহ-পুত্রীকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শিখাইতে যাওয়া, আশ্রিত কাফের-পত্নীর কিছুতেই শোভা পায় না!—জানি গো সুলোচনে, সব জানি। দাদার আমার দয়ার শরীর, উদার মন,——তাই তোমার বিশ্বাসঘাতক পিতাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন!”

গর্ব্বিতা, সৌভাগ্য-মদে-উন্মত্তা বাদসাহ-পুত্রী——এইরূপে অযথা সেই

আর্য্যরমণীকে মর্ম্মাহত করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। এবং সেথানে গিয়া, হীনমনা সহচরী ও বাঁদীগণকে লইয়া, সেই বিষাদে-অপূর্ব্ব-শোভাময়ী —সহিষ্ণু-প্রতিমাকে অধিকতর মর্ম্মাহত করিবার জন্ত, তাঁহার সেই ভুবনমোহন রূপের কুৎসিত সমালোচনা করিতে লাগিল। একটা কথা জ্যোৎস্নার কাণে গেল; তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, "আমাদের দাসী-বাঁদীর সামিল যারা, তাদের অত রূপ কেন? আর যদি ঐ রূপই রহিল,—তবে তাহা বাদসাহের ভোগেই বা না আসে কেন?"

পিঞ্জরাবদ্ধা সিংহী যেমন আপন মনে গর্জ্জিতে থাকে,—সোণার জ্যোৎস্না সেইরূপ অন্তরে গর্জ্জিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, উপায় নাই। সত্যই তাঁহাদের কপাল পুড়িয়াছে।

কাহাকে কিছু না বলিয়া, আর কোন দিকে না চাহিয়া, তিনি আপন পরিচারিকাকে, সত্বর শিবিকা আনিতে বলিলেন।

পরিচারিকা প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জ্যোৎস্না কি তবে সাধ করিয়া, এই পাপ-মেলায় আসিয়াছিলেন? সাধ করিয়া কি তিনি রাজপুতের চরম-অধঃপতন দেখিতে এই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন? না, তা নয়——শত্রুপুরীতে বাস,——শত্রুর আশ্রয়ে অবস্থিতি——তিনি না আসিলে পাছে স্বামীকে সম্রাটের জবাবদিহিতে পড়িতে হয়——এই ভাবিয়া, অনিচ্ছার সহিত তিনি এই পাপস্থানে আসিয়াছিলেন। অনিচ্ছার সহিত বলিয়াই, কোনরূপ বেশভূষা করেন নাই,——এবং মেলার আনন্দে যোগও দেন নাই। পৃথীরাজও নানারূপ আশঙ্কা করিয়া, পত্নীকে এখানে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত যেটুকু অপমান ও নির্য্যাতন হইয়া গেল, ইহা হইলেও বিশেষ ক্ষোভের কারণ ছিল না। কিন্তু অতঃপর যাহা ঘটিল, তাহা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

জ্যোৎস্নার পরিচারিকা ত শিবিকা আনিতে মেলার বাহিরে গেল——কিন্তু সে আজও গেল, কালও গেল,—আর ফিরিল না! এদিকে ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। সম্ভ্রান্ত মোগল ও রাজপুত-রমণীগণ একে একে আপন শিবিকায় চলিয়া গেল। ক্রমে অন্যান্য স্ত্রীলোকগণও একে একে যাইতে লাগিল। তারপর বিদেশী-বণিক-রমণীগণও একে

একে তাহাদের দোকানপাট গুটাইয়া, গৃহে ফিরিতে আরম্ভ করিল। প্রায় সন্ধ্যা হয় দেখিয়া, জ্যোৎস্না বড় উৎকণ্ঠিতা হইলেন। তাঁহার বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। কি-যেন-কি অমঙ্গল আশঙ্কা তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল। অপমানে, অভিমানে, ক্ষোভে, রোষে, দুশ্চিন্তায়,—তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি পৃথ্বীরাজকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিলেন,—

"প্রভু, আজ কেন আমার প্রাণ এমন কাঁদিয়া উঠিতেছে? তোমার চরণে কি কোন অপরাধ করিয়াছি? কৈ, তা ত মনে হয় না! একি দক্ষিণ অঙ্গ ঘন ঘন স্পন্দিত হয় কেন? নাথ, তুমিই দাসীর জীবনাশ্রয়,——যদি কোন বিপদ ঘটে, তোমার চরণ স্মরণ করিয়া, যেন সে বিপদে পরিত্রাণ পাই!———পরিচারিকা এখনও ফিরিতেছে না কেন? আমার শিবিকাই বা কোথায়?———মা সর্ব্বমঙ্গলে! আজ দাসীর মুখ রেখো।"

নিকট দিয়া এক অস্ত্রবিক্রয়িত্রী রমণী যাইতেছিল। সে বলিল, "মা, সকলে চলিয়া গেলেন, তুমি এখনও রহিয়াছ কেন মা?"

জ্যোৎস্না। আমার পাল্কী এখনও আসে নাই।——তোমার হাতে-ও গুলি কি?

অস্ত্রবিক্রেত্রী রমণী। ওমা, এ কতকগুলি ধারালো ছুরি। জান্‌তুম মা, নরোজার হাটে অনেক রাজপুতের মেয়ে আসেন,—আমার এ কয়খানা ছুরি সব বিকুবে। রাজপুতের মেয়েরা সঙ্গে অস্ত্র রাখেন শুনেছিলুম,——কিন্তু কৈ, তাহ'লে আমার একখানা ছুরিও বিকুতো না? সে দিন আর নাই মা,—সে দিন আর নাই।—হাঁ মা, তোমার ঐ ভগবতীর মত রূপ,—তুমি কি আমাদের স্বজাত মা?

জ্যোৎস্না। তুমি কি হিন্দু?

রমণী। হাঁ গো মা, হাঁ।———আর মা সে দুঃখের কথা না তোলাই

ভাল! এ পোড়া-পেটে আমি পতি-পুত্রকে খেয়েচি। এই ছ'মাস হলো, আমার আটাশে-পুত মা যমে নিয়েচে,——আর আমি হতভাগিনী বেঁচে আছি। বাছা আমার এই ছুরি গ'ড়েই সংসার চালাতো।

জ্যোৎস্না আর বেশী কিছু না বলিয়া কহিলেন,—

"হাঁ বাছা, আমরা হিন্দু। তোমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।——তা আমাকে একখানি ভাল দেখিয়া ছুরি দাও দেখি!"

"ওমা, এর সবগুলিই ভাল,———তোমার যেখানি ইচ্ছা, বাছিয়া লও।"

"এর ধার কেমন?"

"বাছার মুখে শুনেছিলুম, জোরে মারলে এতে একটা মানুষ অবধি ম'রে।"

"বটে? তা আচ্ছা, আমি একখানি লইলাম।—এই নাও।"

অস্ত্রবিক্রেত্রী রমণীর হাতে জ্যোৎস্না একটা মোহর দিলেন। তাহা দেখিয়া সেই রমণী বিস্মিত হইয়া বলিল, "ওমা, একি! এ যে একটা মোহর!"

"তা হোক,———আমি তোমাকে ইহা দিলাম।"

"সে কি মা, এ দামে যে তুমি বিশখানা ছুরি পাবে!——আর উনিশ-খানা ছুরি দেব?"

"না, আর কাজ নাই,——আমার এই একখানিই দরকার,—ও তোমাকে খাইতে দিলাম।"

মনে মনে কহিলেন, "ওঃ, এই দুঃখিনী রমণী আজ আমায় জ্ঞান দিল!—রাজপুত-রমণী হইয়া, আজ আমি সঙ্গে অস্ত্র লইয়া আসি নাই কেন?"

অস্ত্রবিক্রয়িত্রী রমণী গদগদ-কণ্ঠে কহিল, "মা গো, তুমি সত্যই আমার অন্নপূর্ণা মা! নারায়ণ তোমায় ধনে-পুত্রে সুখী করুন!"

দুঃখিনী রমণী ভূমিষ্ঠ হইয়া জ্যোৎস্নাকে প্রণাম করিল। অতঃপর

কৃতজ্ঞচিত্তে, কায়মনোবাক্যে, তাঁহার শুভকামনা করিতে করিতে চলিয়া গেল। অদূরে শিবিকা আসিতেছে দেখিয়া, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ঐ মা, তোমার পাল্কী আস্‌চে। আহা, মা আমার জন্ম-এয়োস্ত্রী হও।"

শিবিকা আসিল, কিন্তু সে পরিচারিকা ত আর ফিরিল না।—"কারণ কি? এই শিবিকা কি আমার? বাহকেরা ত তাহাই বলিল। পরিচারিকার কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিল, সে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে,—এখন আর এখানে বাহির হইতে কাহারও আসা নিষেধ। বলিল, তাহারা বাদসাহের আজ্ঞা-পত্র লইয়া তবে আসিয়াছে।"————আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে, জ্যোৎস্না শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক, শিবিকা-দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

পাঠক পাঠিকা বুঝিলেন,—এ চাতুরি কার? কে এ খেলা খেলিল?

কিন্তু একি! শিবিকায় উঠিবার সময়, জ্যোৎস্নার গাত্রবস্ত্রখানি কে যেন একবার টানিয়া ধরিল না?

জ্যোৎস্না মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, শিবিকার একটা পেরেকে বাধিয়া, তাঁহার গাত্রবস্ত্রখানির অগ্রভাগ আট্‌কাইয়া রহিয়াছে এবং টান পড়ায় একটু ছিঁড়িয়াও গিয়াছে।

এই সময়ে হঠাৎ তাঁহার মাথার উপর একটা দাঁড় কাক "ক-অ-অ—ক-অ-অ" রবে ডাকিয়া উঠিল। জ্যোৎস্না তাহাতে চমকিত হইলেন।—তাঁহার বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল।

অন্তরে পতিপদ ধ্যান করিয়া এবং দুর্গানাম স্মরণ করিয়া, সতী পুনরায় শিবিকাদ্বার রুদ্ধ করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—

"ভয় কি! মা ভবানী যখন অভাবনীয় রূপে এই অস্ত্র মিলাইয়া দিয়াছেন,—তখন আর আমার ভয় কি? অস্ত্র নিকটে থাকিতে, রাজপুত-রমণীর কিসের ভয়?——মা সর্ব্বমঙ্গলে! বুঝিলাম, আজ তুমি অস্ত্র-

বিক্রেত্রী রমণীরূপে আমায় দেখা দিয়াছিলে!—হায় মা! আমি জ্ঞানহীনা রমণী,—চর্ম্মচক্ষে তোমায় চিনিলাম না। চক্ষু মুদিয়া এখন দেখিতেছি,——হৃদয় আলোকিত করিয়া তুমি অন্তরে বিরাজ করিতেছ। বিপদভঞ্জিনী! তোমার কৃপায় যেন আজ সকল বিপদে পরিত্রাণ পাই। মা দয়াময়ি পরমেশ্বরি!——"।

সতীর এ প্রার্থনা কি জগজ্জননীর চরণে স্থান পাইবে না?

নবম পরিচ্ছেদ।

বাহকগণ শিবিকা লইয়া দ্রুতপদে চলিল। তাহারা কা'র সঙ্কেতমত, রাজপথে না গিয়া, একটা সরু গলি ধরিল। তারপর আর একটা সরু গলি,—সেইটার পর আর একটা। তার পর সুড়ঙ্গের মত একটা পথ। জ্যোৎস্না শিবিকাদ্বার ঈষৎ উন্মোচিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে তাঁহার বড় ভয় হইল। শিবিকা ক্রমে নিম্নমুখে প্রবেশ করিল, বাহকগণের গতি মন্দীভূত হইল,—জ্যোৎস্না তাহা বুঝিলেন। চীৎকার করিয়া বা কাঁদিয়া এখন কোন ফল নাই, তাহাও তিনি বুঝিলেন। শাণিত ছুরিকাখানি দৃঢ়রূপে কটিতটে সংবদ্ধ করিলেন। মন প্রাণ দৃঢ় করিলেন। তাঁহার কপোলে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। একবার ভাবিলেন, "মরিব কি?" আবার ভাবিলেন, "না, আত্মহত্যায় কাহারও অধিকার নাই।—তাহা হইলে স্বামীর নিকট অবিশ্বাসিনী হইব,—পৃথ্বীরাজও তাহা হইলে দুর্ব্বহ দেহভার লইয়া অধিক দিন পৃথিবীতে থাকিবেন না।———না, আমার মরা হইবে না। মৃত্যু ত আছেই,—দেখি না, পরিণাম কি হয়?"

পরক্ষণে ভাবিলেন, "বাদসাহ-কন্যা ত আরও অধিকতর অপমান করিবার জন্য, আমার সহিত এরূপ চাতুরী করিতেছে না? তাহারা সব পারে। আমাকে ত জোর করিয়া যবন-অন্ন খাওয়াইবে না? অথবা——"

ভাবিতে ভাবিতে জ্যোৎস্নার মাথা ঘুরিয়া আসিল, তিনি চক্ষে অন্ধকার

দেখিলেন। পরক্ষণে আবার বুকে বল পাইলেন। ভাবিলেন, "না, আমি বৃথা সন্দেহে অভিভূত হইতেছি! এইরূপ ভাবনায়ও পাপ আছে। কেন, কি পাপে আমার সর্ব্বনাশ হইবে? মা-ভবানী আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। এই যে মা সতী শিরোমণি, তোমায় দেখিতেছি! মা, মা, ভীত তনয়াকে অভয় দাও।

"আর যদি তাই হয়,—যদি সেই———ওঃ! সেই পাপ কাহিনী মুখে আনিতেও বাধিয়া যায়।—কিন্তু তাহাতেই বা আমার এত আশঙ্কা কেন? হস্তে এই গরলাধার অঙ্গুরী রহিয়াছে,—কটিতটে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা রহিয়াছে,—ইহাতেও কি রাজপুত রমণী আপন অমূল্যনিধি রক্ষা করিতে পারিবে না?"

বাহকগণ ক্রমে সেই সুড়ঙ্গময় পথ ত্যাগ করিয়া, একটি কক্ষসম্মুখে আসিল। সেইখানে আসিয়া তাহারা শিবিকা নামাইল। সেই স্থানের চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। কোন দিকে পথ নাই, লোকালয় নাই, জনপ্রাণী নাই। এবার জ্যোৎস্না কিছু ক্রোধভরে বিরক্তিসহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—"আমাকে এ কোথায় আনিলে? শীঘ্র আমাকে গৃহে লইয়া চল।"

সর্দ্দার বাহক বলিল, "মায়ি! এই ঘরে যান,—এখানে আপনার স্বামী আছেন,—তিনি আপনাকে লইয়া যাইবেন।—তাঁহার আদেশমতই আমরা আপনাকে এখানে আনিয়াছি।"

নিরুপায় জ্যোৎস্না তখন সাহসে ভর করিয়া সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। অমনি ক্ষিপ্রগতিতে বাহির হইতে সেই দ্বার রুদ্ধ হইল।—অর্গল আঁটিয়া দিয়া, কে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। এতক্ষণে জ্যোৎস্না বুঝিলেন, কে পথ ভুলাইয়া, তাঁহাকে এই বিষম বিপথে আনিয়াছে!

গৃহ অন্ধকার। উচ্চে দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে বটে, কিন্তু সন্ধ্যা আগমনের সহিত, গবাক্ষের সেই ক্ষীণালোকও অন্তর্হিত হইয়াছে।

যে দ্বার দিয়া জ্যোৎস্না গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ সেই দ্বার খুলিতে বা ভাঙ্গিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা,—তাহাতে দ্বার ভাঙ্গিল না, কিংবা খুলিলও না,—দুই চারিটা দুম্-দাম্ শব্দ হইল মাত্র।

রাজপুত-সতী তখন অসীম সাহসে বুক বাঁধিলেন। একান্ত মনে পতি-পদ ধ্যান করিলেন। জগজ্জননীকে মর্ম্মব্যথা জানাইলেন। শেষে কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "মাগো, তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!"

"কি ইচ্ছা পূর্ণ হইবে সুন্দরি!"——

কম্পিত কণ্ঠে, ভগ্নস্বরে,—কে, এই কথা বলিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিল।

সেই কম্পিতকণ্ঠ ও ভগ্নস্বর,—সেই নির্জ্জন গৃহ প্রতিধ্বনিত করিল। দেওয়ালে দেওয়ালে তাহার রেশ্ আসিল। অতৃপ্ত কামনা ও ইন্দ্রিয়-লালসা যেন হো হো হাসিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার সর্ব্বশরীর তাহাতে রোমাঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি ভীত হইলেন না। বরং দ্বিগুণ সাহসে তাহার উত্তর দিলেন,—

"যে দুর্ম্মতি মন্দ অভিপ্রায়ে এই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার মস্তকে বজ্রাঘাত হোক্!"

সহস্র আঁখি বিস্তার করিয়া, সতী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া আগুন জ্বলিতে লাগিল। সুকোমল দেহ দৃঢ় ও স্ফীত হইয়া উঠিল।

এবার সেই স্বর আরও নিকটবর্ত্তী হইল। আবেগভরে, উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে পুনরপি কে বলিল,—

"সে কি সুন্দরি, অমন কথা বলিও না!———যে মস্তক তোমার কুসুম-কোমল বক্ষে থাকিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিবে, তাহাকে বজ্রাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে বলিতেছ?——দেবতায় অমন নিষ্ঠুর কথা বলে না!"

আরও সাহসভরে, আরো দৃঢ়তার সহিত জ্যোৎস্না উত্তর দিলেন,

"দেবতার অভিসম্পাৎ কখন ব্যর্থও হয় না!"

"তুমি আমার প্রাণেশ্বরী!"

"আমি তোমার জীবনহন্তা যম!"

হঠাৎ সেই অপরিচিত কণ্ঠ, ক্ষুদ্র এক বাঁশীতে ফুঁ দিয়া, কি সঙ্কেত করিল। তৎক্ষণাৎ অমনি ছাদের উপরিভাগ হইতে, কৌশলে, কে সেই গৃহের উজ্জ্বল দীপালোক জ্বালিয়া দিল। সেই আলোকে সমস্ত গৃহ আলোকিত হইল!

কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তি বুঝিল,—অন্যরূপ'। তাহার চক্ষে বোধ হইল,——যেন উজ্জ্বল দিবালোকের নিকট ক্ষুদ্র দীপালোক মিট্ মিট্ করিতেছে। লোকললামভূতা, অনুপমা সুন্দরী জ্যোৎস্নাময়ীকে দেখিয়া,—সেই কামাতুর হতভাগা, উদ্‌ভ্রান্তপ্রায় হইল।——এই মূর্ত্তিকেই না জ্যোৎস্না, পাপ 'নরোজা মেলায়' যবনিকা-অন্তরালে, চকিতের মত একবার দেখিয়াছিলেন?

সতীর অন্তর আর একবার কাঁপিয়া উঠিল।——"তবে কি এই সেই? স্বামী আমার দেবতা,—যা বলেন, তাই ফলে!"

মুহূর্ত্তের জন্য জ্যোৎস্না স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন———হরি হরি! ইহারই নাম কি দুর্ব্বোধ্য মানব-চরিত্র?

'কামবিহ্বল মূঢ়,—কম্পিতদেহে, যোড়হস্তে, নীরব প্রার্থনা জানাইল। সতীর মুখপানে চাহিয়া, কথা কহিবার সাহস কি তাহার হইতে পারে?

বজ্রকঠিনস্বরে জ্যোৎস্না গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—

"দূর হ—নরকের কীট!"

কথায় সাহস বাড়িল। কামোন্মত্ত পশু এবার নতজানু হইল। অতি কাতরভাবে বলিল,—

"সুন্দরি! আর আমাকে বঞ্চিত করিও না। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমার রূপের শিখায় আমার অন্তর-বাহির দগ্ধ হইতেছে। প্রাণ যায়,—দয়া কর প্রাণেশ্বরি! প্রেম-বারি দিয়া এ পিপাসীর প্রাণ

রাথ,—প্রেমময়ি!———পৃথিবীর সম্রাট আজ তোমার চরণে প্রেমভিক্ষা করিতেছে!"

এবার জ্যোৎস্না আরও বিস্মিত, আরও চমৎকৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে সত্যই কি এই,—সেই? এঁ্যা——"

"এই,—কি সুলোচনে? দিল্লীশ্বর আজ তোমার চরণতলে,—তাই বিস্মিত হইতেছ? প্রেমময়ি, মনুষ্যপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক ধাতুতে গঠিত!"

"রাম রাম!"

জ্যোৎস্না চমকিত হইয়া, কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া, পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া বলিলেন,—

"রাম, রাম! তুমি? দিল্লীশ্বর? ভারত-সম্রাট? আকবর? তোমার এই কাজ?"

"আমারই এই কাজ! দেখ, রমণীরূপে দেবতারও পদস্খলন হয়,—আমি কোন্ ছার!"

"নরোজা-মেলা কি জন্য?"

"সত্য বলিব—প্রধানতঃ এই জন্য।"

"কতদিন এ পাপ-পঙ্কে ডুবিয়াছ?"

"অনেক দিন।——পরকীয়া আস্বাদনের আমি বড় পক্ষপাতী। আজ মহিলা-মেলায় তাই তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও মনোমোহিনী দেখিয়া কৌশলে এখানে আনাইয়াছি।"

"তাই বুঝি এ গুপ্তগৃহ?"

"তাই।——সুন্দরি, লোকলজ্জার ত ভয় আছে?"

"লোকের চক্ষে ধূলি দিতেছ, কিন্তু সেই সর্ব্বদর্শী—সর্ব্বান্তর্য্যামীর চক্ষে ধূলি দিবে কিরূপে?"

"তোমাকে সত্য বলিব,—আমি ও-সব কিছু মানি না।—কেবল অজ্ঞ

লোকের নিকট প্রতিপত্তি ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই আমি ধর্ম্মের ভাণ করি মাত্র।"

"তোমার পাপে মোগল-সাম্রাজ্যের পতন হইবে।"

"আমি মোগল-সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী করিব।"

"পাপীর কাজ কখন স্থায়ী হয় না।"

"বৈবাহিক সম্বন্ধে আমি হিন্দু মুসলমানকে প্রায় এক করিয়াছি।"

"মিথ্যা কথা!—হিন্দুর হৃদয়ের উপর তোমার এতটুকুও প্রতিষ্ঠা হয় নাই।"

"যাক্, ও নীরস রাজনৈতিক আলোচনা।————সুন্দরি! এখন আমার মনস্কাম পূর্ণ কর। তোমাকে পাইলে আমি আর এ জীবনে কাহাকেও চাহিব না।—দেখ, আমার সর্ব্বশরীর জরজর হইয়াছে।"

"দিল্লীশ্বর! সাবধান,—পুনরায় যেন ও পাপ কথা মুখ হইতে বাহির না হয়!—আমাকে এখনি আমার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দাও।"

"প্রেমময়ি, প্রেমিকার ত এ রীতি নয়?—শরণাগত প্রণয়প্রার্থীর কামনা পূর্ণ করাই তাঁহার ধর্ম্ম। ক্রোধ করিও না,—সুন্দরি!—আ মরি মরি! তোমার ঐ ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলেও আমি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতেছি।——চন্দ্রাননি! আর পারি না,—অধৈর্য্য হইয়াছি,—আত্মহারা হইয়াছি,—আমাকে রক্ষা কর। দিল্লীশ্বর আজ তোমার চরণে, রাজ্য, রাজমুকুট, সিংহাসন, সম্ভ্রম, জীবন,—সকলই সমর্পণ করিতেছে।—তোমার ঐ শীতল-বক্ষে এ তাপিত জনকে স্থান দাও,—আমি একবার ঐ অধর-সুধা পান করিয়া জীবন সার্থক করি। আমাদের এ গুপ্ত-প্রণয় কেহ জানিতে পারিবে না।"

কম্পিত চরণে, টলিতে টলিতে দিল্লীশ্বর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, সতী প্রতিমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে সতী গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—

"মূঢ় যবন! যদি আর এক পদ অগ্রসর হইবি, ত প্রাণ হারাইবি——

এখনও আপনার পদ, প্রভুত্ব, সম্মান স্মরণ কর্।——আপনার জননীরে স্মরণ কর্।—আমিই তোর জননী, মনে কর্।—ওহো! 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা' কি এই?—রাম, রাম!"

প্রভাময়ীর সেই অনুপম লাবণ্য-প্রভার সহিত এই উদ্দীপ্ত রূপ-শ্রী মিশিয়া, বড়ই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সে শোভায় উজ্জ্বল দীপালোক সত্য সত্যই নিষ্প্রভ হইল। সেই গৃহ, গৃহস্থিত সেই আস্বাব ও সেই পাপ বিলাস-শয্যা,—সত্য সত্যই যেন মলিন হইল। আর ওদিকে দেখ দেখি,—ঐ পুণ্যময়ী জীবন্ত-প্রতিমার সম্মুখে,—পাপ কামনাজর্জ্জরিত,—অতুল সম্পদের অধিকারী—সম্রাটের মুখখানা কেমন কুৎসিত কদাকার দেখিতে হইয়াছে!

মাতৃনামে কামোন্মত্ত পশু একবার চমকিল। একবার বুকটা একটু কাঁপিয়া উঠিল। দুই এক পদ হটিয়াও আসিল। কিন্তু দারুণ মোহ, সংযমেরও বড় অভাব, তাই ভাল সাম্‌লাইতে পারিল না। যুক্তকরে অনিমেষে, সতীর পানে চাহিয়া রহিল।

জ্যোৎস্না।—মূঢ়, এখনো পাপ অভিলাষ? মাতৃনামেও তোর হৃদয় কম্পিত হইল না? তোর জন্ম ও জীবন কি এতই কলঙ্কিত?—হা ঈশ্বর! এমন অধমাত্মাকেও তুমি এ উচ্চপদ দিয়াছ?"

দুর্জ্জয়, দুরন্ত, অতি ভীষণ রিপু—কাম। সকল বুঝিয়াও এই প্রমত্ত রিপুকে আয়ত্ত করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। বিশেষ, যে ইহাতে চির-অভ্যস্ত, সে কিছুতেই পারে না। জীবন দিতে পারে, তথাপি অন্তরের অন্তরে আপনাকে সংযত করিতে পারে না। তা সে দুনিয়ার মালিকই হোক্, আর অন্নহীন ভিক্ষুকই হোক্!

কামোন্মত্ত আকবরেরও এখন সেই দশা। তাই হতভাগ্য সকল ভুলিয়া বলিল, "সুন্দরি! যতই বল না কেন, দিল্লীশ্বরের আশা পূর্ণ না করিয়া, আজ তুমি যাইতে পারিতেছ না।"

আত্মহারা, বিকলেন্দ্রিয় আকবর পুনরায় সতীর সম্মুখীন হইল।

এবার চক্ষের দৃষ্টি আরও স্থির করিয়া, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, জ্যোৎস্না বলিলেন,—"আবার !"

মূর্খ সম্রাট এবার ভাবিল,—"না, বিনয়ে কার্য্যোদ্ধার হইবে না, ভয় দেখাইয়া ইহাকে বশীভূত করিতে হইতেছে।"

প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ আবার! কেন, ভয় দেখাইতেছ নাকি? জানো, তুমি এতক্ষণ কাহার সহিত কি ভাবে কথা কহিতেছ?"

"হাঁ, জানি,——কপট, অধর্ম্মাচারী, কাম-কুক্কুর দিল্লীর বাদসাহের সহিত,—তাহারই উপযোগী ভাষায়, কথা কহিতেছি!"

"কি! তোমার গর্দ্দান হুকুম দিব——এখনও আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।"

"হা মূর্খ!——কে বলে, তোকে চতুর ও রাজনীতিজ্ঞ! হিন্দুরমণীকে তুই মরিতে ভয় দেখাস্!"

"কিন্তু আমার হাত হইতে আজ তোমার পরিত্রাণ নাই।"

কামোন্মত্ত পশু আবার সতীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। বার বার এইরূপ সতীত্বনাশের উদ্যোগ!

'অসহায়া অবলা রমণী,—তখন সেই অগতির গতি অনাথনাথকে ডাকিতে লাগিলেন,—

"হে নাথ! হে ত্রিলোকের অধীশ্বর! আজ দাসীর প্রতি প্রসন্ন হও,—তাহার নারী-ধর্ম্ম রক্ষা কর। হে বিপদভঞ্জন, লজ্জা-নিবারণ! একদিন তুমি সেই পাপ কৌরব-সভায় বিবসনা দ্রৌপদীর লজ্জা রাখিয়াছিলে,—আজ এই পাপ মোগলগ্রাস হইতেও তোমার তনয়াকে রক্ষা কর!——মাগো, সতীকুলশিরোমণি, আদ্যাশক্তি ভগবতি! তুমিও সতীর সহায় হও।"

সেই মূর্ত্তিমতী সতী-প্রতিমার চক্ষু হইতে অপাঙ্গ বহিয়া দরদরধারে

মুক্তাধারা বর্ষণ হইতেছে,—আর পাপ দিল্লীশ্বর তখনও কামকলুষিত দৃষ্টিতে —সতৃষ্ণ নয়নে সতীর সেই অভিনব রূপসুধা পান করিতেছে।

সহসা দীপালোক কম্পিত হইল। সহসা সে আলোক যেন নীলবর্ণ ধারণ করিল। সহসা সে নীলালোকে যেন শত শত বিভীষিকা আবির্ভূত হইতে লাগিল।——সতী গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সহসা সিংহবাহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চরণচুম্বিত কেশদাম আপনা হইতে কবরীভ্রষ্ট হইল। পরিধেয় বসনাঞ্চল ভূমিতে লুটাইল। চক্ষের সেই স্থিরদৃষ্টি এবার সত্য সত্যই পলক-হীন হইয়া রহিল। কটিতট-সংবদ্ধ সেই শাণিত ছুরিকাখানি দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া, সতীসাধ্বী জ্যোৎস্নাময়ী,—নিশ্চল প্রতিমার মত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। আ মরি মরি। সত্যই সে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি আজ আমার চক্ষের সম্মুখে প্রকটিত। হায় মা!——

সম্মুখে সেই ভীমা ভৈরবী রুদ্রাণীমূর্ত্তি দেখিয়া,—যবন আকবর, কি জানি কেন, এবার ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইল। তাহার কামলালসা কোথায় অন্তর্হিত হইল,—অন্তরে ভয় ও ভক্তির আবির্ভাব হইল।

সিংহবাহিনীমূর্ত্তি এবার কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—

"বল্,—বুকে হাত দিয়া উপর পানে চাহিয়া শপথ কর্,—আর কখন কোন পর-রমণীর প্রতি পাপ-নয়নে চাহিবি না,——ছলে, বলে, প্রলো-ভনে,—আর কোন কুলবালার সতীত্বনষ্ট করিবি না,—তবে তোকে এ যাত্রা ক্ষমা করি,——নহিলে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা এখনি তোর বুকের রক্ত পান করিবে!"

ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে অধর্ম্ম চিরকালই ভীত ও কম্পিত—বিশেষ ঈশ্বর সদয় হইলে সে অবনত হইবেই হইবে। মোগলসম্রাট এবার যেন একে-বারে গলিয়া কাদা হইয়া গেলেন। কেন হইলেন, তাহা বুঝান দায়। সৃষ্টি-রহস্যই এই। ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হইলে, পুণ্য ও পবিত্রতার নিকট,—অধর্ম্ম ও পাপ, পরিণামে এইরূপই নত হইয়া থাকে।

আকবর এবার গদগদশ্রুলোচনে, কম্পিতকণ্ঠে, "মা মা" বলিতে বলিতে, সতীপ্রতিমার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

ধর্ম্মের জয় হইল। সতী, ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

আকবর ভাবিয়াছিলেন, পৃথ্বীরাজের পত্নীর সতীত্বনষ্ট করিতে পারিলে, তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ইন্দ্রিয়চরিতার্থ ত হইবেই,—তাহা ব্যতীত পবিত্র শিশোদীয়কুলে দুরপনেয় কলঙ্কও অর্পণ করা যাইবে। কারণ, পৃথ্বীরাজপত্নী যে, মহারাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও শক্তসিংহের কন্যা, আকবর তাহা জানিতেন। প্রতাপ যে, আজ অবধি কিছুতেই মোগলের নিকট মাথা নোওাইলেন না,—ইহাতে সৌভাগ্যগর্ব্বে স্ফীত আকবর মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট। সুতরাং যে কোন উপায়ে হোক্, সেই প্রতাপসিংহের সম্মান নষ্ট করিতে পারিলেই তাঁহার আনন্দ।—পৃথ্বীরাজ-পত্নীর সতীত্বনষ্ট করিবার এতটা চেষ্টা ও কৌশল,—আকবরের অন্যতম গূঢ় উদ্দেশ্য। তা উদ্দেশ্য যাহাই হোক্, ধর্ম্মের কলে পড়িয়া, আজ তাঁহাকে,—সেই সতীলক্ষ্মীকে মাতৃসম্বোধন করিতে হইয়াছে। এ শিক্ষা এই তাঁহার জীবনের প্রথম। সোণার জ্যোৎস্না, মোহান্ধ দিল্লীশ্বরের জীবনে, এই প্রথম ধর্ম্মের আলোক সঞ্চারিত করিয়া দিলেন।—কবি ও ঐতিহাসিকগণ চির-দিন সেই মহামহিমময়ী, সতীশিরোমণি, আর্য্যকুললক্ষ্মীকে দেবী বলিয়া বর্ণন করিবেন।

পৃথ্বীরাজ যথাকালে একে একে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। পত্নীর প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। উপস্থিত ব্যাপারে তিনি মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিভাব রাখিলেন না,—সমানভাবে, সমান আদরে, সমান প্রীতিতে, পত্নীপ্রেমে আবদ্ধ রহিলেন। বরং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের গাঢ়তা আরও বর্দ্ধিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

এই পাপস্থানে, এই শত্রুপুরীতে, বয়ঃস্থা যমুনা যে, কুমারী অবস্থায়, তাহার কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, নিরাপদে অধিক দিন থাকিতে পারে, তাহার সম্ভাবনা অল্প;—পৃথ্বীরাজ ইহা বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, অবিলম্বে ভগিনীকে স্থানান্তরিত করিতে না পারিলে, তাঁহার আর মঙ্গল নাই। তবে নিজের থাকা বা স্ত্রীকে নিকটে রাখা,—তাহার ত আর কোন উপায় নাই,—কাজে কাজেই একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও, পৃথ্বীরাজকে মোগল-পুরীতে বাস করিতে হইল।

দিব্য এক মোগল-যুবক সাজিয়া, রাজপুতকুমারী যমুনা, দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পুরুষবেশে সেই সুদর্শনা শ্যামলার শোভা বড়ই সুন্দর হইল। সেই কুণ্ডলীকৃত ঘন কেশরাশি শিরস্ত্রাণে লুক্কায়িত হইয়াছে। সেই অঙ্গের আভরণগুলি আর নাই.—তাহার স্থানে পুরুষজনোচিত বেশভূষা অধিকার করিয়াছে। মোগলাই জামা, মোগলাই ইজের, মোগলাই পাকৃড়ী, মোগলাই জুতা,—সমস্তই মোগলের পরিচ্ছদ। বক্ষঃস্থলটা কিছু উন্নত হইলেও, তাহা একখানা সাটীনের ওড়না দ্বারা কৌশলপূর্ব্বক গলদেশ হইতে এমনভাবে বাঁধা যে, হঠাৎ কিছু ধরিবার-ছুঁইবার যো নাই। আবশ্যক হইলে, সকলই একরকম চলনসই করিয়া লওয়া চলে;—চলে না কেবল প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দেওয়া। যমুনা আর সব

রকমে প্রায় অবিকল পুরুষ হইয়াছেন সত্য; কিন্তু সেই আকর্ণবিস্তৃত চঞ্চল চক্ষু দু'টিকে, সুন্দরীর চক্ষু হইতে, কিছুতেই পুরুষের চক্ষে পরিণত করিতে পারিলেন না। সেই সরল স্নিগ্ধ চাহনি এবং সেই সকরুণ কটাক্ষই তাঁহার স্ত্রীপ্রকৃতির বিশেষত্ব প্রমাণ করিতে লাগিল।

কিন্তু এত সূক্ষ্মভাবে দেখিতে জানে কয়টা লোক? এবং দেখিবেই বা কে? চক্ষের দৃষ্টি দেখিয়া, মুখের ভঙ্গি দেখিয়া, মানুষ চেনা ত সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে, এ ক্ষেত্রে সাধ্যায়ত্ত হইলেও, অত গরজ কার যে যমুনা স্ত্রী কি পুরুষ, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবে?

সুতরাং যমুনা নিরাপদে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এক অতি বিশ্বস্ত রাজপুত ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে ছিল। পৃথ্বীরাজ সেই ভৃত্যকে সমস্ত বুঝাইয়া-পড়াইয়া দিয়াছিলেন। প্রতিপদে বিশেষ সতর্কতা এবং চাতুর্য্য অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন,—মোগল যেন ইহার বিন্দু বাষ্পও জানিতে না পারে। কোন রকমে একবার রাজধানীটা উত্তীর্ণ হইতে পারিলে হয়।

তাহাই হইল। যমুনা, ভৃত্য সমভিব্যাহারে নিরাপদে নগরের প্রান্ত সীমায় উপনীত হইলেন। সেখানে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত দুইটি অশ্ব সজ্জিত ছিল। একটিতে যমুনা উঠিলেন, অন্যটিতে ভৃত্য উঠিল। ভৃত্য অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল, যমুনা তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যমুনা রাজপুত কন্যা; বাল্যকাল হইতে অশ্বারোহণ কিছু কিছু অভ্যাস করিয়াছিলেন। গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে তাঁহার কিছু বিলম্ব হইল। পথকষ্ট যথেষ্টই হইয়াছিল। উদ্বেগ, আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা,—ইহাও কম হয় নাই। তা হোক, এতদিনে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার পথ পরিষ্কার হইল। এতদিনে প্রেম-যমুনা অমর-সাগরে মিশিতে চলিল।

এই কি সেই আরাবলী?—যে স্থান যমুনা কল্পনানেত্রে কতবার দেখিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়াছে—এই কি বালিকার সেই পুণ্যতীর্থ?—যে

স্থানের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত এবং প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইয়াছে?—এই কি সেই যমুনার প্রেম-নিকেতন?—যেখানে কুমার অমরসিংহ আপন দেবোপম মূর্ত্তি লইয়া বিরাজ করেন?

যমুনা তাহাই ভাবিতেছে,—"এই কি আমার সেই চির-বাঞ্ছিত স্থান? এই স্থান কি পুণ্যশ্লোক প্রতাপসিংহের চরণস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে? আর এই স্থানেই কি আমার জীবনসর্ব্বস্বকে দেখিতে পাইব?"

"হায়! কত আশা করিয়া, ভ্রাতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আমার মনস্কাম কি পূর্ণ হইবে না? যাঁহার জন্য এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত উদ্বেগ,—তিনি কি করুণ নয়নে চাহিবেন না? ঘৃণায়, অশ্রদ্ধায়, বিরক্তিতে, —কি তিনি মুখ ফিরাইবেন?—— না, না, এ অপরূপ রূপ-মন্দিরে কখন সেরূপ নিষ্ঠুরতা থাকিতে পারে না!"

বৃহৎ এক শিলাখণ্ডে বসিয়া, যমুনা আপন মনে এইরূপ আকাশ-পাতাল ভাবিতেছেন। হস্তে একখানি প্রস্তরখোদিত প্রতিমূর্ত্তি। সেই ছবির পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া, যমুনা আপন মনে বারংবার এই কথা বলিতেছেন। এখন আর তাঁহার সেই ছদ্মবেশ—পুরুষবেশ নাই,—— সুকুমারী সুন্দরীবেশেই তিনি বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

অপরাহ্ণ হইয়াছে। আরাবলীর ঘন গিরিশ্রেণী স্থির গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। অদূরে শ্রবণ-মনোহর নির্ঝরিণী জল বহিতেছে। মৃদুমন্দ সমীরণ সঞ্চালিত হইতেছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ-রশ্মি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। নির্জ্জন অরণ্যানী অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। যমুনা এই প্রীতিপ্রফুল্লকর স্থানে, প্রীতি-প্রফুল্লকর সময়ে, আপন মনে কত চিন্তাই করিতেছে।

ছবিখানি কখন বুকে ধরিয়া নিমীলিত নেত্রে কি ভাবিতেছে, কখন সম্মুখে ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে দেখিতেছে; আর কখন বা প্রেমপরিপ্লুত হৃদয়ে ছল ছল চক্ষে তাহা চুম্বন করিতেছে। যমুনা আবার ভাবিল,—

"হায়, ইহা কি স্বপ্ন? সত্যই কি আমি হৃদয়ে স্বপ্ন লইয়া দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি? এই আঁখিজলই কি জীবনের সার হইবে?—তবে কেন ভ্রাতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া এ অকূল পাথারে ঝাঁপ দিলাম? দিল্লী থাকিলে, সত্যই কিছু মোগল আমার নারীধর্ম্ম নষ্ট করিত না। মন লইয়াই ত কথা? এই মন যদি আমি খাঁটী করিয়া সেখানে থাকিতাম, তবে কাহার সাধ্য, আমার কুমারীধর্ম্ম নষ্ট করে?

"কিন্তু আমার মন এখানে পড়িয়া রহিয়াছে। কুমার অমরসিংহকে দেখিব বলিয়া, আমি তৃষিত চাতকীর ন্যায় অধীর হইয়াছি। সেই আশায় স্নেহময় ভ্রাতা, প্রেমময়ী ভ্রাতৃজায়াকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। হায়! আমার এ আশা কি পূর্ণ হইবে না?"

আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে, পরিশ্রান্তা যমুনা সেই শিলাখণ্ডে ঘুমাইয়া পড়িল। তাঁহার ভৃত্য অদূরে কিছু ফল মূলের সন্ধানে গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে,—"এই আরাবলী; আজই আমরা মহারাণার আশ্রয়ে পঁহুছিব। কমলমীর এখান হইতে বড় জোর তিন চারি দণ্ডের পথ।"

ভৃত্য, অশ্ব দুইটিকে লইয়া নির্ঝরিণীর নিকট গেল। তাহাদিগকে কিছু তৃণ-জল দিল। এবং নিজেও নির্ঝরিণীজলে স্নিগ্ধ হইয়া, কিছু বন্ধ ফলমূল সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে যমুনা সেই সুশীতল শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। চারিদিকে সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ ঘন গিরিশ্রেণী; মাথার উপর অনন্ত আকাশ; চতুষ্পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল; প্রকৃতি গাম্ভীর্য্য-ময়ী। চারিদিকের সেই গাম্ভীর্য্য ও অনন্ত নীরবতার মধ্যে, যমুনা নীরবে ঘুমাইতেছে। প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে একটি স্বভাবসুন্দরী আলু-থালুবেশে ঘুমাইতেছে। অঙ্গের বসন শ্লথ; শরীর কিছু অবশ; মুখ-কমলে ঈষৎ হাস্যরেখা বিকশিত। বালিকা যেন কোন সুখ স্বপ্ন দেখিয়া মৃদু হাসি হাসিতেছে। ছবিখানি সযত্নে বক্ষোপরি স্থাপিত।

নিদ্রিতাবস্থায়ও যেন বালিকা সেই ছবি দেখিতেছে। দূর হইতে সেই অপরূপ মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয়, যেন প্রকৃতির প্রিয়পুত্রী, —স্বভাবের একটি নিখুঁত ছবি,—কোলাহলময় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃতির মুক্ত-প্রাঙ্গণে, উলঙ্গপ্রাণে নিদ্রা যাইতেছে।

অদূরে গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে, এক কন্দর্পরূপ তরুণ যুবক সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। যুবকের রাজপুত বেশ, কিন্তু বীর-পরিচ্ছদ নয়;—স্বাভাবিক সামান্য বেশে স্বভাবসুন্দর প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তিতে, মৃদু মধুর একটী গানের এক চরণ গাহিতে গাহিতে, তিনি সেই দিকে আসিতেছেন। গানটি এই——

নীরব প্রাণে, নীরব যামে,
হেরিনু কি অপরূপ রূপ।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
হ'বে না কি স্বপন স্বরূপ॥

যুবক ধীরপদে এই গানটি গাহিতে গাহিতে চলিতেছেন; কখন বা নিমীলিত নেত্রে দাঁড়াইয়া, নিবিষ্টচিত্তে কাহার মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন। গানের ঐ একটি মাত্র চরণ,—বিশেষ ঐ শেষ পদটি পুনঃপুনঃ গীত হইতেছে——

'হ'বে না কি স্বপন স্বরূপ।'

গুন্ গুন্ স্বরে, অথচ সুস্পষ্ট মধুর রবে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া যুবক গাহিতেছেন,——

'হবে না কি স্বপন স্বরূপ।'

ওদিকে বালিকা যমুনা, ঘুমঘোরে মধুর স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, বীণা-বিনিন্দিতকণ্ঠে, যেন তাহার উত্তর দিতেছে,—

'সাধে হৃদয়ে ধরি, সাধে জীবনে মরি,
হা হা হা রে, বিধি যে বিরূপ॥'

গান গাহিতে গাহিতে, ঘুমঘোরেই বালিকা উঠিয়া বসিল। সেই ঘুমঘোরেই সোণার চক্ষে দেখিল——সম্মুখে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! তাহার সেই জন্মজন্ম পরিচিত, চিরবাঞ্ছিত,——সেই দেবোপম প্রেম-মূর্ত্তি!

চারি চক্ষের মিলন হইল। নির্নিমেষ নয়নে অবাক্ হইয়া, উভয়ে উভয়কে দেখিতে লাগিলেন।

উভয়ের শরীর কণ্টকিত, হৃদয় রোমাঞ্চিত, প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইল।

বিস্ময়, আনন্দ, মোহ,——উভয়কে ক্ষণকালের জন্য মুহ্যমান করিয়া ফেলিল।

কোমলহৃদয়া যমুনা, হৃদয়বেগ সংবরণ করিতে পারিল না,—সেই শিলাখণ্ডে অবশদেহে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িল। যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান আসিল, তখন বুঝিতে পারিল, তাহার ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তক, কাহার উরুদেশে স্থাপিত হইয়াছে। চক্ষু মেলিয়া দেখিল,—সেই দেবোপম অপরূপ মূর্ত্তি, সযত্নে তাহার মস্তক ধারণ করিয়া, তখন অবধিও, নির্নিমেষ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছে।

যুবক বুঝি মনে মনে কেবল এই কথাই বলিতেছিল,—

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।'

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয়? বোধ হয়, পৃথিবীর আপামর-সাধারণ একথা অস্বীকার করিবে। কিন্তু প্রেমরাজ্যে সকলই অদ্ভুত, সকলই বিচিত্র। প্রেমরাজ্যে অনেক সময় স্বপ্নও সত্য হয়, আবার সত্যও অনেক সময় স্বপ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তোমায় আমায় যে জিনিসটাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া অকাট্য বিশ্বাস করি, প্রেমিক প্রেমিকা হয়ত সে জিনিসটাকে আদৌ নয় বলিয়া, তাহার অস্তিত্ব অবধি অস্বীকার করেন। আবার তোমায় আমায় যে জিনিসটাকে স্বপ্ন বা মিথ্যা বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিই, তাঁহারা হয়ত সেই জিনিসটাকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া পূজা করেন। তোমার আমার সম্বল বহির্জ্জগৎ;—বাহিরের খুঁটিনাটী লইয়াই তোমায় আমায় দিন কাটাই;—আর প্রেমিক প্রেমিকা সদাই অন্তর্জ্জগতে মগ্ন;—সেই জগতের সকল তত্ত্বই তাঁহারা অবগত;—কাজেই তোমার আমার যে সত্য বা স্বপ্ন, তাঁহারা অনেক সময়ই তাহা বিপরীত ভাবে বুঝিয়া থাকেন। অতএব স্বপ্ন যে, সকল অবস্থাতেই মিথ্যা, এমন কথা তুমি সুনিশ্চিত বলিতে পার না।

• স্বপ্নে ঔষধ প্রাপ্তি, স্বপ্নে স্থানান্তরে গমন, স্বপ্নে অজ্ঞেয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ, স্বপ্নে হাসি কান্না, স্বপ্নে চিত্ত পরিবর্ত্তন, স্বপ্নে মন্ত্রগ্রহণ, এইরূপ স্বপ্নে

অনেক বিষয়েরই সাফল্য হইতে শুনা গিয়াছে; স্থান বিশেষে দেখাও গিয়াছে। অতএব স্বপ্ন যে একেবারে মিথ্যা,—একথা কেমন করিয়া বলিব?

এখন এই স্বপ্ন দেখিয়া, কুমার অমরসিংহ হৃদয়ে প্রেমপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বপ্নে তিনি তাঁহার প্রেমময়ী—হৃদয়রাজ্যের ঈশ্বরীকে দেখিলেন। দেখিলেন, শ্যামলা সুন্দরী পৃথিবীর ন্যায় তাঁহার প্রিয়তমার দেহের বর্ণ। সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে অপরূপ মাধুরী বিরাজিত। রামধনুর রং যতবার দেখা যায়, ততবারই যেমন নূতন নূতন বোধ হয়,—তাঁহার মানসপ্রতিমার দেহের বর্ণও যেন সেইরূপ। শ্যামলা, উজ্জ্বলা, সুবেশী সুকেশী,—শরদিন্দু-নিভাননা তিনি;—যেন প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল নির্ম্মল সরসীজলে সুশোভিত। সে কপোল, সে চক্ষু, সে কণ্ঠ, সে ওষ্ঠ, সে বাহু, সে ক্ষীণ কটি,—সকলই যেন সুষমাময়। সুন্দরীর সে হাসি-হাসি মুখখানি এবং জলভরা আঁখি দুটি,—স্বপ্নে দেখিলেও,—কুমার অমর প্রতিনিয়তই যেন তাহা চক্ষের উপর দেখিতেছেন। তাঁহার আর কিছুতেই মন বসে না. কোন কাজই আর ভাল লাগে না। পুণ্যশ্লোক পিতার যে, সেই অপূর্ব্ব ব্রত-গ্রহণ এবং কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত সেই ব্রতের পালন,—কুমার ক্রমে তাহাও যেন বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, পূজা, অর্চ্চনা,—সকলই যেন সেই স্বপ্নদৃষ্ট মোহিনী প্রতিমায় সমর্পিত হইল। সেই হইতে তিনি আনমনে যখন তখন নিবিড় অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতে আসিতেন, এবং উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে তন্ময় হইয়া এই গান গাহিতেন,——

'নীরব প্রাণে, নীরব যামে,
হেরিনু কি অপরূপ রূপ।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
হ'বে না কি স্বপন স্বরূপ।

গান গাহিতে গাহিতে কখন তিনি কাঁদিতেন, কখন তিনি হাসি-

তেন, কখন বা পাগলের ন্যায় লক্ষ্যহীন হইয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন। গানের অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার মর্ম্মকাতরতা, হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইত। মহাশূন্যেই তাঁহার সেই উন্মুক্ত তান লীন হইত।

সৌভাগ্যবশে, আজ সুপ্রভাতে, কাহার মুখ দেখিয়া তিনি গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছেন,—তাই তাঁহার সেই বহুদিন সঞ্চিত সোণার স্বপ্ন আজ সফল হইল।

অন্ধ চক্ষু পাইলে, জননী সাগরগর্ভে নিমজ্জিত পুত্রকে কোলে পাইলে, সতী মৃতপতিকে জীবিত দেখিলে,—যেমন বিস্মিত, স্তম্ভিত, পুলকিত ও মন্ত্রমুগ্ধ হয়,——স্বপ্নদৃষ্ট নায়িকাকে অকস্মাৎ স্বশরীরে সম্মুখে দেখিয়া, অমরও সেইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইলেন। সত্য সত্যই,—কিছুক্ষণ তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, তিনি জাগ্রৎ-স্বপ্ন দেখিতেছেন, না কোন মায়া-প্রহেলিকায় তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? কিংবা তাঁহার চক্ষের ভ্রম, কি মনের ভ্রম হইয়াছে? অথবা, সৌভাগ্যবশতঃ,—সত্য সত্যই আজ তাঁহার———অতি মমতা ও প্রেমের প্রগাঢ়তা বশতঃ অমর মনে মনেও মনের কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন,——বুঝি বা আজ তাঁহার সেই সোণার স্বপ্ন সত্য সত্যই সফল হইল!

তারপর যখন চারিচক্ষের পূর্ণ মিলন হইল,—তখন এক লহমার মধ্যে অতীতের অনন্ত কথা নীরব ভাষায় উভয়ের মুখে পরিব্যক্ত হইল। যখন উভয়েই অন্তরের অন্তর হইতে উভয়কে চিনিলেন, তখন সহসা উভয়ের বুকের ভিতর একটা প্রেমের তাড়িত বহিয়া গেল।—সে তড়িদ্বেগ কোমলহৃদয়া যমুনা সহিতে পারিল না,—মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া শিলাখণ্ডে শুইয়া পড়িল।

ভাববিহ্বল অমর তখন ভাবিতেছিলেন, "হা বিধাতঃ! এতদিনে কি তুমি সদয় হইয়া, আমার মানস-প্রতিমা মনোরমাকে মিলাইয়া দিলে?

হায় হায়! আমার চক্ষেও অশ্রুধারা, আর ঐ প্রতিমার চক্ষেও মন্দাকিনী-ধারা! আহা-হা! কি 'শোভা রে! জন্ম জন্ম যেন ঐ বাহুপাশে বন্দী থাকিতে পারি! নয়ন, তুমি এইভাবেই পলকশূন্য স্তম্ভিত হইয়া থাক। সত্যই,—

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল'।

"কিন্তু একি! প্রতিমামূর্ত্তি কাঁপিতেছে কেন? ঐ মুখের হাসিরাশি অমন ম্লান হইতেছে কেন? যা থাকে অদৃষ্টে,—উহাঁর কাছে যাই। ওকি! সত্য সত্যই কি উনি মূর্চ্ছিত হইলেন?"

অমর দ্রুতপদে যমুনার নিকটে গেলেন, এবং সেই কঠিন শিলাখণ্ড হইতে যমুনার মস্তক, কম্পিতহস্তে আপন উরুদেশে স্থাপিত করিলেন।

অমরের হৃদয়-সমুদ্র মথিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

"হায়! কে এ সুর-সুন্দরী? এ নিধি কি আমার হইবে? এ নিধি কি আমি বক্ষে ধারণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতে পারিব? স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত—কণ্টকিত হইতেছে। —কাহার এ নারী-রত্ন? ইনি কি পরস্ত্রী? না, তাহা হইলে, এ সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু শোভা পাইত। বিধবারও এ বেশ নয়। নিশ্চয়ই ইনি কুমারী। আহা, কার কণ্ঠে এ হেমহার শোভা পাইবে?

"মন, স্থির হও। এ নিধি তোমারই হইবে। এখন ইহাঁর পরিচয় পাইলে হয়।—এই যে পার্শ্বে একখানি প্রস্তরখোদিত চিত্র রহিয়াছে না? কার এ প্রতিমূর্ত্তি? কে সে ভাগ্যবান্ পুরুষ? (ছবি দেখিয়া) হৃদয়, কম্পিত হইতেছ কেন? স্থির হও। ওঃ! আমার সর্ব্বশরীর বিঘূর্ণিত হইতেছে।

এই যে, মৃদুমন্দ সমীরণ সঞ্চালনে ইহাঁর নয়ন-পদ্ম ধীরে ধীরে

উন্মীলিত হইতেছে।—এই যে, স্বর্ণলতা ধীরে ধীরে জাগরিত হইতেছেন।"

"যমুনার চৈতন্য হইল। ধীরে ধীরে তিনি উঠিয়া বসিলেন। আবার সম্মুখে সেই দেবোপম মূর্ত্তি দেখিলেন। এবার আর স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল না।

অতীতের অনেক দিনের অনেক কথা তাঁহার মনে উদিত হইল। সেই জন্ম-জন্ম-পরিচিত, চিরবাঞ্ছিত, পরম সুন্দর প্রেমস্নিগ্ধ মূর্ত্তি,—এতক্ষণ সযত্নে তাঁহার মস্তক আপন উরুদেশে রাখিয়াছিলেন। সেই স্পর্শসুখে যমুনা এতক্ষণ নিদ্রিত ছিল। ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় সকল ইন্দ্রিয় অবশ হইল। বালিকা আবার মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া, অমরের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল।

এবার একটু পরেই যমুনা চেতনা লাভ করিল। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—

"একি! তুমি? কুমার? অমরসিংহ? সত্যই তুমি?"

অমর।—সুলোচনে, আমিই মিবারপতি মহারাণা প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠ-পুত্র কুমার অমর।

অমরের বিস্ময়ের সীমা রহিল না;—"সত্যই কি বালিকা স্বপ্নময়ী? —আমার পরিচয় ইনি কিরূপে পাইলেন?"

মনে মনে এই কথা বলিয়া, সাহসে ভর করিয়া, অমর এবার কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,—

"সুন্দরি! আপনি কে, জানি না! যদি পরিচয় দিতে কোন বাধা না থাকে, আত্মপরিচয় দিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন। সত্যই,—আমি এখনও বুঝিতে পারিলাম না,—আপনি দেবী কি মানবী?"

স্মিতমুখে, বীণাবিনিন্দিকণ্ঠে যমুনা উত্তর দিলেন, "দেব! আমি সামান্যা মানবী। বিকানীর-রাজ পৃথ্বীরাজ আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। সংপ্রতি

দিল্লী হইতে এ দুঃখিনী কুমারী, মহারাণার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছে।—নাম যমুনা।

কিছুক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক্। মাথার উপর অনন্ত আকাশ, চারিপার্শ্বে ঘন গিরিশ্রেণী, পশ্চাতে নিবিড় বন। আর কেহ কোথাও নাই।

যে মূর্ত্তি বুক চিরিয়া যমুনার হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,——আহারে বিহারে, শয়নে, স্বপনে,——যে মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে বালিকা বাহ্যজগৎ ভুলিয়া গিয়াছে,——যে মূর্ত্তিকে এতদিন কেবল ছবিতে দেখিয়া এবং কল্পনা-নয়নে অবলোকন করিয়া, বালিকা আপনা-হারা হইয়াছে,—আজ সেই মূর্ত্তি স্বয়ং স্বশরীরে আবির্ভূত হইয়া,—তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, পার্শ্বে বসিয়াছে, এবং এই মুহূর্ত্তে স্বহস্তে তাহার মস্তক লইয়া আপন ঊরুদেশে স্থাপিত করিয়াছে!———এখন আবার যমুনা, তাহার সেই জীবনসর্ব্বস্বের সহিত একত্র এক সঙ্গে বসিয়া কথাও কহিল!———ভাবিতে ভাবিতে যমুনার বুকের ভিতর সমুদ্র-মন্থন হইতে লাগিল।

অমরের সেই রাজজনোচিত সুন্দর দেহ, উদ্দীপ্ত রূপশ্রী,——সে বিশাল বক্ষঃ, আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু—সেই দীর্ঘ কেশ, নবীন শ্মশ্রু, অপরূপ মুখাবয়ব দেখিয়া, যমুনা কৃতার্থ ও ধন্য হইল। অনিমেষ নয়নে বালিকা, কুমারের সেই রূপসুধা পান করিতে লাগিল। বুঝিল, ইনি সত্যই তাহার জীবনসর্ব্বস্ব,—কুমার অমরসিংহ!

তখন সেই নির্জ্জীব ছবির মূর্ত্তি বালিকার আর ভাল লাগিল না। চকিতনেত্রে ছবিখানি একবার দেখিয়া, যমুনা তাহা বস্ত্রাঞ্চলমধ্যে লুকাইল।

তখন একে একে সকল কথা হইল। কেন যমুনা সুদূর দিল্লী হইতে এখানে আসিয়াছে,—কেন পৃথ্বীরাজ একটিমাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে তাহাকে মহারাণার নিকট পাঠাইয়াছে,—কুমারের নিকট যমুনা সকল

কথাই ব্যক্ত করিল। বলিল না কেবল এই কথাটি যে, কেবলমাত্র ছবি দেখিয়াই, বালিকা সর্ব্বান্তঃকরণে কুমারকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে,—আর সেই জন্যই কুমারকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছে।

অবশ্য, অমরের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না! তিনি আর বেশী কিছু না বলিয়া, যমুনাকে পিতৃসন্নিধানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন।

এমন সময় সেই ভৃত্যও কিছু ফলমূল এবং পানীয় জল লইয়া, সেইখানে উপস্থিত হইল। সে ক্রমে ক্রমে কুমারের সকল পরিচয় পাইল। আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "মহাশয়কে যে এখানে দেখিতে পাইব, এমন আশা করি নাই। আমার প্রভু, মহারাণাকে একখানি পত্র দিয়াছেন। তাহাতে অনেক গোপনীয় কথা আছে। চলুন, তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। এদিকেও সন্ধ্যা হইয়া আসিল।"

তখন তিন জনে আরাবলীর সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কমলমীর অভিমুখে চলিল। যখন সেখানে উপস্থিত হইল, তখন দুই তিন দণ্ড রাত্রি হইয়াছে।

মহারাণা প্রতাপসিংহ, তদীয় ভক্ত পৃথ্বীরাজের পত্র পাঠ করিলেন। পত্রখানি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত লিখিত। পত্রের মর্ম্ম এই,—যমুনাকে নিরাপদে রক্ষা করিতে ও কুমারের সহিত তাহার বিবাহ দিতে, পৃথ্বীরাজ মহারাণাকে অনুরোধ করিতেছেন।

পৃথ্বীরাজ তাঁহার শ্বশুর শক্তসিংহকেও স্বতন্ত্র একখানি পত্র দিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্মও ঐরূপ।

পুণ্যবান্ প্রতাপ পৃথ্বীরাজের প্রথম অনুরোধ অম্লানবদনে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; কিন্তু দ্বিতীয় কথাটি রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব,——ভৃত্যকে স্পষ্টবাক্যে ইহা বলিলেন। বলিলেন, "তোমার প্রভুকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলিও যে, শরণাগতকে রক্ষা করিতে প্রতাপসিংহ চিরদিনই অভ্যস্ত। তাঁহার ভগিনী আমার আশ্রয়ে

আমার কন্যাবৎ রক্ষিতা হইবেন। পাপ মোগল কি কোন দুর্বৃত্তই এখানে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমার প্রভুর দ্বিতীয় অনুরোধটি আমি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিব না। ইহাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু উপায় নাই। কেন বা কি জন্য, ইহা তোমার প্রভু বুঝিবেন। আশীর্ব্বাদ করি, পাপ মোগলপুরী মধ্যে থাকিয়াও যতটুকু সাধ্য, তিনি জাতীয়ধর্ম্ম রক্ষা করুন এবং দেশেরও কাজ করুন। আমার লিখিতপত্রে তাঁহার অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাহা তিনিও জানেন। সেই জন্য পত্র দিলাম না,—তুমি গিয়া এই সকল কথা তাঁহাকে বলিবে। উপস্থিত এখানকার একরূপ মঙ্গল।”

পৃথ্বীরাজকে প্রতাপ বিলক্ষণ চিনিতেন। মোগল আশ্রয়ে থাকিলেও যে, পৃথ্বীরাজের অন্তর প্রকৃত হিন্দুভাবাপন্ন, এবং তাঁহাতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-রক্ত আছে, প্রতাপ ইহাও বিশ্বাস করিতেন। তথাপি, পৃথ্বীরাজ মোগলের বন্দী বলিয়া,—মোগলের সহিত একত্র বসবাস করেন বলিয়া,—মোগলের আব্‌-হাওয়া তাঁহার গায়ে লাগে বলিয়া,—ব্রতধারী ক্ষত্রিয় বীর প্রতাপ, ——কিছুতেই যমুনার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না। ভাবিলেন, “এই হিন্দুত্ব, আভিজাত্য এবং বংশাভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই আমি বনবাসী!——আজ কি বলিয়া অনুগতজনের মনস্তুষ্টির জন্য আমি সে ধর্ম্ম ত্যাগ করিব? না, অমরের সহিত পৃথ্বীরাজের ভগিনীর বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না। তবে বিপন্ন শরণাগতকে রক্ষা করা চিরদিনই হিন্দুর ধর্ম্ম;———যমুনাকে রীতিমত প্রায়শ্চিত্তাদি করাইয়া, অন্তঃপুরে স্থান দিব।”

তাহাই হইল। যমুনা প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া, সাদরে রাণার অন্তঃপুরে গৃহীতা হইলেন। প্রতাপমহিষী লছমীদেবী তাঁহাকে কন্যার ন্যায় আদর ও যত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হলদিঘাটের প্রথম যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় এবং শক্তের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন,—পাঠক পাঠিকা প্রতাপসম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত অবগত আছেন। অতঃপর প্রতাপ-ভাগ্যে আর কি হইল, এক্ষণে দেখা যাক্।

সম্রাট-তনয় সেলিম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আনন্দোল্লাসে দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে ঘোর বর্ষা আরম্ভ হইল। বর্ষায় দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশ অধিকতর দুর্গম ও দুরতিক্রমণীয় হইল। তখন আর মোগল তথায় আসিতে পারিল না। এদিকে সেই অবসরে প্রতাপ অবশিষ্ট রাজপুতবীরকে লইয়া, নবোৎসাহে পুনর্যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন।

গুপ্ত-চর দিল্লীতে গিয়া, এ সংবাদ সম্রাটকে জ্ঞাপন করিল। নব বসন্তের সমাগমে, মোগল পুনরায় অমিতবিক্রমে, প্রতাপের রাজ্য আক্রমণ করিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ, প্রতাপ এবারও পরাজিত হইলেন।

তারপর মোগল প্রতাপের নূতন রাজধানী কমলমীর অবরোধ করিল। রাজপুত বীরগণ এবার অদ্ভুত বিক্রমে মোগলের সে গতি রোধ করিলেন। তাহাদিগকে দলিত, মথিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। মোগল নিরুপায় হইয়া, লজ্জাবনত মুখে সেই নগর ত্যাগ করিবার উদ্যোগ

করিল। কিন্তু হায়! স্বজাতির বিশ্বাসঘাতকতায়, প্রতাপ জিত হইয়াও শেষে পরাজিত হইলেন।

মোগল যখন দেখিল, এবার রাজপুত জীবনপণ করিয়া রাজধানী রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে এবং প্রবল পরাক্রমে ও অদ্ভুত বীরত্বে তাহাদিগকে দলিত, মথিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে,—তখন তাহারা পলায়নপর হইল। শেষে মোগল-সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ এক ফন্দি ঠাওরাইল। এই রাজধানীর মধ্যে প্রতাপের গৃহশত্রু কে, তাহার সন্ধান লইল। হিংস্রক ও খল,—সংসারের সর্ব্বত্রই আছে। সাহাবাজকে বেশী সন্ধান করিতে হইল না—প্রতাপের হিংসায় জর্জ্জরিত এক কুটিলপ্রকৃতি রাজপুত আসিয়া, সাহাবাজকে প্রতাপবিজয়ের এক সহজ উপায় বলিয়া দিল। এই স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার,—আবুপতি দেবলরাজ।

পাপিষ্ঠ দেবলরাজ চিরদিনই প্রতাপের হিংসা করিত। প্রতাপের দিগ্বিজয়ী নাম ও জগৎজোড়া সম্ভ্রম,—এই দুর্ব্বৃত্ত রাজপুতের ভাল লাগিত না। বিশেষ, সেও নাকি একটি ক্ষুদ্র রাজা,—অথচ তাহাকে কেহ মানে না এবং ভয়-ভক্তি-সম্মানের চক্ষে কেহ তাহাকে দেখেও না,—ইহা তাহার বিশেষ দুঃখ। কোন কার্য্যে কিংবা কোন বিষয়ে তাহার আদৌ আধিপত্য খাটিত না,—ইহাতেও সে প্রতাপের উপর মনে মনে চটা—"কেন, আমিও যা, প্রতাপও তা;—তবে প্রতাপের এত বৃদ্ধি কেন?" হতভাগ্য এই রকম সব কুবুদ্ধি-কুচিন্তার প্রশ্রয় দিয়া, মনটাকে নরকতুল্য করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন সুযোগ পাইয়া ও অবসর বুঝিয়া, সহজেই সাহাবাজের সহিত মিলিত হইল এবং তাহাকে কুমন্ত্রণায় দীক্ষিত করিয়া এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করিল।

সাহাবাজ যখন দেখিল, সম্মুখযুদ্ধে এ যাত্রা কিছুতেই প্রতাপকে পরাজিত করা চলিবে না, তখন, পাপ দেবলরাজের পরামর্শানুযায়ী, সে এক মহাপাপে প্রবৃত্ত হইল।

কমলমীরে যতগুলি কূপ ও জলাশয় ছিল, সাহাবাজ সে সকলগুলিতেই,—একদিনে, এক সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন অনুচর দ্বারা, তাত্র হলাহল নিক্ষেপ করিল। একদিনেই কমলমীরের যাবতীয় জলাশয় বিষময় হইয়া উঠিল। সে জলে যে মুখ দিল, সেই মরিল। এক দিনে শত শত রাজপুত প্রাণ-ত্যাগ করিল। কেহ ত জানিতে পারে নাই যে, শত্রুগণ জলে বিষাক্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়াছে!

পানীয় জলাভাবে লোক কতক্ষণ তিষ্ঠিবে? প্রতাপ তখন অনন্যোপায়ে নগর ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র রাজপুত জন্মের মত কমলমীর ত্যাগ করিয়া চলিল। স্বজাতির এই ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায়, এই ভীষণ অধর্ম্মাচরণে, প্রতাপ মর্ম্মাহত হইলেন—তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি বুঝিলেন, পৃথিবীতে মানসিংহ একটি নাই! পাপ দেবলরাজ যে মানসিংহ হইতেও অধিক ভয়ঙ্কর জীব, তাহাও বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, এইরূপ অষ্টবজ্র একত্র হওয়াতেই রাজপুতের ভাগ্যলক্ষ্মী বিরূপা হইয়াছেন। বুঝিলেন যে, মোগল দেশ জয় করে নাই,—দেশের লোকেই দেশকে জয় করিয়া, বিদেশী বিধর্ম্মীর হস্তে তুলিয়া দিয়াছে! স্বজাতির এ দুর্গতি স্মরণ করিয়া, হৃদয়বান্ রাজপুত-কেশরী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্যোপায়ে প্রতাপ সাধের কমলমীর ত্যাগ করিলেন। যেখানে তিনি, কঠোর কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত ব্রত-পালন করিয়া, মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ দেখাইতেছিলেন;——যে স্থানে তিনি সাধের পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছিলেন,——মর্ম্মান্তিক মনোবেদনার সহিত প্রতাপ সেই কমলমীর ত্যাগ করিলেন। তখন আর মোগলের সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। একে ত অজ্ঞানতাবশতঃ বিষাক্ত জল পান করিয়া, শত সহস্র ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছে; তারপর যখন তাহা সকলে জানিতে পারিল; তখন জলের

অভাবে দেশময় হাহাকার উঠিল।——এমত অবস্থায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কোনরূপে সম্ভবপর নহে। অগত্যা, বীর প্রতাপকে, শেষে একরূপ বিনাযুদ্ধে, শত্রুহস্তে দেশ সঁপিয়া দিয়া যাইতে হইল।

নিরুপায় প্রতাপ তখন মিবারের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে, চপ্পন নামক পার্ব্বত্যপ্রদেশের অন্তর্গত চৌন্দ্‌নগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। "এই স্থান ভীলগণে পূর্ণ। বন্য-ভীলগণই এখন" প্রতাপের আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু এবং সহায়। কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ, এখানেও তিনি অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারিলেন না। দুর্দ্দান্ত মোগল এখানেও তাঁহার অনুসরণ করিল। প্রতাপের সহিত সেইখানে তাহাদের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। অমিততেজা, অতুল বলশালী রাজপুত-বীরগণ এই যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইলেন। কিন্তু হায়, বিধি বাম! প্রতাপপক্ষে শেষে পরাজয়ই হইল। একে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প, তাহার উপর নূতন স্থানে আসিয়া, সহসা যুদ্ধের সকল আয়োজন করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। মোগলের সৈন্যসংখ্যা অনেক অধিক, তার উপর তাহারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুতই ছিল;—কাজে কাজেই প্রতাপকে এবারও পরাজিত হইতে হইল।

কিন্তু এই পরাজয়ের মধ্যেও, প্রতাপপক্ষে দুইজন স্বদেশভক্ত বীরাগ্রগণ্যের কথা স্মরণ করিতেও চক্ষে জল আইসে। শোনিগড়রাজ ভানুসিংহ ও মিবারের রাজকবি জনৈক ভট্টচূড়ামণির স্বদেশ-প্রেমের কথা স্মরণ করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। এই দুই মহাপুরুষ, এই মহাযুদ্ধে স্বদেশবাসীগণকে যেরূপ অলৌকিক উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন, এবং শেষে যেরূপ অসাধারণ বীরত্বের সহিত জীবন আহুতি দিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—তাহা প্রকৃতই লোকবিস্ময়কর। বলা বাহুল্য, প্রিয় কবিকে এবং একজন প্রধান সহায়কে হারাইয়া, প্রতাপ যার-পর-নাই মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন।

দিন দিন প্রতাপের সৈন্যবল ও সহায়-সম্বল কমিতে লাগিল। দিন দিন

তাঁহার রাজ্যক্ষয় হইতে লাগিল। গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ, এক এক করিয়া অনেক যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। শেষ ধর্ম্মমতী ও গোগুণ্ডা ভিন্ন কোন স্থান তাঁহার অধিকারে রহিল না; কিন্তু সৈন্য অভাবে এই দুই স্থানও তিনি অধিক দিন রক্ষা করিতে পারিলেন না। এই সময়ে স্বদেশদ্রোহী মানসিংহ, যেন উপহাসচ্ছলে সসৈন্যে আসিয়া, প্রতাপের সেই অবশিষ্ট দুই নগরও অধিকার করিল। বড় দুঃখে প্রতাপ এ দৃশ্য দেখিলেন। হায়! দুর্জ্জয় কেশরী আজ দুরদৃষ্ট-বাগুরায় আবদ্ধ!

এত দিনে বিশাল মিবারে, সত্য সত্যই প্রতাপের মাথা রাখিবার স্থান রহিল না। রাজরাজেশ্বর আজ পথের ভিখারী,——ভীত, তাড়িত, সন্ত্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, বনচারী।——সহায় নাই, সম্বল নাই, আশ্রয় নাই, উপায় নাই,—কিছুই নাই। মুষ্টিমেয় ভক্ত ও বিশ্বস্ত অনুচর মাত্র,—মহারাণার সঙ্গের সাথী হইল! অর্থ ও সম্পদ্ অভাবে, প্রতাপ সৈন্যগণকে বিদায় দিয়াছেন। এখন আর তাঁহার বাসস্থানের কোন নিরূপিত স্থান নাই। যে দিন যেখানে যেমন ভাবে কাটিয়া যায়, সেই দিন সেখানে তেমনি ভাবে তিনি দিন অতিবাহিত করেন। অনন্যোপায়ে, পাছে এক্ষণে সেই পরিত্যক্ত অরণ্যময় উদয়পুরে গিয়া তিনি বাস করেন, এই জন্য মানসিংহের পরামর্শে, আকবর, মহব্বত খাঁকে সসৈন্যে সেই নগর অধিকার করিয়া থাকিতে বলিলেন। যেরূপে হউক, প্রতাপকে নত করাই আকবরের উদ্দেশ্য।—"কি এত বড় স্পর্দ্ধা! সকল রাজপুতই যখন আমার নিকট মস্তক অবনত করিল,—অম্বর, বিকানীর, মারবার, আজমীর প্রভৃতি সকলকেই যখন আমি যাদুমন্ত্রে বশীভূত করিলাম, তখন ঐ একমাত্র রাজপুতকে পরাভব স্বীকার করাইতে পারিব না? আচ্ছা দেখি, প্রতাপসিংহের তেজ আর কত দিন থাকে?" আকবর মনে মনে কেবল এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন এবং কথানুযায়ী কার্য্য করিতে,—প্রতাপকে অবনতি স্বীকার করাইতে, চারিদিকে অগণিত সৈন্য, চর প্রভৃতি নিযুক্ত করিলেন।

সর্ব্বান্তঃকরণে উৎসাহভরে বলিয়া দিলেন,—"যে ব্যক্তি প্রতাপকে বন্দী করিয়া দিল্লী আনিতে পারিবে, কিংবা যে কোন উপায়ে হউক, তাঁহাকে আমার অধীনতা স্বীকার করাইতে পারিবে, তাহাকে আমি এই বিশাল ভারত রাজ্যের এক দশমাংশ পুরস্কার দিব।"

রাজ্য-পুরস্কারের কথা শুনিয়া মোগলসৈন্যগণ প্রাণপাত করিয়া প্রতাপের অনুসরণ করিতে লাগিল। আশ্রয়বিহীন অসহায় প্রতাপ যখন যেখানে যান, মোগল কোন রকমে সন্ধান পাইয়া, অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু কি গুণে জানি না, প্রতাপ সর্ব্বসময়েই শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। মোগলগণ সর্ব্বত্রই তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল; দুর্গম অরণ্য, বিজন গিরি-গুহা, কিংবা উন্নত শৈলশৃঙ্গেও যদি প্রতাপ আশ্রয় লন,—মোগল পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া, সেখানেও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল;—ব্যাঘ্রের পশ্চাতে ফেরুপাল যেমন তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকে, আশ্রয়হীন প্রতাপের পশ্চাতে মোগলও সেইরূপ চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল;—কিন্তু কেহই তাঁহাকে ধৃত বা বন্দী করিতে পারিল না;—কেহই তাঁহাকে দিল্লীশ্বরের নিকট অবনত-মস্তক করাইতে সমর্থ হইল না। মোগলের সকল চেষ্টা, সকল যত্ন,—বিফল হইল। বাড়ার ভাগে, সময়ে সময়ে প্রতাপ, সেই মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া, এমনি সুকৌশলে ও অদ্ভুত পরাক্রমে গর্ব্বিত মোগল সৈন্যকে আক্রমণ করিতেন যে, তাহারা ব্যাঘ্রতাড়িত মেষপালের ন্যায় কে কোথায় উধাও হইয়া পলাইত। কখন বা তিনি সেই মুষ্টিমেয় অনুচর সাহায্যেই শত শত মোগলের প্রাণনাশ করিয়া, তাহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা ও ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল দিতেন।

প্রতাপের শেষ আশ্রয়—চৌন্দ্ নামক স্থান অধিকার করিয়া, যে মোগল-সেনাপতি মনে মনে বড়ই গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনিই এ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ। তাঁহাকে শেষ নাজেহাল হইয়া দোকান-পাট গুটাইয়া

দিল্লী উঠিতে হইয়াছিল। বস্তুত প্রতাপ, সেই প্রিয় ভীলদিগের আবাস স্থান, পুনরায় একরূপ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। প্রতাপের সেই মুষ্টিমেয় অনুচরের শাণিত কৃপাণে এবং ভীলদিগের সেই অব্যর্থ ধনুর্ব্বাণে—মদোন্মত্ত মোগলসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন ও পলায়নপর হইল। সেই সময়ে আবার বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারা পতিত হওয়ায়, তাহারা বাধ্য হইয়া সেই নগর ত্যাগ করিল। প্রতাপ পুনরায় কিছুদিন নিষ্কণ্টকে, সেই বন্য ভীলগণের সহিত বসবাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু স্বস্তি বা শান্তি,—তাঁহার আর কিছুতে নাই। বলিয়াছি ত, মোগল-সম্রাট দৃঢ়পণ করিয়া বসিয়াছেন,—যেরূপে হউক, প্রতাপকে পরাভব স্বীকার করাইয়া অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। তাই লোকের পর লোক, সৈন্যের পর সৈন্য, সেনাপতির পর সেনাপতি, যুদ্ধোপকরণের পর যুদ্ধোপকরণ,—অজস্ররূপে আরাবলীর চতুষ্পার্শ্বে পাঠাইতে লাগিলেন। বর্ষা অন্তে বসন্তের সমাগমে পুনরায় মোগল নবোৎসাহে মাতিল। পঙ্গপালের ন্যায় চারিদিক হইতে প্রতাপকে ঘেরিল। সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত, নির্ব্বীর্য্য ও নত করিয়া বন্দী করিতে সমুৎসুক হইল।

কিন্তু এ আশা মোগলের দুরাশা মাত্র। প্রতাপকে নত বা বন্দী করা, মনুষ্যের সাধ্য নয়! তবে এই সময় পুনরায় প্রতাপকে চৌন্দনগর ছাড়িয়া, অনির্দ্দিষ্ট গহন বনে, বিজন গিরি-গুহায়, কখন বা উচ্চ শৈলশৃঙ্গে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল! রাজরাজেশ্বর মিবারপাতর এ সময়ের কষ্ট ও দৈন্য-দুর্দ্দশার আর অবধি ছিল না। কিন্তু সেই দৈন্য-দুর্দ্দশার মধ্যেও তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব অধিকতর প্রস্ফুটিত। তবে তাঁহার অপোগণ্ড শিশুসন্তান ও দুর্ভাগ্য পরিবারবর্গ এই সময় তাঁহার কালস্বরূপ হইয়াছিল। সেই কথাই এখন বলিব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিশাল মিবার প্রতাপের হস্তচ্যুত হইল। সকল নগর, সকল দুর্গ, সকল গিরি-গহন,—তিনি হারাইলেন। আশ্রয়হীন, সহায়হীন, সম্বলহীন হইয়া,—কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মন উদাস, প্রাণ শূন্যময়, জীবন ভারবহ,—গভীর বিষাদে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল।—শান্তি, সুখ, আশা, ভরসা,—কিছুই রহিল না।—রহিল কেবল অন্তর্ব্যাপিনী স্থিরদৃষ্টি, উন্নত লক্ষ্য, উদার স্বদেশ-ভক্তি, উদ্দাম কল্পনা এবং অপূর্ব্ব আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান।

কিন্তু হায়! তাঁহার অপোগণ্ড শিশুসন্তান ও দুর্ভাগ্য পরিবারবর্গই এ সময় তাঁহার কালস্বরূপ হইল। আত্মপরিবার ছাড়া অনেকগুলি অপোষ্য-কুপোষ্যও তাঁহার গলগ্রহ হইয়াছিল। তাহারা ছায়ার ন্যায়, প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। একে পশ্চাতে বিজয়ী মোগলের গর্ব্বিত হুঙ্কার,—একে তাহারা সর্ব্বদাই প্রতাপের অনুসরণ করিয়া, তাঁহাকে বন্দী করিতে সচেষ্ট; তাহার উপর এই দুর্ভাগ্য জীবগণ সদাই আকুলি ব্যাকুলি করিয়া, গলাগলি হইয়া, প্রতাপের পাছু পাছু ফিরিতেছে। তাহাদিগের ভরণ-পোষণ, পর্য্যবেক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ,——সমস্তই প্রতাপকে করিতে হইতেছে। ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, পীড়াকালে পরিচর্য্যা,—

তাহাদের যাবতীয় অভাব আজ প্রতাপকে স্বয়ং সম্পূরণ করিতে হইতেছে! হায়! সে দিন ত আর নাই। সে লোক-বল, সহায়-সম্বল, রাজ্যসম্পদ,—কিছুই ত আর নাই। কাজেই অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বরকে,—মিবারের রাজচক্রবর্ত্তীকে, আজ স্বয়ং সামান্য গৃহস্থের ন্যায়, এই সকল তুচ্ছ সাংসারিক খুঁটিনাটী লইয়া, দিন কাটাইতে হইতেছে।

কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তির ন্যায়, সেই সুখ-শান্তিই বা মহারাণার কোথায়? গৃহস্থ ব্যক্তি ত তাহার ক্ষুদ্র জীবনের সুখদুঃখ, হাসি-কান্না লইয়া এক প্রকারে দিন কাটাইয়া যায়!—প্রতাপের ন্যায় ব্যক্তির সেরূপে দিন কাটাইবারই বা সম্ভাবনা কোথায়? বিশ্বগ্রাসিনী যাহার ক্ষুধা, অনন্ত যাহার আকাঙ্ক্ষা, সুদূরগামিতা যাহার লক্ষ্য, জীবনসংগ্রাম যাহার ধর্ম্ম,——তাহার জীবনের সুখ বা দুঃখ, হাসি বা কান্না,—কিরূপে সাধারণ সংসারী লোকের সহিত তুলনীয় হইবে? নিদাঘ-তাপিত পথিকের পক্ষে বটচ্ছায়া, সুশীতল পানীয় জল এবং কোমলশয্যা,—যথেষ্ট বটে; কিন্তু আজীবন যে, তুষানল বুকে বহন করিতেছে,—জীবনের অতি-উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে না পারিয়া, যে,—তৃষিত, তাপিত, ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়া জীয়ন্তে মরিয়া আছে, তাহার জুড়াইবার স্থান কোথায়? ভীষ্মের পিপাসা,—পানপাত্রস্থ পরিমিত জলে পরিতৃপ্ত হইবার নহে,——পরন্তু তাঁহার সেই অন্তিমের পিপাসা মিটাইতে হইলে, অর্জ্জুনের ন্যায় বীরাগ্রগণ্যকে, ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া মর্ত্ত্যে ভোগবতীকে আনিতে হয়!

জননী-জন্মভূমির স্বাধীনতারক্ষায়-আত্মোৎসর্গকারী, মহাপ্রাণ প্রতাপের সুখশান্তির যে তৃষ্ণা, তাহাও ঐ ভীষ্মের পিপাসার সমতুল্য;——ক্ষুদ্র গৃহস্থ ব্যক্তির সুখদুঃখের সহিত তাঁহার সুখ-দুঃখের মাত্রা, কিরূপে অবধারিত হইবে?

তথাপি হায়! সেই ক্ষুদ্র গৃহস্থ ব্যক্তির যাহা আছে, প্রতাপের আজ তাহাও নাই। গৃহস্থ ব্যক্তির পরিবার ভরণপোষণের যথাসাধ্য সঙ্গতি

আছে, প্রতাপের তাহাও নাই। গৃহস্থ ব্যক্তির মাথা ফেলিয়া থাকিবার একটা আশ্রয় আছে, প্রতাপের তাহাও নাই। গৃহস্থ ব্যক্তির সুখদুঃখে সহানুভূতি করিবার সংসারের আর দশ জন লোক আছে,—প্রতাপ আজ সেই দশ জন হইতেও বঞ্চিত। হায়! তাঁহার অবস্থার সমতা, আজ কাহার সহিত হইবে?——ভিক্ষুক?—সেও আজ প্রতাপ অপেক্ষা সুখী! প্রতাপের সেই সমুদ্রতুল্য হৃদয় যে, আজ কিরূপ আলোড়িত হইতেছে, তাহা কেবল তিনিই বুঝিতেছেন।

সত্য,—দুর্ভাগ্য পরিবারবর্গই আজ প্রতাপের কালস্বরূপ হইল! তাহাদিগকে কোথায় রাখিবেন, কি খাওয়াইবেন,—শত্রুর আক্রমণ হইতে কিরূপে তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন,——এই ভাবনাতেই প্রতাপ অস্থির হইলেন। এই ভাবনাই এখন তাঁহার প্রধান ভাবনা হইল। বিশেষ তাঁহাকে দুই দণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়া, একস্থানে থাকিবার যো নাই।——"ঐ মোগল আসিল, ঐ ধরিল, ঐ তাড়া করিল, ঐ পরিবারদিগের সম্ভ্রম নষ্ট করিল,"——এইরূপ দুশ্চিন্তা তাঁহাকে অধীর, অস্থির, উন্মত্ত করিয়া তুলিল। বস্তুতঃ, মোগলও শেষে এই হীন পন্থাই অবলম্বন করিল। তাহারা ভাবিল, "যখন প্রতাপকে কিছুতেই ধৃত বা অবনত করিতে পারিতেছি না, তখন উহার পরিবারবর্গের কাহাকেও বে-ইজ্জৎ করিতে পারিলেও, কতকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়।" বিশাল মিবারমধ্যে প্রতাপ যে, এখন কোথাও নিরাপদে আশ্রয় পাইবে না, এবং তাঁহাকে আশ্রয় দিতে, কেহ যে, সহসা সাহসও করিবে না,—মোগল তাহা বুঝিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, এ বিপদের দিনে, প্রতাপও আত্ম-পরিবারবর্গ ফেলিয়া, একাকী কোথাও যাইতে পারিবে না,—বিড়াল-শিশুর ন্যায় অপোগণ্ড সন্তানগণ তাঁহার মুখে মুখে ফিরিবে। ভিখারিণীর ন্যায় তাঁহার পত্নীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিবে। অপোষ্য কুপোষ্য অন্যান্য স্ত্রীপুরুষও দুর্ভাগ্য-সহচর-স্বরূপ প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিবে। বুঝিয়াছিল, দারিদ্র্যরূপ বিধাতার এই

নিষ্ঠুর অভিসম্পাতের দিনে, এইবার তাহারা প্রতাপকে অবনত বা বন্দী করিবে। বুঝিয়াছিল, এতদিনে তাহারা প্রতাপবিজয়ে পূর্ণমনোরথ হইয়া, দিল্লীশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে।

তীক্ষ্ণদর্শী প্রতাপও ইহা বুঝিলেন। বুঝিলেন, এতদিনে বিধাতা সত্য সত্যই তাঁহার প্রতি বাম হইয়াছেন। বুঝিলেন, দুর্ভাগ্য পরিবারবর্গ হইতেই বা তাঁহার জীবনব্রত ভঙ্গ হয়। বুঝিলেন, দারিদ্র্যের এই ঘোর নিষ্পেষণের দিনে, বুঝি বা তাঁহার ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব লোপ পায়।——দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য ও মর্ম্মবেদনায় তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

ক্রমে দুর্ভাগ্য চরম মাত্রায় উঠিল। এখন আর সকল দিন সামান্যমাত্র আহারও জুটে না। অপোষ্য-কুপোষ্যগণ আর তাঁহার গলগ্রহ হইতে সাহসী হইল না।—যে যার পথ দেখিল। ভক্ত অনুচর কয়জন, দিনান্তে অতি কষ্টে, কোনরকমে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, রাজা ও রাজপরিবারদিগকে খাওয়াইতে লাগিল। দুর্ভাগ্য পরিবারগণ তাহাতেই প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া রহিল।

হায়! খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিবারই বা উপায় কৈ? মোগল যে, সমগ্র আরাবলী পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতেছে;—কোথায় রাণা প্রতাপ-সিংহ,—কোথায় তাঁহার দুর্ভাগ্য পরিবারবর্গ!

রাজরাজেশ্বর প্রতাপ আজ ভিখারীর বেশে স্ত্রীপুত্রকন্যার হাত ধরিয়া, বন হইতে বনান্তরে, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে,—চোরের ন্যায় লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়ত কষ্টে, কতকগুলি কটুতিক্তকষায় বন্যফল লইয়া, এক বৃক্ষতলে কিংবা পর্ব্বতকন্দরে বসিয়া ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময় এক অনুগত সর্দ্দার বা ভক্ত ভীল আসিয়া সংবাদ দিল,—"মহারাণা! পলান্, পলান্,—শত শত মোগল যোদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া এই দিকে আসিতেছে;—তাহারা সন্ধান পাইয়াছে

যে, আপনি সপরিবারে এইখানে বিশ্রাম করিতেছেন।”—অমনি সেই অর্দ্ধ ভক্ষিত ফলমূল ফেলিয়া, স্ত্রীকন্যার হাত ধরিয়া, ক্ষিপ্রগতিতে বনান্তরে গিয়া নিবার পতি লুক্কায়িত হইলেন। কোন দিন বা তিনি এক অতি দুর্গম গিরি-গুহায় সপরিবারে সারাদিন উপবাসী হইয়া লুকাইয়া আছেন;—ক্ষুধাতুর সন্তান অনাহারে ধুঁকিয়া পড়িয়াছে; পিপাসায় নিজেদের বুকের ছাতি ফাটিতেছে; সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছেন,—কতক্ষণে কোন অনুচর কিছু খাদ্য-জল সংগ্রহ করিয়া আনিবে। এমন সময় হয়ত কোন ভীল কিছু মৃগ বা বরাহমাংস এবং একটু পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহা দেখিয়া রাজদম্পতী কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহাকে কতই সাধুবাদ করিলেন। তারপর সেই গহ্বরে তৃণপত্র সংগ্রহ করিয়া, অগ্নি জ্বালিয়া সেই মাংস রন্ধনও করিলেন। হয়ত অন্ন নাই, সেই মাংসমাত্র ভরসা,—তাহাই সন্তানগণকে দিয়া,—রাজদম্পতী আহারের উদ্যোগ করিয়াছেন, এমন সময় 'দীন্ দীন্' রবে শত শত মোগল আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল।——রাজদম্পতী তখন সেই সারাদিন বুবুক্ষার সম্বল ফেলিয়া, অপোগণ্ড সন্তানগণের সেই অপ্রক্ষালিত হাত ধরিয়া, কোন রকমে গহ্বরের ভিতর দিয়া গহ্বরান্তরে গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। আর ওদিকে কিছুক্ষণ হাঁক-ডাক, ধর-মার করিয়া, মোগল বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল।

এমন এক আধ দিন নহে,—এক আধবার নয়, অনেক দিন এবং অনেক বার এমন ঘটনা ঘটিল। অনশন, উৎকণ্ঠা, দারিদ্র্য-দুঃখ,—তিনের পূর্ণ প্রকোপ হইল। তিনে মিশিয়া এক জলন্ত আগুনের সৃষ্টি করিল। সেই আগুনে মহারাণা অহরহ পুড়িতে লাগিলেন। দিনের পর দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল,—কত ঋতু যাইল ও আসিল,—প্রতাপের দুঃখের আর অবসান হইল না;—দুঃখ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দারিদ্র্য সহস্র-প্রকারে আপন করাল ভ্রূকুটী দেখাইল। নয়নাভিরাম, মায়ারপুত্তলি শিশু কন্যাগুলি, অনাহারে প্রতাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল,—তথাপি

মহাপ্রাণ প্রতাপ ব্রতচ্যুত হইলেন না। অনাহার, অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তায় মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল, তথাপি পুণ্যবান্ প্রতাপ শত্রুর নিকট মাথা নোঙাইলেন না। মোগলের গুপ্ত-চর আসিল, গুপ্তভাবে প্রতাপের দুঃখ-দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিল, সম্রাটকে জানাইল, সম্রাট উত্তর দিলেন—"মহারাণা একবার বলুন, 'আর না, হারি মানিলাম, সন্ধি চাই',—আমি এখনই তাঁহাকে সসম্মানে সমগ্র মিবার ফিরাইয়া দিব।" চর ফিরিল, বহু কষ্টে প্রতাপের সন্ধান পাইল, আত্মপরিচয় দিল, কাঁদিতে কাঁদিতে সম্রাটের শেষ কথা জানাইল,——পুণ্যশ্লোক প্রতাপ মাথা নাড়িলেন, চরকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিলেন।

চর সত্যই কাঁদিয়াছিল। যখন গুপ্তবেশে প্রতাপকে দেখে, তখনও কাঁদিয়াছিল; যখন প্রকাশ্যভাবে তাঁহার নিকট যায়, তখনও কাঁদিয়াছিল। এ ক্রন্দন কেন? দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া কি?—না। সংসারের পনেরো আনা লোকই ত দুঃখী;——সেজন্য কাঁদে কে? চরের অশ্রু সেজন্য নহে,—প্রতাপের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের গভীরতা দেখিয়া,—ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, সে কাঁদিয়াছিল। সেই জন্যই তাহার হৃদয় দ্রব হইয়াছিল। মনুষ্যপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক ধাতুতে গঠিত। মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের নিকট মানুষ চিরদিনই নত হয়। অবস্থাবিশেষে আপন অসারতা বুঝিয়া, অশ্রুবিসর্জ্জনও করিয়া থাকে।

চর কাঁদিল, প্রতাপের কিন্তু তাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য হইল না। সর্দ্দার-গণের কেহ কেহ প্রতাপের মুখপানে চাহিলেন,—অন্তর্যামী মহাপুরুষের ন্যায়, প্রতাপ সর্দ্দারগণের অন্তর বুঝিয়া, মুখে একটু বিরক্তিভাব দেখাইলেন। কুমার অমরসিংহ দীননয়নে পিতার সম্মতিসূচক কথা শুনিবার আশায় দাঁড়াইলেন; প্রতাপ অমরের প্রতি একটা তীব্র ভ্রুকুটী করিলেন। চর আনুপূর্ব্বিক সকলই দেখিল, বুঝিল,—প্রতাপের মহত্ত্বে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া ফিরিয়া গেল।

তখন অন্যান্য সকলের হৃদয়ও কেমন হইয়া গেল। সকলে বিস্ময়ে রাণার পানে চাহিয়া রহিল।

গম্ভীর প্রতাপ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—

"সর্দ্দারগণ! একি!—তোমরা আমাকে নীরবে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করিতেছিলে? ইহারই নাম কি মনুষ্যত্ব? ইহারই নাম কি ব্রতপালন? তবে আর কিরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব? যিনি মায়ার খেলা খেলিতে খেলিতে আমাদিগকে এই দশায় ফেলিয়াছেন, তিনিই আজ চরের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদের মন জানিতে আসিয়াছিলেন।——নচেৎ মোগল-চর আমার দুঃখ-দুর্দ্দশায় কাতরপ্রাণ হইয়া কাঁদিবে কেন?——নচেৎ দিল্লীশ্বরই বা সহসা এ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবেন কেন? মানুষের মন তিনিই পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। যিনি এই চর ও দিল্লীশ্বরের মন পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, ইচ্ছা হয় ত, সেই ইচ্ছাময় একদিন আমার আজীবন-সঞ্চিত আশাও ফলবতী করিবেন। অতএব, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহারই উপর নির্ভর করিব। তোমরা মুখে কিছু না বলিয়াও যে, মনে মনেও আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে পরামর্শ দিতেছিলে, এই পাপের জন্য মনে মনে অনুতাপ করিও।——আর অমর, তুমি না আমার পুত্র?"

কুমার মহা অপরাধীর ন্যায় কম্পিত অন্তরে ভূমিপানে চাহিয়া রহিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এমন সময় দিক্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া, কোকিলের পঞ্চম-স্বরে সুমধুর-কণ্ঠে কে গায়িল,—

সাধে কি পুজি গো আমি, সেই পদ-কোকনদ।
মরতে দেবতা যিনি,—স্বদেশ যাঁর সম্পদ।
স্বাধীনতা ব্রত লাগি, হ'য়েছে যে সর্ব্বত্যাগী,
জন্মভূমি-অনুরাগী—বেষ্টিত মহাবিপদ।

সকলে একাগ্রমনে এই গান শুনিল। সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। গানের অর্থ সকলে বুঝিল। যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এই গান গীত হইতেছে, তিনিও বুঝিলেন।

কিছুক্ষণ সকলে নীরব। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রতাপ বলিলেন,—

"হায় পৃথ্বীরাজ! আজিকার দিনে যদি তোমাকে পাইতাম!"

পরে সকলের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "বিকানীর-রাজ পৃথ্বীরাজ বন্দীদশায়ও এই গান রচনা করিয়া আমাকে উপহার পাঠাইয়াছেন। তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনী আমাকে উদ্দেশ করিয়া, এই গান গায়িলেন। বালিকার গলাটি বড় মধুর।"

সেই সুধাস্বর আবার চলিল। যমুনা পুনরায় গায়িল,—

ধিক্ ধিক্ তারে, সেই কুলাঙ্গারে,
স্বদেশের বুকে যে মারে ছুরি।
মনে চোক ঠেরে, পরকে বিলায়,
আপনার ধন করিয়ে চুরি!

প্রতাপ সদুঃখে মনে মনে বলিলেন, "আপন ধন চুরি করিয়া পরকে দেয়ই বটে!——হা মোহাচ্ছন্ন জীব! তোমরা যদি স্বদেশের বিরুদ্ধে অসি উত্তোলিত না করিতে!"

যমুনা আবার গায়িল,—

সবাই গিয়েছে, ভেসে কালস্রোতে,
একজন শুধু আছে গো বেঁচে;
তারি গুণ গাই, কাঁদিয়ে সদাই,
আমার জনম হ'য়েছে মিছে।

প্রতাপ বলিলেন, "হায় স্বদেশভক্ত কবি! বন্দীদশায়ও তোমার প্রাণে এই স্বদেশভক্তি জাগিয়া আছে? না, তোমার জন্ম মিথ্যা হয় নাই,—তুমিই যথার্থ স্বদেশভক্ত! মিবারের অদৃষ্ট মন্দ, তাই তোমার ন্যায় সুসন্তান আজ মোগলের বন্দী!"

যমুনা আবার গাহিল,—

তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি গো আমার,
জীবন-আদর্শ দেব,—প্রীতির আধার।
শিখালে স্বজাতি-প্রীতি,—মূঢ়জনে মহামতি,
তব পদে পুষ্পাঞ্জলি,—দিই বার বার।

গান গায়িতে গায়িতে যমুনা প্রতাপের সম্মুখে আসিল। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পুনরায় গায়িল,—

তুমি আশা, তুমি-আলো, মিবারের মহাবল,
তুমিই রেখেছ শুধু ক্ষত্রিয়-আচার!
তোমার মহিমা-গান গায়িবে সংসার॥

গান সমাপনান্তে যমুনা কহিল, "পিতঃ! আজ অন্তরাল হইতে যে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলাম, ইহা আমার অন্তরে চিরকাল মুদ্রাঙ্কিত হইয়া থাকিবে। দেব! সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন,—সার্থক ব্রত পালনও করিতেছেন। আমার দাদা সত্যই কহিয়াছেন,—'মহারাণা মনুষ্যবেশে দেবতা'। দেবদর্শনে আমি ধন্য হইয়াছি,—দেবতার কার্য্যাবলী দর্শনে ততোধিক ধন্য হইয়াছি।

"আমার দাদা বলিয়া দিয়াছেন, মহারাণা যখন বড় দুঃখে কাতরপ্রাণ হইবেন, তখন তুমি আমার এই গান শুনাইয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে। —পিতঃ! তাই আজ এ গান গায়িলাম,—কন্যার অপরাধ লইবেন না।"

প্রতাপ। যমুনে, তোমার গানে আমি বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছি। তবে আত্মপ্রশংসা স্বকর্ণে শুনিতে নাই। তোমার মনের ভাব মনেই থাক্। তোমার দাদাকে আমি অনেক দিন হইতে জানি; তোমাকেও জানিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক।

যমুনা। পিতঃ! আমার মঙ্গল?——

তীক্ষ্ণদর্শী প্রতাপ বুঝিলেন, যমুনা অন্তরের অন্তর হইতে এই প্রশ্ন করিয়াছে। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে বড় শক্ত। মনে মনে ভাবিলেন, "আহা, বালিকার সকল সাধ অন্তরে উঠিয়াই অন্তরে লীন হইবে! কিন্তু আমি কি করিতে পারি? স্নেহ ও করুণা,—খুব ভাল জিনিস, সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্ম তাহা অপেক্ষাও উচ্চ বস্তু। সেই ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া আমি স্নেহ ও করুণায় আবদ্ধ হইতে পারি না।—যমুনা যখন দীর্ঘকাল মোগলসংস্রবে ছিল, তখন আমি কিছুতেই তাহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। না, অমরের সহিত তাহার বিবাহ হওয়া অসম্ভব।"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "হাঁ যমুনে, তোমারই মঙ্গল। ভগবৎ-চরণে আত্মসমর্পণ কর,—ইহ-পরকালে সুখী হইবে।"

বুদ্ধিমতী যমুনা মনে মনে বলিল, "ঠিকই উত্তর হইয়াছে। তবে আমার ভগবান্,—কুমার অমরসিংহ; ইহ-পরকালও তিনি। মনে মনে তাঁহার চরণে অনেকদিন আত্মসমর্পণ করিয়াছি। ইহ-জীবনে তাঁহার দাসী হইতে না পারি, জন্মান্তরে অবশ্যই হইব,——সেই আশায় বাঁচিয়া আছি। চক্ষু ভরিয়া ত তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি,—ইহাই যথেষ্ট। এ সৌভাগ্যও সকলের হয় না।——হা হতভাগ্য মোগল!"

যমুনার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল; কণ্ঠ গদগদ হইল। সেই অশ্রুসিক্ত চক্ষে, সেই গদগদ কণ্ঠে, প্রতাপের মুখপানে চাহিয়া, বালিকা গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল,—

(দীনে) দয়া করো, ভগবান্।
তোমারি চরণে, জীবনে মরণে,
সঁপে রাখি যেন প্রাণ॥
তরঙ্গ-তুফানে ভাসিয়ে না যাই,
তুমি ধ্রুবজ্ঞানে জীবন কাটাই,
ক্ষুদ্র সুখদুখ তোমারে জানাই,
যা করো তুমি বিধান॥

প্রতাপ মনে মনে বলিলেন, "আহা! বালিকা, বালিকা,—কোমল-হৃদয়া বালিকা! সম্মুখে বিশাল কাল-সমুদ্র রহিয়াছে,—ক্ষীণপ্রাণা বালিকা, কিরূপে সে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে? আর পৃথ্বীরাজেরই বা এত আশায়——ওকি, মন! আবার তুমি দয়ায় আর্দ্র হইবার উপক্রম করিতেছ? চিরদিন কঠিন থাকিও। কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, চিরদিন তোমাকে কঠোর থাকিতে হইবে। কি, মুসলমান সংস্রবে যার দীর্ঘকাল কাটিয়াছে, সেই আবার পুত্রবধূ হইবে?—অসম্ভব, অসম্ভব!"

যমুনার সেই কোমল করুণস্বর তখনও সেই স্থান কোমল—করুণাপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। গানের সেই শেষ রেশটা তখনও চারিদিক কাঁপাইয়া রাখিয়াছিল। যদি কেহ ভাবের কাণ লইয়া শুনিতে পার, তবে এখনও শুন,—অতি কোমল, অতি করুণ, অতি মর্ম্মস্পর্শী স্বরে, সেই স্থানে গীত হইতেছে,—

'যা করো তুমি বিধান।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, অমর মনে মনে বলিলেন,—

"হায়! এ বিধান কে করিবে?—ভগবান্? কিন্তু যমুনার ভগবান্ কে? কাহাকে উদ্দেশ করিয়া, যমুনা এ গান গাহিল?———একি, হৃদয়-নদী উথলিয়া উঠিল যে! না, পিতৃদেবের সম্মুখে আর বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়,—এখনি ধরা পড়িতে হইবে। হা প্রেমময়ী বালিকে! কেন তুমি এ নিষ্ঠুরকে এত ভালবাসিয়াছিলে?"

টপ্ টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা গরম জল, অমরের চক্ষু হইতে পড়িল। অমর, যেন চক্ষে কি পড়িয়াছে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া, কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন, এবং সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।
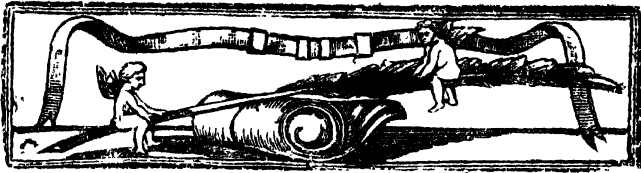
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্ভাগ্যের চরমশিখরে উঠিয়াও প্রতাপ মনুষ্যত্ব হারাইলেন না,—বরং এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রকটিত হইল। অনাহারক্লিষ্ট সোণারচাঁদ শিশুগুলির মলিন মুখ, মহিষীর সে ভিখারিণীর বেশ, নিজের সেই অনন্ত অভাব,—কিছুতেই প্রতাপকে টলাইতে পারিল না। চিত্তের সেই অপূর্ব্ব দৃঢ়তা ও সংযম, সেই অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়, সম্পদে বিপদে সেই প্রকৃত বীরত্ব,—পুরুষত্বের পূর্ণ অধিকারী, পুণ্যবান্ প্রতাপের তৎকালীন অবস্থা স্মরণ করিলেও পুণ্যের সঞ্চার হয়। যোগী যোগবলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ করেন; আর সংসারী প্রতাপ স্ত্রীপুত্রাদির মায়াজালে আবদ্ধ থাকিয়াও, জীবনকে যোগময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। পুরুষসিংহ মহাপুরুষগণ এই ভাবেই ধরাধামে বিচরণ করিয়া—বিষয়ভেদে, নানা পন্থায়, জগতে জ্ঞানা-লোক বিতরণ করিয়া থাকেন।

প্রতাপের এই যে দারিদ্র্যদুঃখ, ইহা বড় সহজ জিনিস নয়,—উপেক্ষার জিনিসও নয়। দারিদ্র্য-দুঃখেই মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা হয়। আগুনে পোড় খাইয়া, যেমন সোণার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়, দারিদ্র্যরূপ মহা অগ্নিতে পোড় খাইতে খাইতে সেইরূপ মনুষ্যত্বেরও পরীক্ষা হইয়া থাকে। প্রতাপের এ পরীক্ষা চরম মাত্রায় হইতেছে। যতদূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে

শুধু মনুষ্যত্ব কেন,—দেবত্বের উচ্চ শিখরেও প্রতাপকে দেখিতে পাই। এবং দেখিয়া,—বিস্ময়ে, আনন্দে ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।—বেশী নয়, একটিমাত্র মুখের কথা—একবারমাত্র ইঙ্গিতে আকবরকে বলা,—'আর নয়,—হারি মানিলাম';—তাহা হইলেই, তিনি যাহা ছিলেন, তাহা অপেক্ষাও ঐশ্বর্য্যশালী হন;—যাহা চান, তাহাই পান!—কিন্তু কৈ, দুরদৃষ্টের নির্ম্মম কষাঘাতে নিষ্পেষিত হইয়াও ত তিনি তাহা বলিতে পারিতেছেন না? নিদারুণ দুঃখে কণ্ঠাগত ও দীর্ণ-প্রাণ হইয়াও ত তিনি সে কথা মুখে আনিতে পারিতেছেন না! উপযাচক হইয়া মুখ ফুটিয়াও সে কথা মুখে বলিবার আবশ্যক নাই,—একবার আকার-ইঙ্গিতে কোনরকমে তাহা প্রকাশ করুন;—চরের স্পষ্ট প্রস্তাবে একবার সায় দিন;—তাহা হইলেই যথেষ্ট হয়! কিন্তু কৈ, প্রতাপ ত তাহা করিলেন না;—একবার 'হাঁ' বলিলেন না। কিংবা ঘাড় নাড়িয়াও সম্মতিলক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। বরং বিরক্ত হইলেন, ক্রুদ্ধ হইলেন,—যাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে "হাঁ"র পক্ষ ছিল, তাহাদিগকে বেশ দু'কথা শুনাইয়াও দিলেন।

এমন ঘটনা ঘটিয়াছিল কি একদিন? যে কারণে হোক, মধ্যে মধ্যে আকবর এইরূপ গুপ্তচর পাঠাইতেন এবং নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া প্রকারান্তরে প্রতাপকে সন্ধিপ্রার্থনায় ইঙ্গিত করিতেন। কিন্তু বৃথা আশা! ——'কি, সন্ধিপ্রার্থনা? পরাভব স্বীকার? শত্রুর অনুগ্রহলাভ? মোগলের দানগ্রহণ?——হৃদয়-সমুদ্র মথিত করিয়া, নাদস্বরে অন্তরে অন্তরে, প্রতাপ এই কথা বলিতেন।—অথচ এদিকে তখন তাঁর অবস্থা কিরূপ?—না প্রাণাধিক দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলি ক্ষুৎপিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া, তাঁহার গলা ধরিয়া কঁাদিতেছে!——এমন এক আধ দিন নয়, দুই দশ দিন নয়,—দীর্ঘকাল ধরিয়া, কত বর্ষ ধরিয়া, দুর্ভাগ্যের এই চরম যন্ত্রণা তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

তাই বলিতেছিলাম, মনুষ্যত্বের চরম আদর্শে কেন,—দেবত্বের উচ্চ

শিখরেও প্রতাপকে দেখিতে পাই, এবং দেখিয়া,—বিস্ময়ে, আনন্দে ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।

অধিক কি, বিধর্ম্মী চিরশত্রু মোগলও এই সময় হইতে প্রতাপকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। প্রতাপের এই অপূর্ব্ব মনুষ্যত্ব ও ব্রতপালন দেখিয়া গুণগ্রাহী আকবর এই সময় স্বয়ং প্রতাপ সম্বন্ধে একটি শ্লোক রচনা করেন সে শ্লোকের মর্ম্ম এই ;—'এ সংসারে সকলই নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর ; কেবল কীর্ত্তি ও সুনামই চিরস্থায়ী। মিবারের রাণা প্রতাপসিংহই ধন্য ; এত দুঃখেও তিনি ধর্ম্মচ্যুত হন নাই ;—ধর্ম্মই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন,—তাঁহার কীর্ত্তি অবিনশ্বর হইবে।'

অনেকবার বলিয়াছি, আবার বলি,—দুর্ভাগা পরিবারবর্গই প্রতাপের কালস্বরূপ হইল। তাহাদের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেই,—স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন। সেই অর্দ্ধক্ষিপ্ত অবস্থাতেও এক একবার পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, গভীর গর্জ্জনে কাঁদিয়া উঠিতেন,—'হা মিবার! হা চিতোর! হা জননী-জন্মভূমি!'

বন্য-ভীলগণই এ সময় প্রতাপের প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিল। তাহারাই প্রতাপের দুর্ভাগ্য পরিবারবর্গকে কোনরূপে প্রাণে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিল। মোগল, আক্রমণ করিতে আসিলে, তাহারাই কৌশল করিয়া, রাজপরিবার-দিগকে বন হইতে বনান্তরে, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে লুকাইয়া রাখিতে লাগিল। কখন বা মোগলের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাদের গতিরোধ করিল। প্রতাপ নিজেও যে, এই অবস্থায়ও মধ্যে মধ্যে মোগলের রক্তদর্শন না করিতেন, এমন নহে। কখন কখন একাকীই তিনি একশত মোগলের মাথা লইয়া পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতেন। তবে যতই হউক, স্ত্রীপুত্র সঙ্গে রহিয়াছে,—সব সময়ে যুদ্ধ করা, তাঁহার সম্ভবপর নয়,—তাহাদিগকে লইয়া নিরাপদে স্থানান্তরে যাইতে পারিলেই, তখন তিনি ভাগ্য বলিয়া মানিতেন।

বন্য ভীলগণ রাজপুত্রদিগকে কখন কখন তাহাদের সেই কদর্য্য খাদ্যই খাইতে দিত। ক্ষুধাতুর শিশু-কুমারগণ সুধাস্বাদনের ন্যায় তাহাই পরিতৃপ্ত হইয়া খাইত।—সে দৃশ্যে প্রতাপের চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ জল পড়িত।

ভীল বালিকাগণ রাজকুমারীদের সহিত খেলা করিতে আসিত। তাহারাই তখন তাহাদের সহচরী ও কুটুম্বিনী। শিশু কুমারীগণ ভীল-বালাদের সহিত মিশিত, সুখদুঃখের কথা বলিত, তাহাদের ভাষাতেই আদর করিয়া তাহাদিগকে ডাকিত। ভীলকন্যাগণ সখিত্বের নিদর্শনস্বরূপ, রাজকুমারীদের জন্য কোন খাদ্যসামগ্রী আনিলে,—মহিষী লছমী দেবী ছল ছল চক্ষে, সাদরে তাহা গ্রহণ করিতেন, এবং তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া, কখন কখন ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়াও উঠিতেন। তখনি আবার চোখের জল চোখে মারিয়া, সেই অরুন্তুদ যন্ত্রণা কণ্ঠে রুদ্ধ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতেন,—পাছে পুণ্যবান্ স্বামীর ব্রতভঙ্গ হয়!

ভীলগণ বিধিমতে প্রতাপের ইষ্টসিদ্ধি করিতে লাগিল। এক দিন এমন ঘটনা ঘটিল, যেদিন এই ভীলগণ না থাকিলে, প্রতাপ কিছুতেই পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। এক দিন প্রতাপ এক দুর্গম অরণ্যে সপরিবারে বসিয়া আছেন, এমন সময় ভীমরোলে চারিদিক্ হইতে ঘন ঘন 'দীন্ দীন্' ধ্বনি উত্থিত হইল। দুই জন অতি বিশ্বস্ত ভীল তীরবেগে ছুটিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া, তাহাদের ভাষায় বলিল, "রাজা! তোর সর্ব্বনাশ হ'লো রে, সর্ব্বনাশ হ'লো! ঝট্‌তি বেটা বেটী লেকে, সাম্‌লা রে, সাম্‌লা!" প্রতাপ বুঝিলেন, শত শত মোগল বনের চারিদিক্ ঘেরিয়াছে,—আজ বুঝি আর পরিবারদের সম্ভ্রমরক্ষা হয় না। তখন পলাইবার চেষ্টা করাও বৃথা। প্রতাপ ভীলদ্বয়কে ইঙ্গিতে বুঝাইলেন, তাহারাই সদলবলে, কোনও প্রকারে, পরিবারদিগকে লইয়া কোথাও লুক্কায়িত হউক, তিনি একাকীই সেই শত শত মোগলের প্রাণসংহার করিবেন। কিন্তু তিনি যদি এখন পরিবারবর্গকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হন,

তাহা হইলে কোনদিক রক্ষা হইবে না।—তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেই মোগলগণ সমগ্র বন পাতি পাতি করিয়া খুঁজিবে; শেষ সপরিবারে তাঁহাকে দেখিতে পাইলে সহজেই আক্রমণ করিতে পারিবে। ভীলদ্বয় প্রতাপের সঙ্কেত বুঝিল, তৎক্ষণাৎ দলবলকে ডাকিল এবং কঞ্চির ঝুড়িতে করিয়া সংগোপনে, গভীর বনে, রাজপরিবারদিগকে লইয়া চলিল।——হৃদয়ের খানিকটা সদ্যোরক্ত প্রতাপের চোখের কাছে আসিয়া জমাট বাঁধিয়া রহিল,—তাহা আর ঝরিবার অবসর পাইল না,—ক্ষিপ্র গতিতে অসি লইয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া, মূর্ত্তিমান্ যমের ন্যায় প্রতাপ একাকীই সেই শত শত মোগলের প্রাণ লইতে সঙ্কল্প করিলেন।

সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল,—চক্ষের নিমেষে প্রায় দুই শত মোগল ধরাশায়ী হইল,—অবশিষ্টগণ প্রাণ লইয়া উধাও হইয়া পলাইল। দুর্দ্দিনের বন্ধু ভীলগণও প্রতাপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল।

এদিকে প্রতাপের দুর্ভাগ্য পরিবারবর্গকে এক মহারণ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, একজন ভীল আসিয়া প্রতাপকে সংবাদ দিল, "রাজা! তোর বেটা-বেটী-জরু সব আচ্ছা আছে। কুচ্ ডর নেই,—মানু কানু ভানু সব পাহারা আছে; জব্‌রার জঙ্গলে তাদের রেখে এনু।——তুই যাবি ত চ।"

স্ত্রীপুত্র নিরাপদে জব্‌রা নামক মহারণ্যে পঁহুছিয়াছে শুনিয়া, প্রতাপ সুস্থির হইলেন। হর্ষে বিষাদে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। কালবিলম্ব না করিয়া, সেই ভীলসমভিব্যাহারে, তিনি সেই মহারণ্যে চলিলেন। সঙ্গে দুই একজন ভক্ত অনুচর এবং সর্দ্দারও চলিল।

সেই মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতাপ দেখিলেন, তাঁহার প্রাণাধিকগণ বিশাল বন্য-বৃক্ষশাখায়, বেতের ঝুড়িতে ঝুলিতেছে! পাছে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু তাহাদের প্রাণসংহার করে এই আশঙ্কায় ভীলগণ তাহাদিগকে ঐ ভাবে রাখিয়া দিয়াছে। অধিকন্তু সেই বৃক্ষের চারিদিকে এমন

ভাবে জাল পাতিয়া রাখিয়াছে যে,—হিংস্র জন্তুগণ সেখানে আসিলেও, বাগুরাবদ্ধ হইয়া প্রাণে মরিবে।

ভীলগণের এই অকৃত্রিম সহানুভূতি ও ভক্তি দেখিয়া প্রতাপের চোখ দিয়া, ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। একজন ভীল এই মর্ম্মে বলিল, "রাজা! কাঁদিস নে,—এদিন তোর থাক্‌বে না।——তোকে কাঁদ্‌তে দেখ্‌লে, তোর বেটা, বেটি জরু সব ডুগরি দে কাঁদ্‌তে থাক্‌বে।———ঐ দেখ্, তোকে দেখে রাণীমায়ীও কাঁদে সুরু ক'রেছে।—আ-হা-হা, রে ভগবান্!"

সরলপ্রাণ ভীলগণের সেই সরল সান্ত্বনায়, সেই অকৃত্রিম সহানুভূতিতে, প্রতাপ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তারপর স্নেহভরে একে একে সকল ভীলকেই এক এক বার কোল দিলেন। প্রতাপের কোল পাইয়া ভক্ত ভীলগণ কৃতার্থ ও ধন্য হইল।

জব্‌রার এই ভীষণ জঙ্গলে, দুর্ভাগ্য পরিবারবর্গকে লইয়া, প্রতাপ অনেকদিন কাটাইলেন। এখন এই স্থানই, তাঁহার নিরাপদের স্থান হইল। এত দূরে, এই মহারণ্যে আর মোগল তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিল না।——ব্রতপালনের আরও কি কিছু বাকী রহিল?

মহিষী লছমীদেবী সেই মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণু-প্রতিমা, আশার সমাধিস্তম্ভে দাঁড়াইয়া, এখনও স্মিতমুখে, স্বামীকে সুদৃঢ়চিত্তে ব্রতপালনে উৎসাহিত করিতেছেন।

স্বামী-স্ত্রীতে একদিন এইরূপ কথা হইল:—

প্রতাপ বলিলেন, "প্রিয়ে! সকলই স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। আজ প্রায় অষ্টাদশবর্ষকাল একভাবে কাটাইলাম,—কৈ, ব্রত ত উদ্‌যাপিত হইল না!—জীবন সত্যই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে।"

লছমী। স্বামিন্, এই কঠোর ব্রতপালনও যদি স্বপ্ন হয়, তবে সত্য কি, তা জানি না।

প্রতাপ। না প্রিয়ে, কার্য্য সফল না হইলেই তাহা স্বপ্ন বলিয়া মানিব।—কৈ. দেশের কাজ ত কিছুই করিতে পারিলাম না।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে, সজলনয়নে প্রতাপ এই কথা বলিলেন। দীনভাবে, অক্ষমতাসূচক কাতর দৃষ্টিতে, পত্নীর পানে চাহিলেন। সেই দীনতা ও অক্ষমতা, আরও অধিকরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"কৈ, দেশের কাজ ত কিছুই করিতে পারিলাম না,—বরং দেশের সমূহ ক্ষতিই করিয়াছি! পিতৃদেব এক মাত্র চিতোর হারাইয়াছিলেন,—আর আমি বেশী আশা করিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি,—শেষে বনচারী ভিক্ষুক হইয়াছি।"

লছ্মী। কিন্তু এই ভিক্ষুক অবস্থায়ও তোমার রাজরাজেশ্বরের ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণ আছে।—রাজপুতজাতির হৃদয়ক্ষেত্রে তুমি যে বীজ রোপিত করিলে, একদিন ইহা হইতে স্বাধীনতার অক্ষয়বট উৎপন্ন হইয়া বিশাল ভারত ছাইয়া ফেলিবে,—দুঃখ কি নাথ?

প্রতাপ পুনরায় বলিলেন, "প্রিয়ে, সহস্র সহস্র রাজপুত আমার মুখের পানে চাহিয়া, স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে,—আমা হইতেই তাহাদের ইহজীবনের সুখ, আশা ও জাগতিক কার্য্য সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে।—কৈ, দেশের আমি কি মঙ্গল করিলাম?"

লছ্মী। মঙ্গল? আর মঙ্গল কাহাকে বলে? স্বাধীনতার মঙ্গল-মন্দিরে তুমি আপনাকে বলি দিয়াছ,—তাহাতে তোমার রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য,—সকলি উৎসৃষ্ট হইয়াছে;—আর মঙ্গল কি হইবে? তোমার প্রাণপুত্তলি শিশুগুলি অনশনে তরুতল আশ্রয় করিয়াছে; তুমি নিজে বনবাসী—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছ; তোমার ধর্ম্মপত্নী—এই অভাগিনীও ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে;—বন্য ভীল-সাঁওতালে এখন তোমার প্রতিবেশী, বন্ধু, রক্ষক ও সহায়;——নাথ এখনও দেশের মঙ্গল হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিতেছ?

প্রতাপ। প্রিয়ে, মন্ত্রের সাধন করিয়াছি, প্রাণপাত করিয়াও ব্রত উদ্‌যাপিত করিব। কিন্তু কৈ, এখনও ত প্রাণ সুস্থ অবস্থায় রহিয়াছে,—এখনও ত আহার-বিহার ধরাবাঁধা নিয়মে, পশুতুল্য জীবনে উপভোগ করিতেছি!——জীবন-যজ্ঞে সর্ব্বস্ব আহুতি দিতে পারিলাম কৈ?

লছমীদেবী ছল ছল চক্ষে, কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিলেন, "হারি মানিলাম প্রভু!"

প্রতাপ। কাঁদিও না সতি!——যাহা বলিলাম, ইহা আমার অন্তরের কথা। সত্য বলিতেছি, এক একবার আমার মনে হয়,—কৈ, এ জীবনে আর কি করিলাম? এত গৌরব কিসের? পাগলও ত খেয়ালের ঝোঁকে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া, স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া, পথে বাহির হয়।——প্রিয়ে, ব্রত উদ্‌যাপন ভিন্ন ত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছি না।"

লছমী। প্রভু! তুমি জ্ঞানী, বিজ্ঞ, বহুদর্শী;—তোমাকে আমি আর কি বুঝাইব? এই তুষানল বুকে বহন করিয়াও যদি ব্রত উদ্‌যাপিত না হয়, তবে সে আমাদের দুরদৃষ্ট।

প্রতাপ। দুরদৃষ্ট বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া আরও কিছু। ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করিতে আজিও শিখি নাই। এখনও মানুষের মুখ চাই; এখনও প্রতিপদে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া চলি। সাধনার তেমন গভীরতা থাকিলে, এতদিনে পাণ্ডবের ন্যায় কৃষ্ণকে সখা করিয়া, নর-নারায়ণ হইতে পারিতাম।—হায়! সে অমানুষিক আত্মনির্ভর আমার কোথায়?

লছমী দেবী স্বামীর এ কাতর অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তাঁহার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। এবার প্রতাপ উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—

"কৈ, কোথা তুমি অনাথের নাথ পাণ্ডব-সখা? দেখা দাও প্রভু!

—এ মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া, জীবনের এ উত্তাপ দূর করিয়া হা-হা করিয়া বাঁচি!—ইচ্ছা হয়, তোমার দেশ তুমিই রক্ষা করিও!”

এখনও হা-হা কামনা? আরও দুঃখের আবাহন?—প্রতাপ! তুমি মানুষ কি দেবতা,—আমি বুঝিলাম না। সেই জন্যই বলিয়াছি, দেবত্বের উচ্চশিখরেও মধ্যে মধ্যে তোমাকে দেখিতে পাই,—এবং দেখিয়া বিস্ময়ে, আনন্দে ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।

সুখদুঃখের নিয়মাধীন ক্ষুদ্র মানুষ, মানবভাবেই তোমাকে দেখিতে চায়। তোমার মানবীয় দোষগুণের সমষ্টিতেই তাহার সহানুভূতি অধিক। তোমার মানবীয় দুর্ব্বলতা টুকু না দেখিলে, সে তোমাকে আপনার জন বলিয়া ধারণা করিতেই পারিবে না। জীবনের মধ্যভাগে তোমার জীবনের চরমোৎকর্ষ দেখিয়াছি; তোমার অলৌকিক ব্রতপালনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি;—এখন আবার সাধারণ মানবভাবে তোমাকে দেখিয়া, তোমার অপূর্ব্ব জীবন-আখ্যায়িকা শেষ করি।

তোমার জীবন-সহচর, প্রধান ভক্ত চন্দাবৎ-কৃষ্ণও তোমার এই দেবভাব দেখিয়া একদিন মনে মনে বলিয়াছিল, “মৃত রাণা উদয়সিংহের ত্রুটির সম্পূরণ করিয়া, মানুষকে স্বদেশভক্তি শিক্ষা দিবার জন্যই কি, পুরুষসিংহ প্রতাপ ধরাতলে আবির্ভূত হইয়াছেন?”
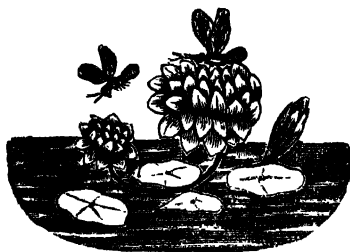
ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল পূর্ণিমা রজনী। নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত। নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক্ উদ্ভাসিত। জবরার নিবিড় জঙ্গল কৌমুদীস্নাত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষবল্লরী স্থির ও নিশ্চল। সমগ্র জগৎ সুষুপ্তিময়। আকাশের চাঁদ আপনি হাসিয়া পৃথিবীকে হাসাইতেছে। তারকা-দল নির্নিমেষ নয়নে পৃথিবীপানে চাহিয়া আছে। চকোর চকোরী চাঁদের সুধা পান করিতেছে। চারিদিক্ শান্তিপূর্ণ ও মধুময়।

এই মধুর রজনীতে, এই শান্তিময় সময়ে, জবরার অনতিদূরস্থ এক পাহাড়ে বসিয়া, জগতের সুখদুঃখ বিস্মৃত হইয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী আপন মনে গান গাহিতেছিলেন। গানের প্রতি স্বর-গ্রামে, প্রত্যেক মিলন তানে সুধাবর্ষণ হইতেছিল। কোকিলের প্রথম ঝঙ্কারের ন্যায় অতি ধীরে গীত হইয়া, সেই গান ক্রমে পঞ্চমে, সপ্তমে উঠিল। দিক্ দিগন্ত কম্পিত হইয়া সেই স্বর আকাশ ছাইল। নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, তন্ময়ী হইয়া, সুন্দরী গাহিতেছিলেন,——

'সাধ্ জনমে প্রেম পাইয়ে,
সে প্রেমে বঞ্চিত যে ;
আপনার চিতা আপনি সাজায়,
তার বাড়া দুখী কে।
(ওগো, তার বাড়া দুখী কে)
মরণ মঙ্গল মনে মনে গায়,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে জীবন গোঁয়ায়,
কারো মুখে হায়, 'আহা'ও না পায়,—
তার দুখ জানে সে ॥'
(ওগো, তার দুখ জানে সে)

সুন্দরী গান গাহিতেছেন, আর তাঁর অপাঙ্গ বহিয়া দরদরধারে অশ্রুপাত হইতেছে।

মধুর পূর্ণিমা রজনী; মধুর জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক্ উদ্ভাসিত; মধুর জ্যোৎস্নাধারায় পৃথিবী স্নাত; পাহাড়ে চন্দ্রালোক পড়িয়া অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে;—পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিমল জ্যোৎস্নাধারা; শৃঙ্গে শৃঙ্গে স্নিগ্ধ কৌমুদীরশ্মি; শৃঙ্গে শৃঙ্গে যেন কোটি চন্দ্রের উদয়;—মাথার উপর অনন্ত নক্ষত্রমালা;—যেন দেবতার নীরব, নিস্তব্ধ, জাগ্রৎ আঁখি;—সে এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব দৃশ্য। অদূরে নির্ঝরিণী-জল কল্ কল্, ছল্ ছল্ করিয়া আপন মনে বহিতেছে; পাহাড়স্থ গুল্ম লতা, তৃণ তরু—বিমল জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া হাসিতেছে; দিক্-দিগন্ত ভরিয়া যেন বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ হইতেছে; প্রকৃতি হাস্যময়ী;——কেবল এই সুষমাময়ী সুন্দরীর বুকের ভিতর মর্ম্মকাতরতা!

সুন্দীর তন্ময়ী হইয়া আপন মনে গান গায়িতেছেন, আর তাঁহার অপাঙ্গ বহিয়া দর দর ধারে অশ্রুপাত হইতেছে। তাঁহার মস্তকের কেশ আলায়িত, বক্ষের বসন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সর্ব্বাঙ্গ জ্যোৎস্নাধারায় অভিসিক্ত;—এই চন্দ্রমাশালিনী, সুষমাময়ী মধুযামিনীতে,—সুন্দরীর

নিরাশা-মথিত হৃদয়-সিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রের কিরণোদ্ভাসিত বিমল জ্যোৎস্নালোক, পূর্ণিমা রজনী, হাস্যময়ী প্রকৃতি,—সেই বিষাদিনীকে অধিকতর বিষাদময়ী করিয়াছে। কিন্তু সেই বিষাদেও সে মূর্ত্তি কি সুন্দর।

সুন্দরী দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া, চারিদিকে সুধাবৃষ্টি করিয়া, গায়িতে ছিলেন,—

'লাখ্ জনমে প্রেম পাইয়ে,
সে প্রেমে বঞ্চিত যে ;
আপনার চিতা আপনি সাজায়,
তার বাড়া দুখী কে,—
ওগো, তার বাড়া দুখী কে।'

পাহাড়ের অন্য পার্শ্ব হইতে, সেই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, কে তাহার উত্তর দিল,—

'আছে একজন, তোমারি-মতন,
মরমে মরিয়া পাগলপারা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, বুক বাঁধিয়ে,
হ'য়ে আছে সে আপনহারা।'

গান গায়িতে গায়িতে একটি সুন্দর যুবক, সেই বিষাদিনী সুন্দরীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকের চক্ষুও অশ্রুসিক্ত, কণ্ঠস্বর কম্পিত, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত। বিষাদিনী সুন্দরী, সেই আলুথালুবেশেই, অনিমেষ-নয়নে যুবককে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল।

যুবক তখনও সেই চন্দ্রমাকিরণসংস্পৃষ্টা জ্যোৎস্নাধারায় অভিসিক্তা বিষাদিনীর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া গায়িতেছেন,—

'তায়, হৃদয়-স্বপন হৃদয়ে মিলায়,
দেখিতে দেখিতে রামধনু প্রায়,—
কত আলো ছায়া, কত শোভা তায়,
ভাবিয়ে ভাবিয়ে প্রাণ হ'লো সারা।'

সুন্দরী তখনও যুবককে স্থিরনেত্রে দেখিতেছেন, যুবকও সেই বিষাদিনী সুন্দরীকে নির্নিমেষনয়নে অবলোকন করিতেছেন। চারি চক্ষের সে পূর্ণ মিলনে, নীরবে কত কথা হইয়া গেল। ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,—সে নীরব ভাষায় ডুবিয়া রহিল।

সেই নীরব নিস্তব্ধ নিশিতে, সেই নীরব নির্জ্জন অরণ্যময় পাহাড়ে, যুবকযুবতী পরস্পর পরস্পরের পানে, অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। আর কেহ কোথাও নাই।

মাথার উপর চাঁদ হাসিতেছে,—চাঁদের সোণার কিরণে দিক্ আলোকিত হইয়াছে,—নীরব নির্জ্জন বনস্থলী মধুময় হইয়াছে,—পাহাড়ে জ্যোৎস্নালোক পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে,—কেহ কোথাও নাই,—যুবক যুবতী পরস্পর পরস্পরের পানে অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া রহিলেন!

মধুর পূর্ণিমা নিশি। বিরহ-বিধুরা সীমন্তিনী আজ কত কষ্টে রাত্রি অতিবাহিত করিতেছেন। প্রেমিক-প্রেমিকা আজ এই মধুযামিনীতে, কি অনির্ব্বচনীয় সুখ দুঃখ উপভোগ করিতেছেন! জ্যোৎস্নায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, চাঁদের শোভা দেখিতে দেখিতে, তাঁহাদের সুখ ও দুখের রাত্রি পোহাইতেছে। এ হেন পূর্ণিমা নিশিতে, সেই নির্জ্জন অরণ্যময় পাহাড়ে, যুবক-যুবতী নিরাশ অন্তরে, পরস্পর পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিলেন।

উভয়েই উভয়ের জন্য কাতর; উভয়েই উভয়ের প্রেমে আত্মহারা; উভয়েই উভয়ের রূপে মুগ্ধ।

একজন ছবিতে প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া, আত্মসমর্পণ করিয়াছেন; আর

একজন স্বপ্নে মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া, স্বপ্নেই জীবনের যথাসর্ব্বস্ব উপহার দিয়াছেন!

দুই জনেই দুই জনকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিয়াছেন; দুই জনেই দুই জনের নিকট হৃদয় বিনিময় করিয়াছেন;—অথচ কেমন বিধির বিধান,—হাতে পাইয়াও কেহ কাহাকে পাইতেছেন না। মধ্যে একটা বিষম বাধা। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের মিলনে হতাশ হইয়াও, পিপাসিত-প্রাণে বসিয়া আছেন। যেন দুই তীরে দুই জন রহিয়াছেন,—মধ্যে একটি নদী ব্যবধান।

সেই মধুময় নিশিতে, সেই মধুর জ্যোৎস্নালোকবিভাসিত রাত্রিতে, সেই নির্জ্জন পাহাড়ে, পরস্পরের প্রেমাভিলাষী যুবক-যুবতী,—পরস্পরের পানে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন! আর কেহ কোথাও নাই।

প্রতিমূর্ত্তি-পরিদৃষ্ট প্রণয়-পাত্রের সেই দেবোপম মূর্ত্তি স্বশরীরে বর্ত্তমান দেখিয়া, আবার সেই চিরবাঞ্ছিত ধনকে ইহজীবনে পাইব না ভাবিয়া,—যুবতীর দেহ কণ্টকিত, হৃদয় কম্পিত হইল; আর স্বপ্নদৃষ্ট সেই বালিকা-মূর্ত্তিকে,—মূর্ত্তিমতী বিষাদ-প্রতিমারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া, ইহজীবনে পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া, যুবকের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল!——সেই স্থান, সেই কাল, সেই স্বপ্নদৃষ্টা প্রণয়িনী। মাথার উপর চাঁদ হাসিতেছে,—আর কেহ কোথাও নাই!

যুবক মনে মনে বলিলেন,—

"সত্যই এ ধাতার স্বপ্নময়ী সৃষ্টি!—জন্মজন্মান্তরেও যেন এ প্রতিমা বুকে ধরিতে পাই।"

যুবতীও অন্তরের অন্তর হইতে আপন মনে কহিলেন,—

"আ মরি মরি! এত রূপ! এত সুধা! প্রাণ ভ'রে গেল রে!——কোন্ বিধাতা এ দুর্লভ পুরুষরত্নের সৃষ্টি করিয়াছেন? হায়! এ জন্মে ত এই চোখের দেখাই সার হইল,—কুমারীদশাতেই এ জন্ম কাটিয়া গেল;—ভগবান্! যেন জন্মান্তরেও ইঁহার সহিত মিলিত হই।"

সেই জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা রজনী। সেই নীরব পৃথিবী। সেই নির্জ্জন পাহাড়। প্রেমিক-প্রেমিকা মনে মনে এই কথা বলিতেছেন,—আর কেহ কোথাও নাই।

উভয়েরই হৃদয়ে স্বপ্ন, চক্ষে প্রেমের অশ্রু।——নীরবে দু'জনা দু'জনার পানে চাহিয়া আছেন,—আর কেহ কোথাও নাই।

এইরূপ নিবিষ্টমনে, নির্নিমেষ নয়নে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, যুবতী উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়া উঠিলেন,—

'চেয়ো না; চেয়ো না আর, ও মুখ-চন্দ্রমা তুলি।
ক্ষম সখা অবলারে, সুখ-স্বপ্ন যাও ভুলি।
যত চা'বে মুখ পানে, তত কামনার বাণে,
জ্বরিব, মরিব প্রাণে, খেলিবে বুকে বিজুলী।'

গভীর নিশীথে, এই গভীর করুণ-গীতি, আকাশমেদিনী এক করিল;—করুণ বেহাগের করুণ ঝঙ্কারে, দিক্‌দিগন্ত ঝঙ্কারিত হইল।

যুবকও বিষাদিত অন্তরে তাহার উত্তর দিলেন,—

'সেই ভালো সখি, তবে এই শেষ,—
দাও লো বিদায়, যাব দূর দেশ;
অতৃপ্ত নয়নে চাহিব না আর
ও মুখ-কমলে,—সুষমা আধার,
স্বপ্ন ল'য়ে বুকে ঘুরিব সংসার,
দেখি বা ইহায় হয় কি বিশেষ॥'

সেই নীরব নির্জ্জন পাহাড়। মাথার উপরে চন্দ্রমা হাসিতেছে। আর কেহ কোথাও নাই।

যুবক কম্পিতহস্তে যুবতীর সেই কম্পিত করপদ্মখানি ধরিয়া, বিদায়-কামনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় মাথার উপর একটা নিশীথ

পক্ষী বিকট রবে ডাকিয়া উঠিল। সে বিকট স্বরে যুবক যুবতী চমকিত হইলেন।

সে রাত্রিতে আর যুবকের বিদায় লওয়া হইল না। তিনি ভাবিলেন, "না, দেখি, পিতৃদেবের ব্রত উদ্‌যাপনের আর বিলম্ব কত!—তাঁহার নিকট অবিশ্বাসী হইব না।"

ক্ষণকাল দুইজনেই নীরব। মাথার উপর অনন্ত আকাশ। পার্শ্বে নীরব বনস্থলী। পদপ্রান্তে বিপুলা পৃথ্বী।

তখনও তাঁহারা সেই পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া।

যুবক,—অমর; যুবতী,—যমুনা।
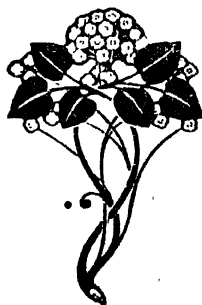
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পুণ্যবান্ প্রতাপের অমানুষিক দেব-চরিত্র এত কাল আলোচনা করিলাম, এইবার তাঁহার সাধারণ মানব-চরিত্র একটু আলোচনা করিব। মানুষ যখন মহত্ত্বের চরম শিখরে উঠিয়া, ইহলোকে অতুল যশঃ ও পরলোকে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করে,—তখন যেমন তিনি অবিসংবাদিত রূপে আপামরসাধারণের বরেণ্য ও পূজনীয় হন,—তেমনি মানুষ যখন আবার সাধারণ মানব ভাবেই কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করে, তখন আবার তাহার সেই মানবীয় গুণসমষ্টির তেমনি তীব্র সমালোচনাও চলিয়া থাকে। বিশেষতঃ, মহৎব্যক্তির—প্রকৃত বড়লোকের একটু পদস্খলন হইলে, তাহা সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করে। পরন্তু সাধারণ লোকের তাহা অপেক্ষা গুরুতর পদস্খলনেও, কাহারও তেমন চিত্তচাঞ্চল্য, কৌতুহল, কিংবা কষ্টানুভব হয় না,—বিস্ময় কাহারও হৃদয় উদ্রিক্ত করে না। কারণ সাধারণের ঐ পদস্খলন, সাধারণের সহয়া আছে,—জগতের উহা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু যাহার পদস্খলনের বিষয়—মানুষ কখন কল্পনাও করে নাই,—'এরূপ হইতে পারে' বলিয়া, যাহা কখন কাহারও ধারণায়ও আসে নাই,—তাহার সম্বন্ধে এরূপ ঘটিলে, প্রথমতঃ কেহ বিশ্বাসই করে না,—তারপর বিশেষ প্রমাণ পাইলে প্রথমতঃ বিস্মিত হয়, অবাক্ হয়, পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে,—তারপর সেই বিষয় লইয়া তুমুল

আন্দোলন-আলোচনা করিয়া থাকে। ভক্তিতে বা চিরদিনের ধারণাতে আঘাত পড়িলে মানুষ এমনই দিশাহারা হয়।

প্রতাপের অমানুষিক কার্য্যাবলী দেখিয়া, এতকাল যাঁহারা প্রতাপকে দেবতার ন্যায় ভক্তির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহারা প্রতাপের মানবীয় দুর্ব্বলতাটুকু দেখিয়া বিস্মিত, কিংবা তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হন, ইহাই আমাদের কামনা। কারণ, যতই হউক, প্রতাপ মানুষ,—তাঁহারও আত্মবোধ আছে, তাঁহারও জীবধর্ম্ম আছে, তাঁহারও স্ত্রীপুত্র আছে, সুখদুঃখে তাঁহারও হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে। তবে, এতদিন যে, তাঁহাতে সাধারণ মানবীয় দুর্ব্বলতাটুকু দেখি নাই, তাহার কারণ—তিনি অনেক গুণের আধার, অনেক গুণে গুণবান্,—প্রকৃত পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ তিনি।

আজ সত্যের অনুরোধে, সেই মহাপুরুষের চরিত্রে একটি কলঙ্ক-চিহ্ন দেখিব, একটি দুর্ব্বলতার দাগ দেখিব, একটু সাধারণত্ব দেখিয়া স্বভাবের সঙ্গতিরক্ষা করিব।—যতই হউক, প্রতাপ মানুষ!

দুরদৃষ্ট যখন নির্ম্মম কঠিন হস্তে প্রতাপকে নিষ্পেষিত ও নির্য্যাতিত করিতেছিল;—যখন ভীষণ দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর কশাঘাত ও তীব্র জ্বালাময় উত্তাপ প্রতাপকে অস্থির উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিতেছিল;—যখন আকবর পুনঃপুনঃ চর পাঠাইয়া প্রতাপকে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইতে ইঙ্গিত করিতেছিলেন, তখনও প্রতাপ ব্রতচ্যুত কিংবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই,—পাঠক তাহা অবগত আছেন। কিন্তু আজি'কার একটিমাত্র ঘটনায়, একটিমাত্র করুণ দৃশ্যে, তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র উথলিত হইল,—তাঁহাকে চঞ্চল ও সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিল। যতই হউক, প্রতাপ মানুষ!

নিভৃত এক পর্ব্বত-কন্দরে বসিয়া, দুর্ভাগ্য রাজ-পরিবার অতি কষ্টার্জ্জিত সামান্য আহার প্রস্তুত করিতেছিলেন, আর প্রতাপ অদূরস্থ এক তৃণ-শয্যায় শায়িত থাকিয়া, আপন অবস্থার বিষয় নিবিষ্টচিত্তে ভাবিতেছিলেন। প্রতাপের সেই দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ নখর, মলিন বসন, বীরত্বব্যঞ্জক শীর্ণ দেহ,

—এক দিকে যেমন তাঁহার সেই কঠোর ব্রতপালনের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিতেছিল, অপর দিকে মূর্ত্তিমান্ দারিদ্র্য ও রুধিরশোষক হাহা ভাব লেলিহান্ হইয়া, সহস্র লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া, সদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল। অভাগ্য রাজ-শিশুগণ, বুবুক্ষু ভিক্ষুক সন্তানগণের ন্যায়, পিতামাতাকে ঘেরিয়া, হিল্‌হিল্ কিল্‌কিল্ করিয়া বেড়াইতেছে। একটু খাদ্যসামগ্রী পাইলে; কাড়াকাড়ি-হুড়োহুড়ি করিয়া খাইয়া ফেলে; আবার তখনি হাহা করিয়া কাঁদিতে থাকে।—রাজরাজেশ্বর প্রতাপ রক্তমাংসের শরীর লইয়া, এ দৃশ্যও একাদিক্রমে চারি পাঁচ বৎসর দেখিয়া আসিতেছেন!

আজও তাহা দেখিলেন। নির্ব্বিকার নিবিষ্টমনে দেখিলেন। দেখিলেন, মহিষী লছ্মী দেবী ভিক্ষুক রমণীর ন্যায়, ছিন্ন মলিন বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া, অনশনে ও মনাগুনে আপনার সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি মসীময়ী করিয়া, এক হস্তে চুল্লীতে ইন্ধন দিতেছেন, অন্য হস্তে সেই চুল্লীস্থ ক্ষুদ্র এক পাত্রের উপর কি সেঁকিতেছেন। আশে পাশে ক্ষুধাতুর শিশুগণ জননীকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা সতৃষ্ণনয়নে একবার চুল্লীপানে চায়, আর বার আশাপূর্ণ নেত্রে চুল্লীপার্শ্বস্থ অপক্ক ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে,—কতক্ষণে তাহা সিদ্ধ অর্দ্ধসিদ্ধ বা ঝলসিত হইয়া, যেমন তেমন রকমে পাত্র হইতে নামিবে! আর, সেই ভোজ্যদ্রব্যটিই বা কি? না, অরণ্যজাত স্বাদগন্ধহীন একরূপ তৃণবীজ-চূর্ণ। সেই তৃণবীজ-চূর্ণে খানকতক রুটী প্রস্তুত করিয়া, প্রতাপ-মহিষী তাহাই আগুনে সেঁকিয়া লইতেছেন। তারপর, হয়—একটু লবণ, নয়—একটু শাক সিদ্ধ দিয়া, মিবারেশ্বরী তাহাই জীবনধনগণকে খাইতে দিবেন!

অদূরস্থ সেই তৃণশয্যায় শায়িত হইয়া, অদ্ধ পৃথিবীপতি,—অবিকম্পিত হৃদয়ে, এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। যেন বিরাট্ হিমালয় 'পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম' লইয়া, ঝড়বৃষ্টি-ঝঞ্জাবাতে দৃক্‌পাত না করিয়া, আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া রহিয়াছেন!

তারপর প্রতাপ দেখিলেন, মহিষী অতি কষ্টে চক্ষের জল রোধ করিয়া, ক্ষুধাতুর সন্তানগণকে তাহা খাইতে দিলেন। চাঁদপানা মুখ করিয়া, অমৃত-বোধে, রাজ-শিশুগণ পরিতোষপূর্ব্বক তাহা ভোজন করিল। আর কিছু সঞ্চিত রহিল কি না,—আবার ক্ষুধা পাইলে খাইতে পাইবে কি না, কেহ কেহ সে সন্ধানও লইল। জননী যখন বলিলেন, 'না',—তখন যেন কেহ কেহ, 'একেবারে পেট ভরিয়া খাইল কেন' ভাবিয়া, মনে মনে একটু খুঁৎ-খুঁৎ করিতে লাগিল। ওরি মধ্যে প্রতাপের সাত আট বছরের একটি মেয়ে, তাহার ভোজ্য অংশের অর্দ্ধেক খাইয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ তুলিয়া রাখিল,—বড় ক্ষুধা পাইলে তখন খাইবে। সে অভুক্ত অর্দ্ধ ভোজ্যাংশে বালিকার সবটা হৃদয়,—আশা, মমতা, অনুরাগ,—সমস্তই ন্যস্ত রহিল।——বড় দুঃখে লছমীদেবী এবার কাঁদিলেন। সমবেদনা পাইবার আশায়, অদূরস্থ তৃণশয্যায় শায়িত স্বামীর পানে চাহিয়া একটু কাঁদিলেন।——কঠিন হিমালয় একটুও নড়িল না।

নড়িল না,—বাহ্যদৃষ্টিতে; কিন্তু তাহার ভিতরে কি একটা মহাকম্পন উপস্থিত হইল, তাহা তুমি আপন মন দিয়া বুঝিতে পার!——যতই হউক, প্রতাপ মানুষ!

তার পর আর এক ঘটনা ঘটিল!—বালিকা তাহার সেই বড় আশার সেই অভুক্ত তৃণবীজ-চূর্ণের আধখানি রুটি,—সযত্নে একটা গর্ত্তের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, মায়ের কাছে বসিয়া, মধুমাখাস্বরে, ক্রোরুদ্যমানা মায়ের সেই রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিতেছিল,—এমন সময়ে—ওহো! কোথা হইতে একটা বন্য-বিড়াল আসিয়া, বালিকার সেই অতি বড় আশার সামগ্রী,—সেই আত্মশোণিততুল্য আধখানি রুটী, মুখে করিয়া পলাইয়া গেল। অর্দ্ধভুক্তা বালিকা যেমন তাহা দেখিতে পাইল, অমনি পাষাণভেদী করুণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। পার্শ্বোপবিষ্টা মাতা 'কি কি' বলিয়া যতই কারণ জিজ্ঞাসা করেন, অবোধ বালিকা ততই লুটোপুটি হইয়া কাঁদিতে থাকে।

এইবার হিমালয় নড়িল। মহাসমুদ্র আলোড়িত হইল। সতীর মৃত্যুসংবাদে সর্ব্বংসহ সদাশিবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল!——প্রতাপ থর থর কাঁপিতে লাগিলেন।

সেই তৃণশয্যায় শায়িত, মর্ম্মাহত, সহস্র সহস্র বৃশ্চিকদংশনে জর্জ্জরিত, সহিষ্ণুতার অবতার, মহাপ্রাণ প্রতাপ,—এতক্ষণ একদৃষ্টে নিবিষ্টচিত্তে এই করুণ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণে বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিতেছিল। অনেক কষ্টে তিনি সে অসহ্য জ্বালা সহ্য করিতেছিলেন। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের অনেক কথা,—একে একে তাঁহার স্মৃতিমাঝে জাগিতেছিল। প্রাণপুত্তলী শিশুকন্যার সেই অভুক্ত আধখানি রুটী সঞ্চিত করিয়া রাখা এবং সে দৃশ্যে তাঁহার পানে চাহিয়া মহিষীর রোদন,—বিষাক্ত শল্যের ন্যায় তাঁহার বক্ষে বাজিতেছিল;—তথাপি সে অরুন্তুদ যন্ত্রণা তিনি কাহাকে জানিতে দেন নাই। কিন্তু তার পর, বন্য-বিড়ালের রুটী লইয়া পলাইয়া যাওয়ায়,—বালিকার সেই পাষাণভেদী করুণ ক্রন্দনে, তাঁহার সেই মহা যোগাসন টলিল,—হৃদয়-সমুদ্র মথিত হইল,—হিমালয় সদৃশ কঠিন প্রাণ থর-থর কম্পিত হইতে লাগিল! তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীও যেন ঘুরিয়া গেল।—কন্যার ক্রন্দনের সহিত, প্রতাপও সহসা উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন!

সে ক্রন্দনে বালিকার ক্রন্দন থামিল, পতিপ্রাণা লছ্মীদেবীর রোদন দূর হইল,——সকলে সভয়ে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।—হায়! সুখদুঃখের অতীত শ্মশানচারী দেবদেবের চক্ষে আজ জল কেন?

যতই হউক,—প্রতাপ মানুষ!

মানুষ বলিয়াই, তিনি স্বাভাবিকতার হাত এড়াইতে পারিলেন না। মানুষ বলিয়াই, তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র আজ উথলিয়া উঠিল।——এবং তার পর সেই সমুদ্রতুল্য হৃদয়, যে দিকে ধাবিত হইল, সহস্র চেষ্টায়ও কেহ

তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না।——প্রতাপ আকবরের নিকট সন্ধি-প্রার্থনা করিলেন।

সেই জীবন-সহচর বীর চন্দাবৎ আসিল, অমর আসিল, স্বয়ং মহিষী লছ্মীদেবী আসিলেন,—বিস্মিত হইলেন, বুঝাইলেন, মিনতি করিলেন, বাধা দিবার চেষ্টা পাইলেন;—কিন্তু সমুদ্র-স্রোত রোধ করিতে কে সমর্থ হইবে? ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা,—কার সাধ্য লঙ্ঘন করে? সকলে ভয়ে ভয়ে প্রতাপের সম্মুখ ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

ইতিপূর্ব্বে, সন্ধির প্রস্তাবে, প্রতাপ যখন 'না' বলিয়াছিলেন, কে তখন তাঁহাকে 'হাঁ' বলাইতে সক্ষম হইয়াছিল? আর আজ 'হাঁ' বলিয়াছেন,—কার সাধ্য, তাঁহাকে 'না' বলায়?—মহাজীবন সর্ব্বত্র, সকল সময়েই একরূপ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য কক্ষভ্রষ্ট, হিমালয় গহ্বরপ্রবিষ্ট, মহান্ মহীরুহের পতন,——সহসা প্রতাপের অবনতিস্বীকারে, সম্রাট্ বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, রাণা প্রতাপসিংহ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ সেই সন্ধিপত্র পাঠ করিলেন, পুনঃ পুনঃ তাহা সকলকে দেখাইলেন, পুনঃ পুনঃ প্রতাপের স্বাক্ষর লক্ষ্য করিলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন সেই সন্ধিপত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।—রাজ্যমধ্যে তিনি মহামহোৎসব আরম্ভ করিয়া দিলেন।

প্রতাপের প্রধান ভক্ত সেই রাজপুত কবি পৃথ্বীরাজকে আকবর এই সুখের সংবাদ দিলেন, প্রতাপের সেই পত্র তাঁহাকে দেখাইলেন,—আনন্দে, উৎসাহে সেই পত্রবাহক দূতকে বিশিষ্টরূপ পুরস্কৃত করিলেন।

পৃথ্বীরাজ বিষম সন্দেহাকুলিত চিত্তে সেই পত্র দেখিলেন,—একবার, দুইবার, তিনবার সেই পত্র মনে মনে পাঠ করিলেন,—পুনঃ পুনঃ প্রতাপের সেই স্বাক্ষরটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি যে ঐ পত্র খানা গিলিয়া ফেলিবে দেখিতেছি! 'প্রতাপসিংহ এমন পত্র লিখিলেন কিরূপে?'—মনে মনে কেবলই এই কথা বলিতেছ, না?"

পৃথ্বীরাজ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—

"জাঁহাপনা যাহা অনুমান করিয়াছেন, সত্য। যদি গোস্তাকি না লন ত বলি,—আমার বিশ্বাস হয় না যে, মহারাণা প্রতাপসিংহ এ পত্র লিখিয়াছেন।"

"সে কি!"

সম্রাট উৎসুকভাবে, মুখ ম্লান করিয়া বলিলেন, "সে কি! প্রতাপসিংহ এ পত্র লিখেন নাই?—তবে কি ইহা জাল?"

পৃথ্বীরাজ। জাঁহাপনার নিকট মনের ভাব সরলভাবেই প্রকাশ করিব,—আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে,—এ পত্র জাল,——প্রতাপের কোন গুপ্ত-শত্রু প্রতাপের নির্ম্মল যশোপ্রভা মলিন করিবার অভিপ্রায়ে, এই পত্র লিখিয়াছে।

আকবর। সে কি! তুমি যে আমাকে অবাক্ করিলে হে? না, না, তুমি অতিরিক্ত ভক্তিবশতঃ প্রতাপের এই আশাতীত নম্রতাদর্শনে, সন্ধিপত্রে অবিশ্বাস করিতেছ।——প্রতাপেরই এ স্বাক্ষর!

পৃথ্বীরাজ। জাঁহাপনা! প্রতাপসিংহকে আমি বিলক্ষণ চিনি।—আপনার সমগ্র সাম্রাজ্যের বিনিময়েও তিনি নত হইবার পাত্র নন।——নিশ্চয়ই এ পত্র জাল!

কবির স্বাধীনতা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বসময়ে। সম্রাট্ চিরদিনই পৃথ্বীরাজকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন। বিশেষ নরোজার দিনে, সাধ্বীর সেই তেজ ও পরাক্রম স্মরণ করিয়া, পৃথ্বীরাজের প্রতি তাঁহার সমধিক শ্রদ্ধা এবং মনে মনে একটু ভয়ও সঞ্চিত হইয়াছিল,—তাই পৃথ্বীরাজের এতটা প্রাধান্য।

সম্রাটের মনে কেমন একটা খট্কা লাগিল। পৃথ্বীরাজের মুখ দিয়া 'হাঁ' বলাইতে না পারিলে, যেন তাঁহার সে খট্কা ঘুচিতেছে না। তাই এবার তিনি একটু রুক্ষ-মেজাজে বলিলেন,—

"দেখ, কোন জিনিসের গোঁড়ামীটা আদৌ ভাল নয়। তুমি নাকি

প্রতাপসিংহের বড় গোঁড়া, তাই বারবার এই একই কথা বলিতেছ।——তুমি কিসে জানিলে, প্রতাপসিংহ এ পত্র লিখেন নাই ?"

পৃথ্বীরাজ ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—

"জাঁহাপনার কথায় পুনঃপুনঃ প্রতিবাদ করা, এ অধীন রাজপুতের কিছুতেই শোভা পায় না।"

আকবর একটু স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার মনের যা ধারণা, পরিষ্কার করিয়াই বল,——আমি অসন্তুষ্ট হইব না।"

পৃথ্বীরাজ। জাঁহাপনা! মনের ধারণার কথা যদি বলিলেন, ত বলি,—প্রতাপসিংহের পক্ষে এরূপ পত্র লেখা অসম্ভব।

আকবর। অসম্ভব সম্ভব,—সকলই ত সময় ও অবস্থার উপর নির্ভর করে।—প্রতাপসিংহের এখন কি অবস্থা ভাব দেখি ?

পৃথ্বীরাজ। হৃতসর্ব্বস্ব, বনচারী, সন্ন্যাসী,—এখন তিনি।

আকবর। আরও কিছু।—উদরান্নে বঞ্চিত হইয়া, স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া, তিনি এখন বনে বনে বেড়াইতেছেন! তাও দু' দণ্ড কোথাও স্থির হইয়া থাকিবার যো নাই,——আমার অনুচরেরা সর্ব্বদাই তাঁর অনুসরণ করিতেছে।——এখন তাঁর ভিক্ষুকেরও অধম অবস্থা!

পৃথ্বীরাজ। আরও ভাল বলিলেন,——ইহাতেই সেই মহাপুরুষের চিত্তের দৃঢ়তা আরও দৃঢ়তর হইতেছে।—হিমালয়ের ন্যায় তিনি অটল আছেন।

আকবর। তবে কি তুমি নিশ্চিতরূপে বলিতে চাও,—এ পত্র তাঁর লেখা নয় ?

পৃথ্বীরাজ। আমার ত তাই বিশ্বাস।

আকবর। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হইতেছে না,—ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা। তুমি ত তাঁর হস্তাক্ষর চিন;—খুব ভাল করিয়া দেখ, দেখি, এই স্বাক্ষর তাঁর কি না ?

পৃথ্বীরাজ। (স্মিতমুখে) জাঁহাপনা! যে জাল করিবে, তাহার ত এইরূপ অবিকল জাল-স্বাক্ষর করাই দরকার।

আকবর। তবে কার গর্দ্দানে এমন জোড়া-মাথা আছে যে, স্বয়ং দিল্লীশ্বরকে এমন জালপত্র লিখিতে সাহসী হইয়াছে?

হঠাৎ এইরূপ চড়িয়া উঠিয়া, সম্রাট সেই দূতকে সভামধ্যে আহ্বান করিলেন।

কম্পিতহৃদয়ে দূত আসিল। আকবর বলিলেন,—

"যে পর্য্যন্ত না এই পত্রের সত্যাসত্য নির্ণয় হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি বন্দী রহিলে।"

নিরপরাধে দূত রাজদণ্ডে অবরুদ্ধ হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পৃথ্বীরাজ বড় ভাবনায় পড়িলেন! "সত্য সত্যই কি তবে মহারাণা প্রতাপ সন্ধিপত্র লিখিয়াছেন? সত্যই কি শেষে তিনি বিধর্ম্মী মোগলের নিকট অবনতি স্বীকার করিলেন? সত্যই কি তাঁহার ব্রত-চ্যুতি ঘটিল? আজ অষ্টাদশ বর্ষেরও অধিক কাল যিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া,—বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছেন,—চিতোর উদ্ধার করিতে গিয়া যিনি সমগ্র মিবার হারাইয়াছেন,—ক্ষত্রিয় আভিজাত্য রক্ষার জন্য যিনি শিশোদীয়কুলের কুমার কুমারীগণকে দীর্ঘকাল অবিবাহিতা রাখিয়াছেন,—সেই প্রাতঃস্মরণীয়, পুণ্যশ্লোক, হামিরের বংশধর কি শেষে গ্রহবৈগুণ্যে,—সকলই হারাইলেন? ভীষণ দারিদ্র্য-দুঃখে কি শেষে 'মন্ত্রের সাধন' বিস্মৃত হইলেন? অন্তিমে কি তাঁহার ব্রতচ্যুতি ঘটিল?——হায়! এ দুঃখ আর রাখিবার স্থান কোথায়?"

নির্জ্জন এক কক্ষে বসিয়া, পৃথ্বীরাজ এইরূপ আকাশ-পাতাল ভাবিতেছেন।

তার পর তাঁহার মনে হইল—

"সম্রাটের অনুমান মিথ্যা নয়,—সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরটা প্রতাপসিংহেরই বটে। যদিও মহারাণার অনেক গৃহ-শত্রু এবং গুপ্ত-শত্রু আছে,—যদিও তাঁহার নির্ম্মল যশোভাতি ম্লান করিতে অনেকে উৎসুক,—তথাপি সহসা

এতদিন পরে, কে এমন অসম সাহসে, স্বয়ং সম্রাটকে পত্র লিখিবে? আর পত্রবাহকও কোন্ সাহসে সেই পত্র লইয়া, সম্রাটসকাশে আসিতে সাহসী হইবে? বাহ্য আকৃতি দেখিয়াও, সেই দূতকে মন্দলোক বলিয়া বোধ হয় না। না, এখন বোধ হইতেছে, আমার অনুমানই মিথ্যা,—সত্যই মিবারের শেষ আশায় ছাই পড়িয়াছে!

"কিন্তু ঘটনা সত্য হইলেও মহারাণাকে আমি দোষী করিতে পারি না। যে অবস্থায় তিনি পড়িয়াছেন, তাহাতে, তিনি বলিয়া আজিও প্রকৃতিস্থ আছেন! তাঁহার দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা শুনিলে, দেহের রক্ত জল হয়,—অতি-বড় নিষ্ঠুরের প্রাণও কাঁদিয়া উঠে। বিশেষ তাঁহার সেই নিরাশামগ্ন জীবনে উৎসাহ দিবার লোক এখন কেহ নাই। স্নেহময়ী ভগিনীকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছি বটে; কিন্তু সে কোমলপ্রাণা বালিকা—তাঁহাকে কি বুঝাইবে? দুটা ভাবপূর্ণ কথা কিংবা দুটা মর্ম্ম-স্পর্শী গান শুনাইয়া কি, যমুনা সেই দৃঢ়চেতা, সঙ্কল্পপরায়ণ পুরুষসিংহকে আপন পথে চালিত করিতে পারিবে? হায়! এ সময় যদি আমি তাঁর কাছে থাকিতে পারিতাম!

"তা কাছে না থাকিতে পারি, এখান হইতেও কি আমি তাঁকে কোন সৎপরামর্শ দিতে পারি না? এই যে এক দিনের একটা মহাভ্রমে তাঁহার আজীবনব্যাপী ব্রতভঙ্গ হইতে বসিয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গে মিবারেরও সকল আশা-ভরসা লোপ পাইতে উদ্যত হইয়াছে,—আমি মনে করিলে কি এখান হইতে তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারি না?"

পৃথ্বীরাজ নিবিষ্টমনে অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন,—

"ঠিক হইয়াছে।—ইহাতে সেই নিরীহ দূতও উদ্ধার পায়, আর মহারাণাকেও আমার শেষ কর্ত্তব্য করা হয়। নিশ্চয় বলিতে পারি না,—কিন্তু আমার মন বলিতেছে, মহারাণা আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, পুনরায় জাগ্রৎ কেশরীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিবেন। যাই হোক্,—সম্রাটের

সহিত বাদানুবাদে এই ফলটা হইয়াছে যে, এখন মহারাণাকে একবার নাড়িয়া-চাড়িয়াও দেখিতে পারিব।"

এই সময়ে সেই সতীসাধ্বী জ্যোৎস্না সেখানে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—

"প্রিয়ে, আচ্ছা বল দেখি, আমি যাহা মানস করিয়াছি, তাহা সফল হইবে কি না?"

স্মিতমুখে স্বামিসোহাগিনী উত্তর দিলেন,—

"আমি কি অন্তর্য্যামী বিধাতাপুরুষ,—তাই তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিব যে, সফল হইবে কি না?"

পৃথ্বীরাজ। তবু তোমার কি মনে হয়,—বল না? দেখ, আমি সতী-নারীর মুখে 'হাঁ' 'না' বড় বিশ্বাস করি।

জ্যোৎস্না হাসিয়া বলিলেন,—

"মনের কথা কি, কিছুই বলিলে না,———তবুও 'হাঁ' 'না' একটা বলিতে হইবে!———এ তো বড় বিষম কথা দেখিতেছি। সতী রমণীরা বুঝি তবে "চিন্তা-পঠনের" বিদ্যেটা কিছু কিছু জানে? তা সতীর ভাগ্যে সব শোভা পায়। কিন্তু আমি যদি সে রকম সতী না হই?"

পৃথ্বীরাজ আদরে আদরিণীর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—

"আমার জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণাধিকা তুমি; তুমি যদি 'সে রকম সতী' না হও?——তোমার বাড়া সতী এ পাপ মোগলপুরীতে আর কে আছে? ওঃ! মনে করিলে আজিও সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হয়,—পাপ নরোজা-মেলার দিন তুমি কি অদ্ভুত তেজস্বিতা দেখাইয়াছিলে! চন্দ্রাননি! তোমার পুণ্যবলেই দিল্লীশ্বরের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গে কত কুল-রমণীর অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদও তুমি পাইয়াছ!——তথাপি বল, 'যদি আমি সে রকম সতী না হই?'——না প্রিয়ে, উপহাস করিতেছি না,—সত্য, বল, আমি যাহা মানস করিয়াছি, তাহা সফল হইবে কি না?"

জ্যোৎস্না এবারও একটু হাসিলেন। পৃথ্বীরাজ বড় পীড়াপীড়ি করায়, কাজে কাজেই বলিলেন,—"হাঁ সফল হইবে।"

পৃথ্বীরাজ। (হাসিয়া) আমার মনরক্ষার জন্যত 'হাঁ' বলিলে না?

জ্যোৎস্না হাসি-হাসি মুখে বলিলেন,—

"দেখ, যদি 'হাঁ' 'না' কিছু না বলিয়া অন্য কথা পাড়িতাম, কিংবা 'জানি না' বলিতাম, তাহা হইলে হয়ত তোমার অভিমান হইত, মন-ভার হইত, কিংবা রাগ হইত। এখন 'হাঁ' বলিয়াছি, তবুও পরিত্রাণ নাই।"

পৃথ্বীরাজ। এ রকম করি বলিয়া কি, তুমি আমার উপর রাগ কর?

জ্যোৎস্না স্মিতমুখে মধুর কটাক্ষ করিয়া উত্তর দিলেন,—"আমরা অমন রাগ-রাগিণী জানি না;—ও জিনিসটা পুরুষেরই একচেটে।"

পৃথ্বীরাজ। কেন, সুন্দরীরা বুঝি তবে রাগ করেন না? নিজেদের জাত-ভাইদের দিকে খুব টানিতেছ যে!——যাক্, এখন যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।——প্রিয়ে, তবে আমার মানস সফল হইবে?

জ্যোৎস্না স্মিতমুখে, বামদিকে ঘাড়টি ঈষৎ নোওাইয়া, 'হাঁ' ইঙ্গিত করিলেন; পৃথ্বীরাজ পুলকিত-চিত্ত হইলেন।

জ্যোৎস্না। এখন মানসটা কি, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

পৃথ্বীরাজ। প্রিয়ে, তোমায় বলিব না ত, কাহাকে বলিব?——ইহা মহারাণা সম্বন্ধীয় কথা।

পৃথ্বীরাজ তখন একে একে সকল কথা বলিলেন। সন্ধিপত্র লইয়া দূতের আগমন, জালপত্রজ্ঞানে নিজের অবিশ্বাস, সম্রাটের সহিত বাদানুবাদ, শেষ সত্যাসত্য নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত দূতের অবরোধ,——পৃথ্বীরাজ প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণীকে সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া, জ্যোৎস্নাও স্বামীর সহিত একমত হইলেন। বুঝিলেন, গ্রহবৈগুণ্যে, বিশেষরূপ মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়া, মহারাণা এ অবনতি স্বীকার করিয়াছেন।

তার পর, পৃথ্বীরাজ যাহা ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন, চুপে চুপে স্ত্রীকে বলিলেন। বলিলেন যে, জনৈক মোগল প্রহরীকে হাত করিয়া সেই দূতকে মুক্ত করিবেন, তারপর সেই দূতের হস্তেই মহারাণাকে একখানি গোপনীয় পত্র দিবেন। পত্রখানি এরূপভাবে লিখিত হইবে যে, যাহাতে মহারাণা পুনরায় জীবনব্রত উদ্‌যাপনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হন এবং সন্ধির কথা মন হইতে এককালে বিদূরিত করেন। অবশ্য সেই দূত,—মানুষটা খাঁটী কি না, সর্ব্বাগ্রে বিশেষরূপে সে পরিচয়টি লইতে হইবে।

ইহার পর জ্যোৎস্না স্বামীকে বলিলেন, "তা এ সব ত এক রকম হইল, কিন্তু স্নেহময়ী যমুনা সম্বন্ধে কি ভাবিলে? ননদিনী আমার কি সত্য সত্যই আজীবন কুমারী দশায় থাকিবে? অমরের সহিত কিছুতেই কি তাহার বিবাহ হইবে না? পিতৃব্য কি কিছুতেই তোমার অনুরোধ রাখিলেন না?"

পৃথ্বীরাজ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—

"প্রিয়ে, ভৃত্যের মুখে ত সকলই শুনিয়াছ। মোগলের সহিত বিন্দুমাত্র সংশ্রব থাকিতেও তিনি বৈবাহিক কার্য্যে লিপ্ত হইবেন না। এ বিষয়ে আমি আর কি অনুরোধ করিতে পারি? যমুনাও যেরূপ কঠিন পণ করিয়াছে,—যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে অন্যত্র তাহার বিবাহের চেষ্টা করাও বৃথা। যাইহোক, মহারাণার পরিবারবর্গের মধ্যে থাকিয়া, আর কিছু না হোক, ভগিনী আমার আপন পবিত্রতা ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছে। এখানে হয়ত তাহাতেও বিঘ্ন ঘটিত। বন্দী ও অক্ষম পৃথ্বীরাজের ইহাও এক আনন্দের বিষয়।"

জ্যোৎস্না। আহা, ননদিনীকে যে আর কখন চোখে দেখিতে পাইব, সে আশাও নাই।—কি কাল মোগলের হস্তেই আমাদের অদৃষ্ট-সূত্র ন্যস্ত হইয়াছে!

পৃথ্বীরাজ। সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা,——তুমি আমি কি করিতে পারি বল?——না, মহারাণাকে এমন বিপদের দিনে, যমুনার বিবাহ বিষয়ে, পুনঃ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতে পারি না। তার অদৃষ্টে যা আছে, হইবে।
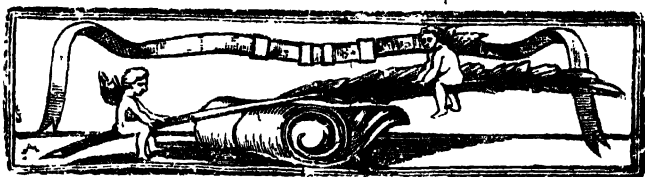
বিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রতাপ উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সম্রাট্‌কে সন্ধিপত্র লিখিয়া, ক্ষণকাল স্তব্ধ ও গম্ভীর হইয়া রহিলেন। যে নিস্তব্ধতা ও গম্ভীরতা,——ঝড়ের পূর্ব্বে সমুদ্রতুল্য স্থির ও অচঞ্চল। তৎকালীন তাঁহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে সাহসী হইল না। তাঁহার অন্তরের অন্তরে কি তুমুল ঝটিকা ও মহাপ্রলয় হইতেছিল, তাহা কেবল তিনিই বুঝিতেছিলেন!——হায়! আজীবনব্যাপী মহাব্রত,——মুহূর্ত্তের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় তিনি বিস্মৃত হইলেন! তাঁহার সে সময়কার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত।

কয়েক দিন তাঁহার এই বিষম অবস্থায় কাটিয়া গেল। এদিকে তাঁহার সেই দূত সন্ধিপত্র লইয়া দ্রুতগামী অশ্বে দিল্লী পঁহুছিল।

কয়েক দিন এইরূপ বিষম নিস্তব্ধ অবস্থায় থাকিয়া, সহসা একদিন প্রতাপ সত্য সত্যই অধীর ও উন্মত্ত হইলেন। সহসা নাদস্বরে, যাতনা-জড়িতকণ্ঠে, আপনা আপনি কি বলিয়া উঠিলেন। বোধ হইল, যেন তাঁহার সেই বিশাল বক্ষঃ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। বেলা তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। সহসা প্রতাপ উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন,——

"হায় রে! এতদিন পরে আমি আত্মহত্যা করিলাম! সত্য সত্যই

আত্মহত্যা করিলাম! সত্য সত্যই নিজ হৃৎপিণ্ড ছেদন করিলাম!——— কি দুর্ম্মতি আমার হইল রে!"

উদ্‌ভ্রান্ত প্রতাপের মুখ দিয়া সহসা এই কটি কথা নির্গত হইল। তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র অতি ভীষণরূপে অলোড়িত হইতে লাগিল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন।

সেইরূপ অস্থিরচিত্তে, অরুন্তুদ যন্ত্রণাসহকারে, তিনি আবার বলিলেন,—

"কে আছ হে, এ হতভাগ্যের প্রকৃত বন্ধু?——এ সময়ে বন্ধুর কাজ কর;—আমার প্রাণবধ করিয়া সকল জ্বালা হইতে আমাকে অব্যাহতি দাও! হে আকাশ! তুমি সদয় হইয়া, তোমার বজ্র এ মহাপাপীর মস্তকে নিক্ষেপ কর——ওহো! ব্রতচ্যুত, অধমাত্মা, মূঢ়, অসহিষ্ণু, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী,—এখনও সংসারে বিদ্যমান রহিয়াছে!—— অসংযতেন্দ্রিয়, ভোগবিলাসেচ্ছু, কালচক্র-ক্রীড়নকের অস্তিত্ব এখনও পৃথিবীতে রহিয়াছে!———কে আছ সুহৃৎ! ত্বরায় এ দুর্ব্বহ জীবনের অবসান কর।"

স্বামীর আর্ত্তদান শুনিয়া লছমীদেবী ব্যাকুলভরে ছুটিয়া আসিলেন। প্রতাপ পূর্ব্ববৎ উদ্‌ভ্রান্তভাবে, বিকলকণ্ঠে কহিলেন,—

"রাজ্ঞি! আসিয়াছ? কৈ, আমার অস্ত্র কোথায়?——শীঘ্র অস্ত্র আনিয়া দাও।"

পতিব্রতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"নাথ, সহসা এমন হইলে কেন? কি হইয়াছে বল?"

"প্রিয়ে আর হইবে কি,——সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়াছি!———ওহো! মোগলের নিকট অবনতি স্বীকার?"

প্রতাপ ছুটিয়া গিয়া, গহ্বর হইতে আপন অসি বহির্গত করিলেন। সেই শাণিত কৃপাণ রাণীর হস্তে দিয়া কহিলেন,—

"প্রিয়ে, স্বামীর শেষ আদেশ পালন কর। এই অস্ত্রে আমাকে অসহ্য যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দাও।——আপন হস্তে আপন প্রাণবধ তেমন সুবিধাকর হইবে না।"

"নাথ! এ কি শুনি? অদৃষ্টে শেষে এই ছিল? হা ভগবান্! এই করিলে? স্বামী আমার শেষে উন্মত্ত হইলেন?"

বিকট হাসি হাসিয়া, প্রতাপ কহিলেন, "না প্রিয়ে, আমি উন্মত্ত হই নাই,——সে আশঙ্কা করিও না।—উন্মত্ত হইলে কি তুচ্ছ ভোগবিলাসের আশায় আজীবন ব্রত ভঙ্গ করি? আত্ম-অবনতি স্বীকার করিয়া কি মোগলের নিকট সন্ধিপত্র প্রেরণ করি? ওহো, অনর্থকরী বিষয়বিলাস-কামনা!"

এই সময় চন্দাবৎ কৃষ্ণ, অমর, যমুনা প্রকৃতিও সেখানে উপস্থিত হইল।

প্রতাপ, সেই বর্ষীয়ান্ বীর চন্দাবৎকে কহিলেন,——

"সর্দ্দার! আজ তোমার প্রভুভক্তির পরীক্ষা। এই লও, অস্ত্র গ্রহণ কর।———এই অস্ত্রে তোমার দুর্ভাগ্য প্রভুকে ইহলোক হইতে বিদায় দাও।"

চন্দাবৎ, অমর, যমুনা,——বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে রাণার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

প্রতাপ পুনরায় সেইরূপ উদ্‌ভ্রান্তভাবে কহিলেন, "হায়, স্বহস্তে আপন গৃহে অগ্নি দিয়া গৃহস্বামীর চৈতন্য হইয়াছে! সজ্ঞানে বিষপান করিয়া, মূঢ় প্রতাপসিংহের অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে! ভগবান! একদিনের পাপে কেন আমার এ সর্ব্বনাশ করিলে? কেন আমার এ মতিচ্ছন্ন হইল? কেন আমি চির-শক্র মোগলের নিকট অবনত হইলাম?——তোমরা বলিতে পার, সে দূত কি সত্য সত্যই দিল্লী পঁহুছিয়াছে?"

মহারাণার উন্মত্ততার কারণ সকলে বুঝিল। সকলেই মনে মনে হায় হায় করিতে লাগিল।

সর্দ্দার কহিলেন, "মহারাজ, গত কল্য দূতের ফিরিবার সম্ভাবনা ছিল,——দিল্লী পঁহুছিবার কথা,· কি বলিতেছেন? তা সে জন্য দুঃখ কি · প্রভু? যদি সন্ধির প্রস্তাব অপমানকর বোধ হইয়া থাকে, পুনরায় সেই দূতকে পাঠাইয়া দিল্লীশ্বরকে সেই সংবাদ দিলেই চলিবে।——অধৈর্য্য হইবেন না প্রভু!"

প্রতাপ। সর্দ্দার! সে ত বিষয়ী লোকের পরামর্শ। কিন্তু উপস্থিত, এই মুহূর্ত্তের জ্বালা আমি কিরূপে দূর করি বল?—হায়! এ অনুশোচনার ঔষধ কোথায়? মৃত্যু ভিন্ন আমার মহাপাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি?

সর্দ্দার। প্রভু,——

প্রতাপ। আর আমি তোমাদের প্রভু নই। প্রভু হইলে কি তুমি প্রভু-আজ্ঞা পালন করিতে পশ্চাৎপদ হও?——সর্দ্দার! যদি যথার্থ আমার ভক্ত হও, তবে এই অস্ত্র গ্রহণ কর।—এই অস্ত্রেই আমাকে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত কর।

সর্দ্দার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রভু! আপনি যদি এরূপ অধৈর্য্য ও আত্মহারী হন, আমরা কার মুখ চাহিয়া দুঃসাধ্য ব্রত পালন করিব? কে কুমারগণকে 'মন্ত্রের সাধন' শিক্ষা দিবে? কে অনাথ পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবে?"

প্রতাপ।—আর পরিবারবর্গ! এই পরিবারবর্গই আমার কাল হইয়াছে! ইহাদেরই মায়া-রজ্জুতে আমি নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছি।—— নহিলে, জীবন থাকিতে কি আমি পাপ মোগলের নিকট মস্তক অবনত করি?

এই সময়ে দূরে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। সকলে উৎসুকচিত্তে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী নিকটে আসিল।

দিল্লী হইতে সেই দূত ফিরিয়া আসিয়াছে। সকলেই মনে মনে মহা-প্রমাদ গণিয়া, অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

দূত আসিয়া প্রতাপকে অভিবাদন করিয়া, প্রতাপের হস্তে একখানি পত্র দিল। কাতরকণ্ঠে প্রতাপ বলিলেন,—

"আর পত্র পড়িব কি? ইহাতে ত আমার মৃত্যু-বাণ আছে!——মোগল অনুগ্রহ করিয়াছে, এই ত সংবাদ?"

প্রতাপ ঘৃণাভরে পত্র ফেলিয়া দিলেন।

দূত বলিল, "মহারাজ, ও পত্র বিকানীর-রাজ পৃথ্বীরাজের,— মোগলের নহে।"

"কি! 'মোগলের নহে'? মোগল কি অবজ্ঞাভরে আমার ঘৃণিত প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছে? বল,—শীঘ্র বল,—তাহা হইলেও আমি কিঞ্চিৎ সুস্থির হই।—শত্রুর অবজ্ঞা এবং ঘৃণাও বরং আমায় আনন্দদান করিবে; কিন্তু শত্রুর অনুগ্রহ ও দয়া আমার মৃত্যুশেল্লতুল্য হইবে।—বল দূত, তোমার মুখ যেন কিছু প্রফুল্ল দেখিতেছি;—সংবাদ শুভ কি? আমার মনোমত উত্তর দিবে কি? মোগল আমার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছে কি?"

প্রতাপ সমধিক উৎসাহভরে, দূতকে একেবারে অনেক প্রশ্ন করিলেন। এই অবসরে অমর পৃথ্বীরাজের সেই পত্রখানি কুড়াইয়া পিতার হস্তে দিলেন।

দূত। প্রভু, বিকানীর-রাজের ঐ পত্র পাঠ করুন, সকল সংবাদ অবগত হইবেন। আপনি যে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দিল্লীশ্বরকে পত্র লিখিয়াছিলেন, বিকানীর-রাজের তাহা বিশ্বাসই হয় নাই। সম্রাটের নিকট তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ঐ পত্র জাল,—আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া, আপনার কোন যশোবৈরী ঐ পত্র সম্রাটকে লিখিয়াছে।

প্রতাপের চক্ষু হইতে ঝরঝর আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি গদগদকণ্ঠে বলিলেন,—

"দূত! তোমার বনবাসী প্রভুর আর কিছুই সম্বল নাই,—অশ্রু পুরস্কার, আর কি দিতে পারি,——এস, প্রাণ ভরিয়া তোমায় আলিঙ্গন করি।"

মহাপ্রাণ প্রতাপ তখন দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সেই দূতকে আলিঙ্গন করিলেন।

দূত। মিবারপতির এ আলিঙ্গন, অধীনের পক্ষে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রারও অধিক।—আজ আমি কৃতার্থ হইলাম।

দূত প্রতাপের পদধূলি গ্রহণ করিল।

অতঃপর প্রতাপ উদ্বেলিত অন্তরে পৃথ্বীরাজের পত্র পাঠ করিলেন। পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখকমল প্রফুল্ল হইল, হৃদয় উৎসাহে মাতিয়া উঠিল, প্রাণে নব বল আসিল,—সিংহনাদে তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—

"যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ!——জীবন-সহচর! সর্দ্দার! মহিষি! মিবার উদ্ধার না করিয়া প্রাণত্যাগ করিব না।"

প্রতাপ উচ্ছ্বলিত অন্তরে বলিতে লাগিলেন,—

"আহা! কি তেজস্বিনী অমৃতময়ী বাণী! যথার্থ কবির হৃদয় লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! প্রকৃত কবি না হইলে, বন্দীদশায়ও শত্রু-গৃহে বসিয়া, স্বদেশবাসীকে কে এরূপ উত্তেজিত করে!——যমুনে! ধন্য তোমার রত্নগর্ভা স্বর্গীয়া জননী।——এমন পুত্ররত্ন গর্ভে স্থান দিয়া তিনিও ধন্যা হইয়া গিয়াছেন, আর সমগ্র মিবারকেও ধন্য করিয়া গিয়াছেন। বড় দুঃখ, এ হেন বীর-কবি বন্দীদশায় শত্রুগৃহে আবদ্ধ! যমুনে, তোমার অগ্রজের নিকট, আমি সহস্র প্রকারে ঋণী।—এই দেখ, কি পত্র তিনি আমায় লিখিয়াছেন!"

যমুনা আপন সুললিত কণ্ঠে অগ্রজের সেই পত্র পাঠ করিলেন;—

"হিন্দুই হিন্দুর আশা-ভরসা স্থল। দিল্লীশ্বর সমগ্র হিন্দুর হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিয়াছেন, কেবল একজনের নিকট তিনি অবজ্ঞাত। সেই একজনই একদিন সমগ্র মিবারের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবেন,—সমগ্র রাজপুত জাতির নেতা হইবেন। অতএব চিরদিন আদর্শের উচ্চশিখরে অবস্থিতি করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

"মোগল আকবর কেবলই যে, মিবার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে,—ক্ষত্রিয়ের

আভিজাত্য-বীজ তিনি নষ্ট করিয়াছেন—রাজপুতের মুখে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা তিনি অর্পণ করিয়াছেন। মোগলের হিন্দু-পত্নীই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।'

"তার পর পাপ নরোজার হাট।——হায়! কত সতীর অমূল্যনিধি এই হাটে বিক্রীত হইয়াছে। কত পবিত্র বংশের গৌরব এই পাপ স্থানে চিরকালের জন্ম অন্তর্হিত হইয়াছে।—স্বয়ং আকবরই এই হাটের মালিক।'

"সেই আকবরের নিকট,—প্রাতঃস্মরণীয়, পুণ্যশ্লোকে, বীরাগ্রগণ্য প্রতাপসিংহ অবনত-মস্তক হইবেন? হিমালয় গহ্বরে ডুবিবে? সূর্য্য রাহুভয়ে কক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে? হামিরের বংশধর অম্বরাদির নীচ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইবেন?'

"কালে একদিন সকলই বিনষ্ট হইবে,—থাকিবে কেবল কীর্ত্তি ও নাম। একমাত্র মিবারপতিই এতকাল সেই অবিনশ্বর বস্তুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন;—সমগ্র রাজস্থান আশানেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে;—আজ কোন্ প্রাণে তিনি ব্রতচ্যুত হইবেন? রাজপুতের পবিত্র আভিজাত্য-বীজ একমাত্র তিনিই রক্ষা করিতেছেন। মোগলের অবসানে, পতিত রাজস্থানে, তাঁহাকেই আবার সেই বীজ বপন করিতে হইবে।—অতএব সেই আভিজাত্য বীজ রক্ষা করিয়া তিনি ধন্য হউন,—তাঁহার দুর্ভাগা ভক্ত কবির ইহাই প্রার্থনা।"

পত্রের অক্ষরে অক্ষরে যে অগ্নিকণা নিহিত ছিল, তাহাতে সকলে জ্বলন্ত উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। সকলে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ব্রতপালন করিব।"

প্রতাপ আনন্দে মত্ত হইয়া বলিলেন, "তাহাই হোক্।—যে প্রাণ ইতি-পূর্ব্বে, আপন অবিমৃশ্যকারিতা স্মরণে, হনন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম,—দুঃসহ কষ্টেও এক্ষণে সেই প্রাণ ধারণ করিব।—দেখি, বিধাতা মিবার-ভাগ্যে কি করেন!"

যমুনাও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রতাপকে বলিল,—

"পিতঃ! আমি ক্ষীণপ্রাণা বালিকা,—তথাপি এই পত্র পড়িয়া, আমার এ ক্ষীণ প্রাণেও বলের সঞ্চার হইয়াছে।—ইচ্ছা হয়, এই রমণীবেশেই মোগলের সহিত যুদ্ধ করি!"

প্রতাপ। পৃথ্বীরাজের ভগিনীর যোগ্যই কথা বটে।—মা আমার, চিরজীবিনী হও।

মনে মনে কহিলেন, "হায়, তবুও মুখ ফুটিয়া রমণীর শুভ আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলাম না!—হা হতভাগ্য মোগল! তোমার জন্যই আমি এ অনুপমা কুমারীরত্নকে পুত্রবধূ করিতে বঞ্চিত হইলাম।"

তার পর দূত একে একে সকল কথা বলিল। সম্রাটের সহিত পৃথ্বীরাজের বাদানুবাদ, দূতের অবরোধ, পরে পৃথ্বীরাজের চেষ্টায় জনৈক মোগলপ্রহরীর সাহায্যে তাহার মুক্তিলাভ, গোপনে তাহার সহিত পৃথ্বীরাজের সাক্ষাৎ ও পত্রদান,—দূত এক এক করিয়া সব বলিল। শুনিয়া মহানুভব প্রতাপ, উদ্দেশে পৃথ্বীরাজের নিকট হৃদয়ের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, তাঁহাকে শত সহস্র সাধুবাদ দিলেন। শেষে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "সেই মহাপ্রাণ রাজপুত কবির পুণ্যবলেই আমার ব্রত অক্ষুণ্ণ রহিল,—জীবন গৌরবান্বিত হইল। বুঝিলাম, বন্দীদশায়ও তিনি আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিলেন;—যথার্থ স্বদেশ-ভক্তের কাজ করিলেন।—তাঁহার ঋণ ইহজীবনে অপরিশোধনীয়।"

কুক্ষণে, অশুভ মুহূর্ত্তে, একটিবারের জন্য মহাপ্রাণ প্রতাপের যে ভ্রম হইয়াছিল,—তাহা আজিকার শুভক্ষণে, শুভ মুহূর্ত্তে, সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইল। বরং সেই মহাভ্রম অহর্নিশ অন্তরে জাগরূক থাকিয়া, তাঁহার জীবনব্রতকে অধিকতর উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিল। দেবপ্রকৃতি প্রতাপ আবার দেবতার ন্যায় হৃদয়-মন পাইলেন। তাহার ফল যাহা হইল, ইতিহাসপাঠক তাহা অবগত আছেন। আমরাও সংক্ষেপে সেই কাহিনীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া গ্রন্থ শেষ করিব।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মোগল যখন বুঝিল, প্রতাপের সন্ধিপ্রার্থনা,——ও কিছু নয়, এবং যখন সেই দূতও সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া পলাইল, তখন তাহাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। আকবর এবার পূর্ব্বাপেক্ষাও দৃঢ়চিত্ত হইয়া অনুচরগণকে আদেশ দিলেন, "সমগ্র আরাবলীর পর্ব্বত, অধিত্যকা, গহ্বর, কানন, প্রান্তর,——পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ কর, ———কোথায় সেই মন্দমতি কাফের লুক্কায়িত আছে,—কোথায় সেই হৃতসর্ব্বস্ব, মহাদাম্ভিক প্রতাপসিংহ অবস্থিতি করিতেছে!—যেরূপে পার, সেই দুৰ্দ্ধর্ষ রাজপুতকে ধৃত ও বন্দী কর। পুরস্কারের কথা, পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি,——আমার বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের এক দশমাংশ, প্রতাপসিংহের ধৃত ও বন্দীকরণে দান করিব।"

আবার দলে দলে লোক ছুটিল। দলে দলে মোগল অনুচর, দলে দলে মোগল সৈন্য-সামন্ত—বিশাল আরাবলী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল;—কিন্তু কোথাও তাহারা প্রতাপের সন্ধান পাইল না।

অবশেষে এক দল অল্পসংখ্যক মোগল-সৈন্য, বিপুল পুরস্কারের আশায় জীবন-পণ করিয়া প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে করিতে, জবুরার সেই নিবিড় জঙ্গল সন্নিধানে উপস্থিত হইল। তথায় দুইজন ভীলের অসতর্ক কথোপকথনে তাহারা বুঝিতে পারিল, অদূরে—দীনহীন প্রতাপসিংহ

সপরিবারে অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছেন। বিপুল পুরস্কারের বেশী বখ্‌রা দিবার আশঙ্কায় তাহারা সেই অল্পসংখ্যক লোকেই, অবিলম্বে প্রতাপকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। যে দুই ভীলের অসতর্ক কথোপকথনে এই মোগল-সৈন্যদল প্রতাপের সবিশেষ সন্ধান পাইল, তাহাদের একজন মোগলকরে নিহত হইল,—অন্যজন ঊর্দ্ধশ্বাসে—তীর-বেগে দৌড়িয়া গিয়া প্রতাপকে এ-সংবাদ দিল।

এই বিষম বিপজ্জনক সংবাদে প্রতাপ অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া, উপস্থিত যাহা পাইলেন, তাহা লইয়াই মোগলের গতিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে কতকগুলি লোষ্ট্রখণ্ড ও বৃক্ষশাখা সংগ্রহ করিলেন। জনকয়েক ভীল তাহা লইয়াই দাঁড়াইল; আর জনকয়েক, ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া মোগলের গতিরোধ করিতে মনস্থ করিল।

সর্দ্দারগণের মধ্যে প্রতাপের সেই একমাত্র জীবন-সহচর চন্দাবৎ কৃষ্ণ প্রতাপের সমভিব্যাহারী আছেন। আর সকলেই প্রতাপের দুর্ভাগ্য আগমনের সহিত আপন আপন পথ দেখিয়াছে। সেই একমাত্র সহায় বীরবর চন্দাবৎ এবং পুত্র অমরসিংহকে লইয়া, প্রতাপ মোগলের সম্মুখ-আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইতে যত্নবান্ হইলেন। সেই ভীলদল লোষ্ট্রখণ্ড, বৃক্ষশাখা ও ধনুর্ব্বাণ লইয়া এক দিকে দাঁড়াইল, বীর চন্দাবৎ এক দিকে দাঁড়াইলেন, কুমার অমরসিংহ এক দিক্ আগুলিয়া রহিলেন, এবং চতুর্থ দিকে স্বয়ং মহারাণা—শত্রুর আগমন ব্যর্থ করিবার জন্য মূর্ত্তিমান্ যমের ন্যায় দাঁড়াইলেন। এইরূপ চারিদিক একপ্রকার রক্ষিত হইল। বলা বাহুল্য, চন্দাবৎ, অমর ও মহারাণার হস্তে শাণিত কৃপাণ শোভা পাইতে লাগিল।

শত্রুদল অসীম উৎসাহে, দীন্ দীন্ রবে চারিদিক হইতে সেই বন ঘেরিল। কিন্তু দেখিল, চারিদিকের পথই রুদ্ধ;—তাহাদের গতিরোধার্থ চারিদিকই একরূপ রক্ষিত হইয়াছে।

তখন তাহারা—সেই অল্পসংখ্যক সৈন্যও চারিদলে বিভক্ত হইয়া অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।—প্রতাপের দুর্ভাগ্য পরিবারবর্গ তখন সেই শত্রুবেষ্টিত অরণ্যের এক বৃক্ষতলে অবস্থিত।

ভীলদল হইতে অবিশ্রান্ত লোষ্ট্রবৃষ্টি হইতে লাগিল। তাহাতে দুই দশজন মোগল আহত হইল, জখম হইল, এক আধজন বা প্রাণত্যাগও করিল।—ধনুর্ব্বাণেরও ফল প্রায় এইরূপ, না হয় কিঞ্চিৎ অধিক। পক্ষান্তরে, মোগলহস্তেও দুই দশ জন ভীল আহত এবং এক আধ জন মৃতও হইল। কিন্তু বীরবর চন্দাবৎ ও মহারাণা প্রতাপসিংহ যে দুই দিক্ রক্ষা করিতেছিলেন, সে দুই দিকের মোগল প্রায় শূন্য হইয়া আসিল। চন্দাবৎ ও প্রতাপ, যেন কদলীবৃক্ষের ন্যায় কচ্ কচ্ মোগল-সৈন্য কাটিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সে দুইদিক পরিষ্কারপ্রায় হইয়া আসিল। বড় জোর দুই পাঁচ জন,—বিপুল পুরস্কারের আশায় এখনও যুঝিতেছে;—আর দুই একজন প্রাণ লইয়া, একবার পলাইতেছে, একটু পরে আবার আসিতেছে।

কিন্তু চতুর্থ দিকের,—কুমার অমরসিংহের দিকের ফল তেমন আশা-প্রদ নহে। একে তিনি তরুণবয়স্ক যুবক, তার উপর যুদ্ধনীতিতে সম্যক্ অভিজ্ঞও নন;—অন্ততঃ চন্দাবৎ ও প্রতাপের ন্যায় অদ্ভুত বিক্রম তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইল না। তবে প্রথম কিছুক্ষণ তিনি যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়া শত্রুগণকে অস্থির করিলেন, তাহা বীরাগ্রগণ্য প্রতাপসিংহের পুত্রেরই সম্ভবে; কিন্তু শেষরক্ষা বুঝি আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

প্রতাপ ও চন্দাবৎ, ইহা দেখিতেছেন, বুঝিতেছেন; তথাপি কুমারের সাহায্য জন্য তাঁহারা যাইতে পারিতেছেন না। কি জানি,—যদি এই দুই-চারিজন মোগলও এই দুই দিকের ব্যূহ ভেদ করিয়া কোনরূপে স্ত্রীলোক-দিগের মর্য্যাদা নষ্ট করে!—এ দিকে কুমারও অত্যন্ত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, এবং অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরধারায় আপ্লুত হইল।

দূর হইতে একটি অনুপমা সুন্দরী ইহা লক্ষ্য করিলেন। কুমার অমরের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরধারায় আপ্লুত দেখিয়া, সেই সুন্দরীর চক্ষে জল আসিল।—ওকি! ঐ পাপ মোগল না অমরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া শাণিত কৃপাণ উত্থিত করিয়াছে? আবার এদিকেও না আর একজন শত্রু, তাঁহার স্কন্ধদেশ লক্ষ্য করিতেছে? ঐ আর একজনও না তাঁহার বক্ষে অসি বিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে?———না, যমুনার আর সেই বৃক্ষতলে সুস্থির চিত্তে থাকা হইল না!——তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব প্রিয়তমের জীবন-সংশয়, আর তিনি তাহা চোখে দেখিয়া, কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকেন?

প্রেমময়ী যমুনা তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, বৃক্ষমূলদেশ-সংবদ্ধ মহারাণার একখানি বর্শা লইয়া, ভৈরবী মূর্ত্তিতে ক্ষিপ্রগতিতে কুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন। লছমীদেবী, ব্যাকুলভরে "কোথা যাস্ মা,—কোথা যাস্" বলিয়া, বারংবার পশ্চাৎ ডাকিয়া, প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। যমুনা তাহা শুনিল না, বলিল, "মা, কোন ভয় নাই,—আমি এই এলেম ব'লে। তুমি ছেলে-পিলেদের নিয়ে, সাবধানে থাক'। রাজপুতের মেয়ে হাথ্-বল্‌তে মরে না।"

সেই নবযৌবনসম্পন্না অপরূপ রূপবতী,—ভৈরবীমূর্ত্তি ধরিয়া, ক্ষিপ্র-গতিতে অমরের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং চক্ষের নিমেষে সেই শাণিত বর্শাফলকে, অমরের প্রাণহননোদ্যত এক মোগলকে ধরাশায়ী করিলেন! ——'আল্লা হো' বলিয়া, মোগল অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল।

"একি! তুমি? যমুনা?—তুমি আসিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলে? কিন্তু বালিকে, পতঙ্গ হইয়া তুমি আগুনে ঝাঁপ দিলে কেন? হায়! এখন তোমার প্রাণ আমি রক্ষা করি কিরূপে? ঐ দেখ, তিন জন মোগল একযোগে তোমাকে লক্ষ্য করিয়াছে। ও! আর কথা কহিবারও অবসর নাই।———দূর হ চণ্ডাল!"

এক মোগল অমরের হস্তে অসি বিদ্ধ করিল। যমুনা ক্ষিপ্রহস্তে, সেই শাণিত বর্শাফলকে, সে মোগলেরও প্রাণসংহার করিলেন।

অমর। যমুনা, যমুনা,—আজ তুমিই আমার জীবনদায়িনী দেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছ। কিন্তু হায়, তোমাকে রক্ষা করি কিরূপে?——আবার?

আর এক মোগলও অমরের হস্তে অসি বিদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইল। যমুনা তাহাকেও ধরাশায়ী করিলেন।

অমর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

"যমুনা, যমুনা, একি! তোমার হস্তে এত বল! চক্ষের নিমেষে তুমি তিন তিনজন মোগলের প্রাণসংহার করিলে! যমুনা, যমুনা! আমি তোমাকে চিনি নাই,—সত্যই তুমি দেবী!"

যমুনা। কথায় কথা বাড়িবে,—আর সময় নাই। ঐ দেখ, এবার চারিজন মোগল একযোগে তোমাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে,—শীঘ্র আত্মরক্ষা কর।

কিন্তু এ কি! সে চারিজনের তিনজন যে, নিকটে আসিয়া যমুনাকে লক্ষ্য করিল!—অবশিষ্ট একজন,—সেই মাত্র অমরকে লক্ষ্য করিয়াছে।— "বটে, কাফের-রমণীর দেহে এত বল! আচ্ছা সুন্দরি! দেখি, এইবার তোমাকে কে রক্ষা করে?"

সেই তিন জন মোগল যমুনাকে আক্রমণ করিল। সত্যই রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে যমুনা আজ সমর-প্রাঙ্গণে আবির্ভূতা!—চক্ষের নিমিষে দুইজন মোগলকে তিনি সেই শাণিত বর্শাফলকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট একজন,——একি!

অমর সেই একমাত্র আক্রমণকারী মোগলকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন,——এ কি!

"হায় যমুনা! এ কি হইল? আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়া তুমি প্রাণ দিলে!"

কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথা বলিয়া, অমর ঝটিতি সেই অবশিষ্ট মোগলের প্রাণবধ করিয়া, যমুনার সেই ধূল্যবলুণ্ঠিত রক্তাক্ত দেহ বক্ষে ধারণ করিলেন।

যমুনা ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—

"কুমার! ক্ষমা করিও,—অন্তিমকালে একবার আমি রমণীজন্মের সাধ মিটাই!—প্রাণেশ্বর!——"

এই মধুর প্রিয়-সম্বোধনে, বালিকার সেই রক্তাক্ত দেহও যেন পুলকে কণ্টকিত হইল,—মুখকমলে ঈষৎ হাস্যরেখা প্রকাশ পাইল। অমর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া, যমুনার সেই গভীর প্রেমবৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। যমুনা বলিল, "প্রাণেশ্বর! মরণকালে এই সম্বোধন আমার ভাগ্যে ঘটিল,—ইহাও আমার সৌভাগ্যের বিষয়। আহা-হা! আমার আজন্মের সাধ,—তোমাকে এই মধুর সম্বোধন করিতে করিতে, তোমার কোলে মাথা রাখিয়া যে, আমি মরিতে পারিলাম, এ মৃত্যুও আমার শ্লাঘনীয়! আবার বলি,—স্বামিন্, প্রাণেশ্বর, হৃদয়বল্লভ!——জন্মান্তরেও যেন তোমার সহিত এ দাসীর মিলন হয়!"

অমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হায় বালিকে! আমি তোমায় চিনি নাই। সত্যই তুমি দেবী!—আজিকার এ দুর্দ্দিনে আমার প্রাণ রক্ষা করিতে, তুমি ধরাতলে আবির্ভূতা হইয়াছিলে!——প্রাণেশ্বরি! প্রিয়তমে!——"

"আহা-হা! এতদিনে আমার রমণী-জন্ম সার্থক হইল। জীবিতেশ্বর! আবার বল,—বল, হয়ত এই প্রিয়-সম্বোধনে আমি বাঁচিয়া উঠিতেও পারি! আ-হা-হা!——

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখা একবার হাসিয়া উঠিল। ক্রমেই যমুনার সর্ব্বশরীর অবশ ও হিমাঙ্গ হইয়া আসিল।

এবার অমর আরও উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"হায় যমুনা! এ কি হইল? সত্য সত্যই তুমি আমাকে ছাড়িয়া চলিলে? প্রাণেশ্বরি! প্রেমময়ি!——"

যমুনা অতি ক্ষীণকণ্ঠে, অস্পষ্ট জড়িতস্বরে কহিল,—

"আ-হা-হা! আজ কি সুখের দিন!——সমরপ্রাঙ্গণে, রক্তের আসনে, আমাদের বাসর-শয্যা হইল।——আজ আমাদের শুভবিবাহ হইয়া গেল। দেবতা সাক্ষী রহিলেন,——আমি আমার সতীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সুখে স্বামীর কোলে মরিতে পাইলাম।—আমার দা—দা—কে এ শু—ভ সং—বা—দ জা—না—য়ো।"

ক্রমেই যমুনার চক্ষু স্থির হইয়া আসিল।—সব ফুরাইল!

ঝটিকা থামিয়াছে। প্রায় সমস্ত মোগল নিহত হইয়াছে। দুই এক জন কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইয়াছে।

তখন একে একে সেই ভীলদল, এবং চন্দাবৎ ও প্রতাপ,—অমরের নিকট আসিলেন। পিতাকে দেখিতে পাইয়া, অমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"পিতা, পিতা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার প্রাণরক্ষা করিতে আসিয়া, বালিকা যমুনা আত্মপ্রাণ হারাইয়াছে!"

চারিদিকে 'হায় হায়' রব উঠিল। প্রতাপ-মহিষী লছমী দেবী তখন সেখানে আসিলেন! দেখিলেন, চম্পকদলনিন্দিত ফুটন্ত নলিনী রক্তাক্ত দেহে ম্লানমুখে তথায় পড়িয়া আছে। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি যমুনার সেই মৃতদেহ কোলে লইলেন।

গভীর দুঃখে, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে প্রতাপ বলিলেন, "হায় বালিকে! এই দুর্ভাগ্য পরিবারদের সঙ্গে মিশিয়া, শেষে তুমি আত্মপ্রাণ আহুতি দিলে! ওহো, পৃথ্বীরাজ!" তোমার বড় স্নেহের ধনকে, আজ তোমার অগোচরে, চিতাভস্মে পরিণত করিব!——মাগো, দয়াময়ি, পরমেশ্বরি! তোমার মনেও এই ছিল মা?"

শোকের প্রস্রবণ বহিল। সকলেই গভীর বিলাপ ও আর্ত্তনাদে সেই বন প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

প্রতাপের আদেশে চিতা সজ্জিত হইল। অমর স্বয়ং স্বহস্তে সেই স্বর্ণপ্রতিমাকে চিতায় শায়িতা করিলেন। তার পর অগ্নি-সংস্পৃষ্ট হইয়া সেই চিতা ধূ ধূ জ্বলিতে লাগিল।

যমুনার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের সামর্থ্য, তখন প্রতাপের নাই। তবে যে রুধিরপিপাসু বর্শা লইয়া, যমুনা একাই পাঁচজন মোগলের প্রাণবধ করিয়াছিল, প্রতাপ আপনার সেই প্রিয় বর্শাফলক যমুনার চিতার নিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। ভাবিলেন, "যদি কখন দিন হয়, এই স্থান লক্ষ্য করিয়া, যমুনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি সুবর্ণময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিব।——আহা, মা আমার রূপে গুণে লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন!"

আর অমরসিংহ? তিনি আর কি করিবেন?—সেই নিবিড় অরণ্যে, আপনার বুক-পোরা আশায় শ্মশানভরা ছাই রাখিয়া, চক্ষের জলে চিতার আগুন নিবাইয়া, জন্মের মত সে স্থান ত্যাগ করিলেন। যমুনার সেই স্বপ্নময়ী জীবন্ত মূর্ত্তি,——জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতিমাঝে জাগরূক ছিল। বালিকার সেই মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার মাঝেও প্রীতি-প্রফুল্ল মুখ, সেই হাসি-হাসি কোমল করুণ দৃষ্টি, সেই অমৃতময় প্রিয় সম্বোধন,—অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি ভুলিতে পারেন নাই।—সেই দিন তাঁহার বুকের এক খানি হাড় খসিয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে দুই একজন মোগল পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তাহারা গিয়া দিল্লীশ্বরকে জানাইল, "বহু চেষ্টায় প্রতাপের সন্ধান পাইয়াছি; কিন্তু আমরা দলে কম ছিলাম বলিয়া, প্রতাপকে ধৃত বা বন্দী করিতে পারি নাই,——পরন্তু আমাদের দলস্থ প্রায় সকলেই সেই দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতের হস্তে প্রাণ দিয়াছে।"

শুনিয়া মোগলপতি আকবর সন্তুষ্টও হইলেন, দুঃখিতও হইলেন। সন্তুষ্ট হইলেন,——বহুকাল পরে প্রতাপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া; দুঃখিত হইলেন,——এত দৈন্য-দুর্দ্দশার মধ্যেও, সেই অজেয় রাজপুতের গায়ে আজিও অসুরের ন্যায় বল আছে,——এখনও সে একাকী শতাধিক মোগলের মাথা লইতে পারে। যাহা হউক, আপাততঃ সে দুঃখ ও সন্তোষ,——দুই-ই চাপা দিয়া, সম্রাট একযোগে প্রায় সহস্র মোগলকে প্রতাপের উদ্দেশে পাঠাইলেন।—যেরূপে যেমন করিয়া হউক, তাহাকে ধৃত, নিহত বা বন্দী করা চাই,——সম্রাট বড় আশায় উৎসাহভরে এই কথা সকলকে বলিয়া দিলেন। আর পুরস্কার-প্রলোভন,——সে ত আছেই।

তখন সেই নবোৎসাহিত প্রায় একসহস্র মোগল,——দিল্লীশ্বরের

নিদেশানুসারে সর্ব্বাগ্রে জব্‌রার সেই নিবিড় অরণ্যাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহাদের সেখানে পঁহুছিবার বহু পূর্ব্বে বিচক্ষণ প্রতাপ সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

স্নেহময়ী যমুনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরদিনেই, প্রতাপ জন্মের মত আরাবলীর নিকট বিদায় লইলেন। চন্দাবৎকে বলিলেন,—

"যখন বহুকাল পরে এই নিবিড় অরণ্যেও মোগল আমার সন্ধান পাইয়াছে এবং আজিকার যুদ্ধে তাহাদের প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছে, তখন অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়! যাইব কোথায়? বিশাল মিবারের——এই বিশাল আরাবলীর অরণ্যে,—গহ্বরে—কোথাও আমার স্থান নাই;——হায়! যাইব কোথায়? সত্যই কি এই বিশাল পৃথিবীর বুকে আমার মাথা ফেলিয়া থাকিবারও এতটুকু স্থান মিলিবে না?——সর্দ্দার, জীবন-সহচর! চল যাই,——রাজস্থানের বিশাল মরুভূমি পার হইয়া,——চল, সিন্ধুনদের সৈকতভূমে যাই; সেখানে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে,——সেই দ্বীপে গিয়া——কোন রকমে মাথা ফেলিয়া থাকি।——আশা আছে, সেখানে মোগল আর আমার অনুসরণ করিবে না। সর্দ্দার! এতদিনে সত্য সত্যই বুঝিলাম, আমার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দাম কল্পনা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইয়াছে।——আমিই রাজপুতের সকল সুখ, সকল সৌভাগ্য নষ্ট করিয়াছি।"

চন্দাবৎ বলিলেন, "মহারাজ! স্থির হউন,——অশ্রুবর্ষণ করিবেন না। চলুন, সঙ্কল্পমতই কার্য্য করি। দেখি, বিধাতার মনে আরও কি আছে!"

অসহ্য কাতরতায় প্রতাপ একটু তীব্র হাসি হাসিয়া বলিলেন,—

"বিধাতার মনে আর কি থাকিবে?——মহাপাপী প্রতাপসিংহের এইরূপ জীয়ন্তে সমাধিই তাঁহার ইচ্ছা।———চল জীবনসুহৃৎ বীরবর,

—সঙ্কল্পমতই কার্য্য করি।———কথায় কথা বাড়িবে,———হৃদয়ের শোক-সমুদ্র উথলিয়া উঠিবে।”

তখন মহারাণা সেই অপোগণ্ড শিশু পুত্রকন্যা গুলিকে লইয়া, দুর্ভাগ্যবতী পত্নীর হাত ধরিয়া, জন্মের মত আরাবলীর নিকট বিদায়-গ্রহণ করিলেন। ভগ্নপ্রাণ অমরও পিতার সমভিব্যাহারী হইলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রতাপ দাঁড়াইলেন। চন্দাবৎকে বলিলেন, “বীর, তুমি ইহাদিগকে লইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর,———আমি আরাবলীর ঐ উন্নত প্রাকারে দাঁড়াইয়া, একবার জন্মশোধ চিতোরকে দেখিয়া লই।———হায়! চিতোর-উদ্ধার-কল্পনা আজ হইতে আমার শেষ হইল।”

প্রতাপ এক গগনস্পর্শী পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া চিতোরপানে চাহিলেন। নিরাশার গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, সজলনয়নে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মনে মনে বলিলেন,———

“হায় মা জন্মভূমি! আজ তোমার চরণে জন্মের মত বিদায় লইলাম। ইহজীবনের অভিনয় আমার ফুরাইল। যদি জন্মান্তরে এই হৃদয় লইয়া তোমার চরণে স্থান পাই, তবে আর একবার দেখিব।———মা পুণ্যময়ি, পরমেশ্বরি!”———

ঝর্ ঝর্ করিয়া প্রতাপের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। হায়! সে জল আর শুকাইল না।

পর্ব্বতপ্রাকার হইতে নামিয়া, প্রতাপ চন্দাবতের সহিত মিলিত হইলেন, এবং দুর্ভাগ্য পরিবারদিগকে লইয়া, সুদূর সিন্ধুনদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।———এখানে আর মোগল তাঁহার অনুসরণ করিবে না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

জ্বলন্ত উত্তাপ বুকে লইয়া, প্রতাপ রাজস্থানের সেই বিশাল মরুভূমি সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। ——অনন্ত বালুকা ধূ ধূ উড়িতেছে,—যতদূর দেখা যায়, প্রতাপ দেখিলেন, ছায়াহীন, বৃক্ষহীন, আশ্রয়হীন অনন্তস্থান যেন অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতেছে——যেন দেবতার অভিসম্পাতে, সে স্থানে আলো, ছায়া, জল, আশ্রয় কিছুই নাই,——কেবল অনন্ত বালুকার সেই ভীষণ ধূ ধূ দৃশ্য,——বাতাসের সেই ভীষণ সোঁ সোঁ রব,——আর সূর্য্যের সেই অতি প্রখর——অগ্নিকণা তুল্য তীব্র জ্বালাময় উত্তাপ,——সেই বিশাল স্থান পূর্ণ করিয়া, অতি ভীষণ ভয়াবহ হইয়া রহিয়াছে।———হায়! সেই দুস্তর দুর্গম মরুভূমি,——বিনা সম্বলে প্রতাপকে সপরিবারে পার হইতে হইবে।

অকূল চিন্তা-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া, স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া প্রতাপ সেই ভীষণ মরুভূমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।——চন্দাবৎও নিঃসম্বল রাজপরিবারদিগের মরুভূমি পারের কোন উপায় না দেখিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শূন্যদৃষ্টে চাহিয়া আছেন,——এমন সময় যেন বিধাতার প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ এক ব্যক্তিকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। সেই ব্যক্তিও যেন তাঁহাদের পরিচিত।——ও কি! সেই ব্যক্তি না

দূর হইতে প্রতাপকে দেখিবামাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে সেই দিকে আসিতেছে ?

প্রতাপও অবাক্ হইয়া সেই ব্যক্তিকে দেখিতে লাগিলেন। তারপর দেখিলেন, সেই ব্যক্তি তদবস্থায় নিকটে আসিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মিবারের আলোক! রাজপুতভরসা! পুণ্যপ্রাণ মহারাণা!—এই লউন,—মিবারের শেষ-সম্বল।"

সেই ব্যক্তি পশ্চাদাগত অনুচরগণের নিকট হইতে রাশীকৃত ধন লইয়া প্রতাপের চরণে উৎসর্গ করিল।

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "একি! প্রিয় সচিব? ভাম্‌শা? তুমি?——এ দুর্দ্দিনে তুমি কোথা হইতে এ দুর্ভাগ্যের সন্ধান পাইলে? আর এ অগণিত ধনরত্নই বা সহসা এ হতভাগ্যকে অর্পণ করিতেছ কেন?"

বৃদ্ধ সচিব কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"মিবারপতি! এ ধন মিবারের,—ইহা আপনারই প্রাপ্য।"

প্রতাপ পুনরায় বিস্মিতভাবে কহিলেন. "সে কি, আমি ত বহুকাল হৃতসর্ব্বস্ব, বনচারী, ভিক্ষুক,—এ অগণিত ধন কিরূপে আমার প্রাপ্য হইতে পারে?"

ভাম্‌শা। মহারাণা! মিবারের যাহা কিছু, তাহা আপনারই। তবে আপন ধন লইতে কেন সঙ্কুচিত হইতেছেন?

প্রতাপ। যখন মিবারের অধীশ্বর ছিলাম, তখন একদিনকাল এ কথা খাটিত;—এখন ত আমি মিবারের অধীশ্বর নই।—আশ্রয়হীন, কপর্দ্দকহীন, ভিক্ষুকেরও অধম এখন আমি;——এই দেখ, স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া, নিঃসম্বলে বিশাল মরুভূমি পার হইবার চেষ্টা দেখিতেছি! ——যাও মন্ত্রি! যাহার ধন, তাহাকে সমর্পণ কর।

ভাম্‌শা। প্রভু, মহারাণা, রাজপুতকুলতিলক! বৃদ্ধকে আর কাঁদাইবেন না —এই ধন গ্রহণ করুন। আপনার চিরানুগত ভৃত্য, আজ প্রভুর ধন প্রভুর

চরণে অর্পণ করিতেছে,—তাহাকে নিরাশ করিবেন না,—এ ধন গ্রহণ করুন। মিবারের রাজ-অন্নে প্রতিপালিত, পুরুষানুক্রমে রাজভৃত্য আমরা,—আমাদের এ সঞ্চিত ধন মিবাররক্ষায় ব্যয়িত হউক;—দেব! নিজগুণে ইহা গ্রহণ করুন। বৃদ্ধকে বিফলমনোরথ করিবেন না,—দয়াময়!

প্রতাপ। সচিব! বুঝিলাম, মিবারের দুঃখে তুমি যথার্থ কাতর-প্রাণ হইয়াছ,—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু তোমার ধনে আমার কি অধিকার আছে?—আমি কিরূপে ইহা গ্রহণ করি?

ভাম্‌শা। মহারাণা! আপনি রাজনীতিজ্ঞ ও সদ্বিবেচক;—আপনাকে আমি আর কি বুঝাইব?—সকল অবস্থাতেই, প্রজার ধনে, রাজার অধিকার আছে। বিশেষতঃ এ ধন আমি স্বেচ্ছায় সমর্পণ করিতেছি,—মিবারের হিতার্থে অর্পণ করিতেছি;—আপনার গ্রহণের কি আপত্তি থাকিতে পারে?

প্রতাপ অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"ভাল, সচিব! আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। এ ধন আমি লইব। কিন্তু ইহা হইতে এক কপর্দ্দকও আমার বা আমার পরিবার-বর্গের অর্থে ব্যয়িত হইবে না,—এই সমস্ত ধন মিবার-উদ্ধারে উৎসৃষ্ট হইবে।—কেমন, ইহাতে তুমি সম্মত আছ?"

"মহারাণার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

প্রতাপ। তবে তাহাই হউক।—পুণ্যবান্ মহামনা তুমি,—তোমার অর্থেই মিবার উদ্ধার হউক। ভাগ্যবান্ সুকৃতিপরায়ণ তুমি,—তোমার অর্থেই জননী-জন্মভূমির অধীনতা-পাশ মুক্ত হউক। স্বদেশবৎসল পরম প্রেমিক তুমি,—তোমার অর্থেই মোগলের দর্প চূর্ণ হউক;——রাজ-স্থানের ইতিবৃত্তে তুমিই "মিবাররক্ষক" বলিয়া বর্ণিত হইবে।

ভাম্‌শা। মহারাণাই সর্ব্বমূলাধার,—এ দাস নিমিত্ত মাত্র।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

তবে কি বিধাতা সত্য সত্যই মিবারের প্রতি প্রসন্ন হইলেন? আবার কি মিবারের সেই পূর্ব্বদিন ফিরিয়া আসিল? আবার কি মহারাণা প্রতাপ অমিতবিক্রমে হুঙ্কার ছাড়িয়া,—মোগলকে ভীত, চকিত, স্তম্ভিত করিলেন? আবার কি সমগ্র রাজপুত একস্থানে সমবেত হইল? আবার কি সহস্র সহস্র সেনানী, সহস্র সহস্র যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত করিয়া, অতি অল্পকাল মধ্যে স্বাধীনতার বিজয়ভেরী নিনাদিত করিতে লাগিল?

হাঁ, তাহাই হইল। সেই অতি দুর্দ্দিনে, রাজস্থানের সেই বিশাল মরুভূমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া, স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া নিরাশপ্রাণ প্রতাপ যখন নীরবে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়াছিলেন, তখন বিধাতার প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ—প্রিয় সচিব ভামশা সহসা সেইখানে আবির্ভূত হইয়া, মহারাণার হস্তে যে অগণিত ধন-রত্ন অর্পণ করিলেন, সেই অর্থের সাহায্যে, প্রতাপ অচিরকালমধ্যে পুনরায় সমগ্র সামন্ত, সর্দ্দার ও রাজপুতসৈন্যকে একত্র করিলেন। তাহাদিগকে জ্বলন্ত উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া, পুনরায় মিবার-উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শক্ত আসিয়াও কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, বিপুল উৎসাহে ভ্রাতার সহিত যোগদান করিলেন।

মোগল ভাবিয়া রাখিয়াছে,—হৃতসর্ব্বস্ব, বনচারী, উদরান্নেবঞ্চিত

প্রতাপ,—আরাবলীর দুর্গম অরণ্যেও স্থান না পাইয়া, বিশাল মরুভূমি পারে, কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহারা নিরুদ্বেগে ভোগসুখে আসক্ত হইয়া কাল কাটাইতেছিল। যুদ্ধের কোনরূপ উদ্যোগ বা আয়োজন,—তখন তাহাদের ছিল না।

হঠাৎ একদিন মোগলের সে সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। সভয়ে ও সবিস্ময়ে একদিন তাহারা শুনিল ও দেখিল,——আকাশ-মেদিনী কম্পিত ও দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া, "হর হর মহাদেও" রবে অগণিত রাজপুত—মিবারের সর্ব্বত্র ঘেরিয়া ফেলিয়াছে!

বিস্ময়, ভয়, মোহ,—মোগলের অন্তরে যুগপৎ বিরাজ করিতে লাগিল।—"একি! এ খেলা কা'র? প্রতাপ ত বহুদিন হইল, মরুভূমি পারে সিন্ধুনদ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে;——তবে এ প্রলয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা করিল কে?"

"দেবীর" নামক স্থানে রাজপুতের ভাগ্যলক্ষ্মী পুনরায় ফিরিয়া আসিল। মহাবল প্রতাপ অমিতবিক্রমে এই স্থানে মোগলকে আক্রমণ করিলেন। মোগল-সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ তখন নিষ্কণ্টকে দেবীরের অধিনায়কতা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ প্রতাপের সেই ভীষণ সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। এক দিনেই তাঁহার সহস্র সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইল,—শেষে সম্মুখযুদ্ধে তিনিও প্রাণ হারাইলেন। এবার শক্ত প্রতাপের পক্ষ হইয়া এই যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখাইলেন।

সাহাবাজের অবশিষ্ট সৈন্য প্রাণভয়ে অমৈত নামক স্থানে পলাইয়া গেল,—কেশরীবিক্রমে প্রতাপ সেখানেও তাহাদের অনুসরণ করিলেন এবং প্রায় সকলকেই সংহার করিয়া অনেকদিনের অনেক ক্ষোভ মিটাইলেন।

তার পর প্রতাপ তাঁহার সেই নিজ রাজধানী কমলমীর অধিকার করিলেন। আবদুল্লা নামে এক মোগলের হস্তে এই কমলমীর-রক্ষার ভার

ছিল। আবদুল্লা প্রতাপের সে প্রচণ্ড তেজ সহিতে না পারিয়া, সসৈন্যে নিহত হইল।

এইরূপে প্রতাপ অনায়াসে অল্পদিন মধ্যে বত্রিশটি দুর্গ অধিকার করিলেন। আকবর এ সংবাদ পাইয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধের সকল আয়োজন করিতে না করিতে, প্রতাপ উপর্য্যুপরি, যেন যাদুমন্ত্রে সমস্ত জয় করিতে লাগিলেন। এক বৎসর মধ্যে প্রায় সমগ্র মিবার প্রতাপের করায়ত্ত হইল।

তারপর তিনি সেই ভীষণ বৈরী, স্বদেশদ্রোহী মানসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং অম্বরের প্রধান বাণিজ্যক্ষেত্র লুণ্ঠন করিয়া আপনার কোষাগার ভুক্ত করিলেন। অতঃপর আরও অনায়াসে, প্রতাপের-পিতৃদেব-প্রতিষ্ঠিত উদয়পুরও প্রতাপের হস্তগত হইল।

এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক দেশ, অনেক নগর, অনেক দুর্গ, অনেক রাজধানী,—প্রতাপ জয় করিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রায় সমগ্র মিবারের তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত অধীশ্বর হইলেন। সে সকল জয়-বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

প্রতাপ মোগলগ্রাস হইতে রাজস্থানের প্রায় সমগ্র দেশ উদ্ধার করিলেন;—পারিলেন না কেবল একটি স্থান উদ্ধার করিতে;—পারিলেন না কেবল তাঁহার প্রাণ-প্রিয়—পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিস্থান উদ্ধার করিতে।—সেটি তাঁহার সেই "মন্ত্রের সাধন"—চিতোর।

প্রতাপের ব্রত উদ্‌যাপিত হইল কি ?

তৃতীয় খণ্ড।

ব্রত-উদ্‌যাপন বা অবসান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হায়! একে একে সব হইল,—হইল না কেবল চিতোর উদ্ধার। একে একে প্রতাপের সকল সাধ মিটিল—মিটিল না কেবল জীবন-সাধ। একে একে মিবারের সব ফিরিয়া আসিল,—আসিল না কেবল মিবারপতির হৃদয়ের শান্তি!

মিবার আনন্দ-আলোকে উদ্ভাসিত, লোক-কোলাহলে পূর্ণ;—সমগ্র দেশ নিরুপদ্রব ও শান্তিময়;—মোগলের অত্যাচার বা ভয়-বিভীষিকা আর কিছুই নাই;—প্রকৃতিপুঞ্জ বেশ নির্ব্বিঘ্নে ও আনন্দে কাল কাটাইতেছে;—শিল্পকৃষিবাণিজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে;—কোনরূপ দৈব-উৎপাত, অজন্মা বা মহামারি এ সব কিছুই নাই,—দেশের

কোন অভাব নাই, কোন কষ্ট নাই ;——তথাপি দেশাধিপতির এত নিরানন্দ বিষণ্ণভাব কেন ?

কেন,—পাঠক নিজেই তাহার উত্তর দিবেন।

প্রতাপ সেই জীবনের নির্ম্মল উষাকালে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কৈ, সে ব্রত ত সফল হইল না ? কৈ, সর্ব্বাঙ্গীনরূপে ত দেশের স্বাধীনতারক্ষা হইল না ? চিতোর ত আজিও বিধর্ম্মী মোগলকরে আবদ্ধ রহিয়াছে ?——তবে মহাপ্রাণ প্রতাপ কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তিসুখে কাল কাটাইতে পারেন ? তাঁহার জীবন-ব্রত ত উদযাপিত হইল না,——জীবন অবসান হইতে চলিয়াছে !

সেই পূর্ব্বরূপ ব্রহ্মচারীর বেশ,—গৈরিক বসন পরিধান,—কেশ, শ্মশ্রু, নখর ক্ষৌরস্পর্শরহিত,—সেই তরুপত্রে ভোজন ও তৃণশয্যায় শয়ন,—সেই যৎসামান্য আহার,—সেই সর্ব্বপ্রকার বিলাসসুখবর্জ্জন,——ব্রতধারী প্রতাপ, প্রায় সমগ্র মিবার পুনরুদ্ধার করিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে অহর্নিশ জাগিতেছে,—চিতোর ! তাঁহার তপ জপ ধ্যান ধারণা হইয়া রহিয়াছে,—চিতোর ! তাঁহার আজীবন 'মন্ত্রের সাধন' হইয়াছে,—চিতোর।———কৈ, সে চিতোর ত তিনি উদ্ধার করিতে পারিলেন না ?

যে জন্য হউক, মোগল যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষান্ত হইয়াছে ; যে জন্য হউক, আকবর আর প্রতাপের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন না ; যে জন্য হউক, মিবারের প্রতি মোগলের আর লোলুপদৃষ্টি নাই।———তবে কি আকবর অনুগ্রহ করিয়া প্রতাপকে শান্তিসুখে থাকিতে দিয়াছেন ?

ভাবিতে ভাবিতে বীর প্রতাপের বীর-হৃদয় অভিমানে পূর্ণ হইল ; অন্তরে অনুশোচনা ও ধিক্কার আসিল ; তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র মথিত হইতে লাগিল।

"সত্যই কি মোগল আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছে? সত্যই কি মোগল আমার জীবন-ব্রত চিতোর-উদ্ধারে বাধা দিয়া, উপহাসচ্ছলে, মিবারের অন্যান্য প্রদেশ অধিকার করিতে দিয়াছে? সত্যই কি আমাকে এইরূপে দগ্ধিয়া মারিবার জন্যই, মোগল দূর হইতে অনুগ্রহের বিষদিগ্ধ বিষম বাণ আমার প্রতি নিক্ষেপ করিতেছে?

"হায়! তবে আর এ কি হইল? এত শ্রম, এত কষ্ট, এত তিতিক্ষা, এত ধৈর্য্য, এত সহিষ্ণুতা, এত সংযম,——শেষে কি এইরূপে বিফলে যাইবে? সত্যই কি আমার জিতিয়া হার হইবে?

"তবে এ সুদীর্ঘকাল এ জীবনসংগ্রাম কেন? ভগবান্‌কে ভুলিয়া, এ বিষময় রাজনৈতিক আলোচনা কেন? অগণিত নররক্তে পৃথিবী প্লাবিত করাই বা কেন? বিংশতি বর্ষ ধরিয়া, কি পুণ্য সঞ্চয় করিলাম? কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হইল?

"বাল্যের সেই সিংহাসন প্রাপ্তি হইতে আজ পর্য্যন্ত, একে একে কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝাবাত মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল,—কিন্তু পরিণাম ত দেখিতেছি সেই একরূপ!——সকলই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে।—কৈ, চিতোর উদ্ধার ত হইল না?"

ভাবিতে ভাবিতে প্রতাপের মস্তিষ্ক বিকৃত হইল। 'চিতোর' 'চিতোর' করিয়া তিনি জ্ঞান হারাইলেন। তাঁহার জীবনের স্বাস্থ্য, সুখ শান্তি—সকলই অন্তর্হিত হইল। ধীরে ধীরে তাঁহার পরমায়ু ক্ষয় হইতে লাগিল।

বিষম চিন্তাজ্বর-জর্জ্জরিত প্রতাপ একদিন অপরাহ্ণে, উদয়পুরের উচ্চ প্রাসাদশিখরে উপবিষ্ট হইয়া, নির্নিমেষ নয়নে চিতোরপানে চাহিয়া আছেন;——অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষরশ্মি. চিতোরের গগনভেদী স্তম্ভশিখরে..প্রতিফলিত হইতেছে,—ক্ষণে ক্ষণে তাহা কত বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে;—চারিদিকের উন্নত গিরি ও নিবিড় অরণ্যানী কেমন অপূর্ব্ব

শোভা ধারণ করিয়াছে,—নিবিষ্ট মনে প্রতাপ তাহাই দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে সহসা তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সর্ব্বশরীর বিঘূর্ণিত হইল। চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া, সেইখানে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তারপর এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং মৃদু মধুরস্বরে বলিতেছেন,—"ভয় নাই বাছা, চক্ষু মেলিয়া দেখ, আমি আসিয়াছি। তুমি ধ্যানে, জ্ঞানে, জপে, তপে, আহারে, বিহারে,—দিবানিশি তন্ময় হইয়া যাঁহাকে ভাবিতে,—সেই আমি আসিয়াছি। বৎস! দুঃখিত হইও না, নিরাশ হইও না, আত্মহারা হইও না,—এক হিসাবে তোমার ব্রত সফল হইয়াছে। মোগলগ্রাস হইতে চিতোর উদ্ধার করিতে না পারিলেও, তোমার কাজ তুমি করিয়াছ। যে বীজ তুমি মিবারে রোপিত করিয়া গেলে, ইহা হইতে অচিরে মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, এবং তাহা ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া সকলের মন প্রাণ আকর্ষণ করিবে। কিন্তু ইহলোকে তোমার আয়ু আর অধিক দিন নাই,—তুমি সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতে পাইবে না। তোমার পুত্র অমর—তোমার স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, তোমার ব্রত উদ্যাপিত করিবে। তুমি মন্ত্রের সাধন ও শরীর পাতন করিয়া, যে ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়া গেলে, তজ্জন্য তোমার নাম লোকের জপমালা হইয়া থাকিবে।

"তার পর শুন বৎস!—ভারতে হিন্দু মুসলমানকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিতে,—শান্তি ও সভ্যতা চিরস্থাপিত করিতে, সুদূর শ্বেতদ্বীপ হইতে শ্বেতকায় একদল মহৎ জাতি এখানে আগমন করিবেন। তাঁহারাই ভারতের ভাবী সম্রাট। সেই অশেষ গুণালঙ্কৃত, মহামহিমান্বিত রাজার রাজত্বে, সূর্য্য অস্তগমন করিবেন না। জ্ঞানে, গুণে, কার্য্য-কারিতায়,—তাঁহারা পৃথিবীর অগ্রগণ্য।——অজ্ঞান, মোগল তোমার

মর্য্যাদা বুঝিল না বটে; কিন্তু সেই জ্ঞানবান্, ন্যায়বান্, সুসভ্য রাজ-রাজেশ্বর তোমার মহত্ত্ব,—কাব্যে ও ইতিবৃত্তে জ্বলন্ত অক্ষরে ঘোষিত করিবেন। তাঁহাদের রাজত্ব অক্ষয় ও চিরস্থায়ী হইবে।”

(চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে। মহানুভব ইংরেজরাজের কৃপায় ভারতবাসী আজ সর্ব্ববিধ সুখের আস্বাদ পাইতেছে।)

স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে প্রতাপ উঠিলেন। ধীরে ধীরে কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে সেই সাধের তৃণশয্যায় আশ্রয় লইলেন।—হায়! সে শয্যা হইতে আর তাঁহাকে উঠিতে হইল না!
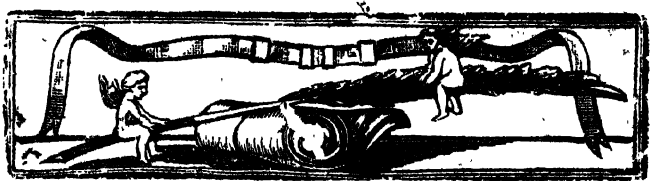
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ শেষদিন। রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্ত সর্দ্দার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ,—মহারাণার শয্যার চারিপার্শ্বে, ঘিরিয়া বসিয়াছেন। সকলেই নীরবে, অবনতবদনে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। অমর, মুমূর্ষু পিতার সম্মুখে যুক্তকরে দণ্ডায়মান।

মহাপ্রাণ প্রতাপ অন্তিমের সেই কষ্টকর সময়েও অস্পষ্টস্বরে 'চিতোর! চিতোর' বলিতে লাগিলেন। সামন্ত ও সর্দ্দারগণ নীরবে তাহা শুনিলেন। তাঁহাদের হৃদয় মথিত ও উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

ক্ষণপরে প্রতাপ চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। অমরকে দেখিয়া একটি মর্ম্মচ্ছেদকর গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন। সর্দ্দারপ্রধান বৃদ্ধ চন্দাবৎ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—

"কেন মহারাজ! কি কষ্ট আপনার জীবনকে ব্যথিত করিতেছে? কেন আপনার যোগমগ্ন পবিত্র আত্মার শান্তির ব্যাঘাত হইতেছে?—— আর্য্য! এই আমরা আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—বলুন, কি আদেশ পালন করিতে হইবে?"

প্রতাপ ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"সর্দ্দার! বড় দুঃখী আমি;——নির্ব্বিঘ্নে মৃত্যু-সুখও আমার ভাগ্যে

নাই!——অমর কি আমার জীবন-ব্রত উদযাপিত করিতে পারিবে?"

কুমার অমরসিংহ নতজানু হইয়া করযোড়ে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—

"পিতঃ! অধম সন্তানকে অবিশ্বাস করিবেন না,—আমিই আপনার ব্রত উদযাপিত করিব।"

প্রতাপ। পারিবে কি বাবা? অত কষ্ট, তোমার ও কোমল প্রাণে সহিবে কি? অন্তরে তুষানল জ্বালিয়া, তুমি স্বদেশসেবায় আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে সক্ষম হইবে কি?

অমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"হাঁ পিতঃ! হইব,—আপনার সন্তান কখন মিথ্যা কয় না।"

প্রতাপ। এই বেশ, এই কুটীর, এই শয্যা,——যথাযথ থাকিবে কি?

অমর। এমন কুলাঙ্গার কে আছে যে, পিতার অন্তিমকালের আদেশ পালন না করে?——পিতঃ! চিতোর উদ্ধার না করিলে আমার জীবনের অবসান হইবে না।—আপনার সাক্ষাতে, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া আমি ইহা বলিতেছি।

"আঃ! এতক্ষণে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব!"

প্রতাপ ইঙ্গিত করিলেন, অমর তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন। প্রতাপ পুত্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া, অন্তিমের আশীর্ব্বাদ শেষ করিলেন।

চন্দাবতের পানে চাহিয়া প্রতাপ একটু হাসিলেন। চন্দাবৎ ও হাসির অর্থ বুঝিলেন। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "মহারাজ! এ বৃদ্ধ জীবিত থাকিতে, কুমার কিছুতেই পিতৃব্রত লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। আমি সর্ব্বদা তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিব,—এই অঙ্গীকার করিলাম।

প্রতাপের মুখে অতি অপূর্ব্ব হাস্যরেখা বিকশিত হইল। সেই মুমূর্ষু মুখে স্বর্গীয় লাবণ্য প্রস্ফুটিত হইল। সেই হাস্য, সেই লাবণ্য পূর্ণমাত্রায় থাকিতে থাকিতে,——সেই স্বদেশ-প্রেমিক মহাপুরুষ, জীবন-মধ্যাহ্নেই, দুই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

সাধনা ও সিদ্ধি—এই।

সমাপ্ত।